শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা

স্বামী অপূর্বানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া

প্রকাশক

স্বামী মহেশ্বরানন্দ

অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

বাঁকুড়া

মুদ্রাকর

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইকনমিক প্রেস

২৫, রায়বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

দ্বিতীয় সংস্করণ

পৌষ, ১৩৬৩

তিন টাকা

নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা'র অপূর্ব অলৌকিক জীবন যাহাতে অল্পশিক্ষিত লোকেও সহজভাবে বুঝিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে এই পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমান সময়ে অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতিমানব—অবতারপুরুষ, কিন্তু শ্রীমা'ও যে তাহাই, ইহা খুব অল্প লোকেই ধরিতে পারিতেছেন। পরমহংসদেব শ্রীমা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "ও সারদা, সরস্বতী এবার (জীবকে) জ্ঞান দিতে এসেছে রূপ ঢেকে, পাছে সেই রূপ দেখে লোকের অকল্যাণ হয়।" একবার শ্রীঠাকুর পূজ্যপাদ ত্রিগুণাতীত স্বামীকে শ্রীমা'র নিকট দীক্ষা লইবার জন্য বলিয়াছিলেন এবং সেই সময় একটি বৈষ্ণবপদাবলী গাহিয়াছিলেন—"অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়, কোটী কৃষ্ণ, কোটী রাম হয় যায় লয়।" ইঙ্গিত ছিল ইহাই যে, শ্রীমাই পূর্ব পূর্ব যুগে শ্রীসীতা, শ্রীরাধা প্রভৃতি রূপে আসিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীমাকে বলিয়াছিলেন—"চতুর্দিকে সাধারণ লোকেরা অন্ধকারে পোকার মত হয়ে আছে, তোমাকে এদের দেখতে হবে। এ কি কেবল আমার একার কাজ, তোমাকেও অনেক করতে হবে!" সেইজন্যই দেখিতে পাই, শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পরেও শ্রীমাকে দীর্ঘকাল শরীরধারণ করিয়া জীবোদ্ধারকার্যে ব্রতী থাকিতে হইয়াছিল। পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ মহারাজ বলিতেন—"ঠাকুরের গলার অসুখ হয়েছিল রামকৃষ্ণ-সংঘ তৈরী

করবার জন্য, আর শ্রীমা জয়রামবাটীতে থাকতেন গৃহস্থদের গার্হস্থ্যধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য।” তিনি আরও বলিয়াছিলেন—“ঠাকুর বলিতেন—এবার ছদ্মবেশে আসা। রাজা যেমন ছদ্মবেশে নগর দেখতে আসে সেরকম। ঠাকুরের ছদ্মবেশ তো অনেকে ধরতে পারতেন। তাঁর মুহুর্মুহুঃ সমাধি হচ্ছে (সামান্য ভগবৎ-প্রসঙ্গেই), আসল ছদ্মবেশে আসা দেখবি তো জয়রামবাটী যা। শ্রীশ্রীমা রাজরাজেশ্বরী হয়ে ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে কেমন সংসার করছেন, নির্বিচারে ভক্তসেবা করছেন, এমনকি তাঁর নিজের শিষ্যদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন! এতটুকু বোঝবার উপায় নেই—জয় মা, জয় মা, জয় মা।”

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা’র অভেদভাবটি দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই বিষয়েও পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ মহারাজ বলিতেন—“ঠাকুর ও মাকে অভেদভাবে দেখবি—টাকার এপিঠ আর ওপিঠ; যে এঁদের আলাদাভাবে দেখবে—তার কিছু হবে না, কিছু হবে না, কিছু হবে না।”

বর্তমান পুস্তকটি পড়িয়া সাধারণে উপকৃত হইলে আমরা শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পৌষ, ১৩৬০ প্রকাশক

সূচনা

ভারতের তথা জগতের আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং আচরণে বিপুল শক্তিসঞ্চার করতে এ যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন উদ্বেল ঈশ্বরপ্রেম, ত্যাগ, সেবা এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের জীবন্ত বিগ্রহরূপে। তাঁর অভয়বাণী—"যার শেষজন্ম তাকে এখানে আসতেই হবে।" অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনাদর্শে আকৃষ্ট হতেই হবে।

যুগাবতারের সঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবীকে জগৎ পেয়েছিল বিগলিত-করুণা ও ভক্তিমুক্তিদায়িনীরূপে—'মা'রূপে। শ্রীমায়ের আশ্বাস-বাণী—"·· যাদের ভার নিয়েছি তাদের একজনও বাকী থাকতে আমার কি ছুটি আছে?" শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন শ্রীমাকে একান্তে বলেছিলেন—"·· এর পরে ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে।"

উপর্যুক্ত ঘোষণাগুলিকে সমর্থন করেই যেন স্বামী বিবেকানন্দও একদিন ভাবাবস্থায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—"এ যুগধর্মের অগ্রগতি অবাধে চলবে—সাত-আট শ' বৎসর। এই তো সবে আরম্ভ।" শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা অন্যোন্যভাবে যুগধর্মকে স্থাপিত, সংরক্ষিত ও পরিবর্ধিত করতে এসেছিলেন—এই হচ্ছে স্বামীজীর কথার মর্ম। দিন দিনই ঐ মর্মবাণী বিশ্ববাসী সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করছেন।

বাঁকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠাধ্যক্ষের বিশেষ উৎসাহে শ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র এ যুগজীবনীটি প্রণীত হল। ধর্ম ও দর্শনের তাত্ত্বিক আলোচনা এই গ্রন্থের পরিধির বাইরে, তাই তাঁদের অসামান্য

জীবনের কয়েকটি ঘটনামাত্র চিত্র-হিসাবে সন্নিবেশিত করেই আমরা ক্ষান্ত হয়েছি। এ জীবনচিত্র আদৌ কাদেরও চিত্তে ছাপ দেবে কিনা তা জানেন একমাত্র অন্তর্যামী।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি' এবং 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' থেকেই বর্তমান গ্রন্থের প্রায় সমুদয় উপাদান সংগৃহীত। উদ্ধৃতিগুলিও ঐসব গ্রন্থেরই।

এই সামান্য প্রচেষ্টায় যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন সকলকেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের এই জীবনালেখ্য যদি কারো প্রাণে তাঁদের সম্বন্ধে আরও জানবার আগ্রহ উদ্বুদ্ধ করে, তা হলেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

বিনীত

গ্রন্থকার

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসঙ্গিনী

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর

শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে

ভক্তি-অর্ঘ্য

শ্রীরামকৃষ্ণ

সর্বমাধুর্য-মণ্ডিত বসন্ত-ঋতু। ফাল্গুন মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথি। ব্রাহ্মমুহূর্ত। হুগলী জিলার কামারপুকুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুটীরে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠল। সারা পল্লী রোমাঞ্চিত হল সে ধ্বনিতে। গৃহস্বামী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ও শুনলেন। বুঝলেন—দেবতার আবির্ভাব। জননী চন্দ্রমণির কোল আলো করে ভূমিষ্ঠ হল সুদর্শন শিশু। সে দিন বুধবার। বাংলা ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন। (ইং ১৮৩৬ খৃঃ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী)।

* * *

এই শিশুটিকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র গ্রাম কামারপুকুর হয়েছে জগৎ-খ্যাত। ধর্মাশ্রয়ী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে এ গ্রামে এসেছেন। তাঁর আদি বাসস্থান ছিল দেরেগ্রামে—কামার-পুকুরের দু'মাইল পশ্চিমে। মধ্যবিত্ত অবস্থা; ধানের জমি, বাড়িঘর সব কিছু তাঁর ছিল। কিন্তু সত্যনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মিথ্যা মামলায় সাক্ষ্য না দেওয়ায় গ্রামের প্রজাপীড়ক জমিদার রামানন্দ রায়ের কোপে পড়লেন। হলেন সর্বস্বান্ত। তাঁর মাথা-গুঁজবার স্থানটুকুও রইল না। এইভাবে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে রামগতপ্রাণ ক্ষুদিরাম গৃহদেবতা রঘুবীরকে প্রাণে প্রাণে স্মরণ করে পৈতৃক ভিটা ও গ্রাম থেকে চিরতরে বিদায় নিলেন। তাঁকে কিন্তু পথে দাঁড়াতে হল না। যে রঘু রামানন্দরায়-রূপে উৎপীড়ন করেছেন, তিনিই আবার তাঁকে

কামারপুকুরে সুখলাল গোস্বামিরূপে আশ্রয় দিলেন। ক্ষুদিরামের সমূহ বিপদের কথা শুনে তাঁর আবাল্য সুহৃদ্ সুখলাল ক্ষুদিরামকে সাদরে পুত্রকন্যাসহ আহ্বান করে নিজ বাড়িতে নিয়ে এসে আপাততঃ স্থান দিলেন নিজ বাড়ির একাংশে। আর বন্ধুর সংসারযাত্রা-নির্বাহের জন্য 'লক্ষ্মীজলার' উর্বর একবিঘা দশ ছটাক ধানের জমি বিনাসর্তে চিরতরে তাঁকে অর্পণ করলেন। রামভক্ত ক্ষুদিরামের চোখ ভরে গেল আনন্দাশ্রুতে। প্রেমময়ের দয়ার কথা ভেবে কৃতজ্ঞতায় তাঁর প্রাণ উদ্বেল হয়ে উঠল।

*　　*　　*

ক্ষুদিরাম, স্ত্রী চন্দ্রমণি, পুত্র রামেশ্বর ও কন্যা কাত্যায়নী ছাড়াও সুখলালপ্রদত্ত পর্ণকুটীরে আশ্রয় পেয়েছিল ক্ষুদিরামের আরাধ্য কুলদেবতা ও শীতলাদেবীর প্রতিষ্ঠিত ঘট। সংসারে দুঃখের দহনে প্রাণের দেবতাকে তিনি ভোলেন নি। অকূলের কাণ্ডারীকে অকূলে পড়ে আরও নিবিড়ভাবে তিনি আঁকড়ে ধরলেন। সর্ববিষয়ে একান্ত নির্ভর। অনন্যশরণাগতের সকল ভার ভগবান নিজেই গ্রহণ করেন। ক্ষুদিরামের দরিদ্র সংসারে অভাব-অনটন ধীরে ধীরে প্রাচুর্যে ঘিরে উঠল। লক্ষ্মীজলার জমিটুকুতে সোনা ফলতে লাগল। রঘুবীরের নাম স্মরণ করে ক্ষুদিরাম নিজের হাতে কয়েক গুচ্ছ ধান্য ঐ জমিতে রোপণ করে, পরে কিষাণদের ঐ কাজে লাগাতেন। ঐ সামান্য জমির প্রচুর ফসল ক্ষুদ্র সংসারের যাবতীয় প্রয়োজন মিটিয়ে অতিথি-অভ্যাগত ও সাধু-ভক্তদের সেবাতেও পর্যাপ্ত হত। ক্ষুদিরাম জানতেন—তাঁর প্রাণারামেরই এই ঔদার্য।

ঐ সময়ে একদিন কোন বিশেষ কাজে ক্ষুদিরাম গিয়েছিলেন গ্রামান্তরে। ফিরবার সময় একটু বিশ্রাম নিতে তিনি বসেছেন ছায়াশীতল গাছের তলায়। খানিক পরেই গা এলিয়ে শুয়ে পড়লেন। নিদ্রা এল। স্বপ্নে দেখলেন যে তাঁর আরাধ্যদেবতা নবলকিশোর-শ্যামরূপে উপস্থিত হয়ে নিকটস্থ ধান্যক্ষেত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কমনীয় করুণায় বলছেন—"অনেকদিন থেকে বড অযত্নে পড়ে আছি ওখানে। বাড়িতে নিয়ে চল। তোমার সেবাযত্ন পেতে বড় ইচ্ছা হয়েছে।" ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন ক্ষুদিরাম। একি স্বপ্ন—না দেববাণী! বিস্ফারিত লোচনে চারিদিকে তাকালেন। নিকটস্থ ধান্যক্ষেত্রের উপর চোখ পড়তেই বুঝলেন, এই তো সেই স্বপ্নদৃষ্ট স্থান! গেলেন সেদিকে এগিয়ে। দেখলেন একটি সুন্দর শালগ্রাম-শিলার উপরে এক বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করে আছে। তবে তো এ স্বপ্ন নয়! আরো কাছে যেতেই সর্পটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আবেগপূর্ণ হৃদয়ে ক্ষুদিরাম 'জয় রাম' বলে শিলাটি হাতে তুলে নিলেন। লক্ষণ দেখেই বুঝলেন—'রঘুবীর-শিলা'। তিনি আনন্দে অধীর হয়ে রঘুবীরকে বুকে ধরে ঘরে ফিরে এলেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে রঘুবীরকে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজ গৃহ-মন্দিরে।...

এখন থেকে ক্ষুদিরামের অধিক সময় কাটে জাগ্রত-দেবতার পূজা-অর্চনায়। রঘুবীর তাঁর সমগ্র চেতনা জুড়ে বসেছেন। দিনে দিনে বেড়ে চলেছে তন্ময়তা। নানা দিব্যদর্শন, অনেক অলৌকিক অনুভূতি দিনের পর দিন ক্ষুদিরামকে আনন্দময় ও তন্ময় করে রাখত। তাঁর সৌম্যোজ্জ্বল মূর্তি দেখে গ্রামবাসীরা তাঁকে

বরেণ্য ঋষির মত শ্রদ্ধা করত। গ্রামের পথে তিনি চলেছেন, সকলে পথ ছেড়ে দিয়ে বলে—'ঐ তিনি আসছেন।' প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় গায়ত্রীধ্যানে যখন বসতেন ক্ষুদিরাম, তখন তাঁর বক্ষঃস্থল রক্তিম হয়ে উঠত আর উচ্ছ্বসিত প্রেমাশ্রু সিক্ত করত তাঁর নয়ন দু'টি। ভোরে ভোরে সাজি নিয়ে তিনি যখন ফুল তুলতে যেতেন, তাঁর আরাধ্যাদেবী শীতলা রক্তবস্ত্রপরিহিতা বালিকার বেশে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে তাঁকে পুষ্পচয়নে সাহায্য করতেন। এসব দিব্যদর্শন এখন ক্ষুদিরামের জীবনের সহজলভ্য নিত্য ঘটনা। পার্থিব সম্পদে নিঃস্ব করে তাঁর 'রাম' তাঁকে সমৃদ্ধ করলেন অপার্থিব ঐশ্বর্যে। তাঁর প্রাণে এখন আর কোন খেদ নেই, অভাব নেই, নেই অভিযোগ। দিব্য সম্পদের অধিকারী তিনি।...

আর একদিনের ঘটনা। কামারপুকুর থেকে ক্ষুদিরাম চলেছেন মেদিনীপুরে, ভাগ্নে রামচাঁদকে দেখতে। অনেক দিন তাদের খবর পান নি। চল্লিশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে, তাই খুব ভোরে ভোরে রওনা হয়েছেন। তখন ছিল মাঘের শেষ বা ফাল্গুনের প্রথম। প্রায় দশটা পর্যন্ত হেঁটেছেন। যেতে যেতে দেখলেন, এক বেলগাছে রাশি রাশি নূতন পাতা। অথচ কামারপুকুরে বেলগাছের সব পাতা ঝরে পড়েছে। ঐ কোমল বিল্বপত্র দেখে ক্ষুদিরামের মন আনন্দে নেচে উঠল। মনে হল—শিবপূজা করার কথা। মেদিনীপুরে যাওয়া তখন তিনি ভুলে গেলেন। পাশের গ্রাম থেকে একটি নূতন ঝুড়ি ও গামছা কিনে, একঝুড়ি বেলপাতা তুলে ভিজে গামছা চাপা দিয়ে বিকাল তিনটে নাগাত ফিরে এলেন বাড়িতে।

এই অবেলায় তাঁকে ফিরতে দেখে চন্দ্রাদেবী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"মেদিনীপুর যাওয়া হল না? এ অবেলায় ফিরতে হল —ব্যাপার কি? এখনো তো খাওয়া হয় নি!"

"দেখেছ কেমন কচি বিল্বপত্র? এমন বেলপাতা পেয়ে কি আর ছাড়া যায়?—বলেই ক্ষুদিরাম তাড়াতাড়ি স্নান করে বসলেন শিবপূজায়। পরে প্রাণভরে সাজালেন তাঁর প্রাণের দেবতা রঘুবীরকে ও শীতলাদেবীকে। দেবপ্রতিম-স্বামিগরবিনী চন্দ্রার প্রাণের আনন্দে চোখে জল এল।...

দেখতে দেখতে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে ন'টি বৎসর কেটে গেল। এখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার বড় হয়েছে। কন্যা কাত্যায়নীও বিবাহযোগ্যা। কামারপুকুরের উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দু'মাইল দূরে আনুড় গ্রামের কেনারাম বাঁড়ুজ্যের হস্তে সমর্পণ করলেন কাত্যায়নীকে এবং কেনারামের ভগ্নীর সঙ্গে বিবাহ হল রামকুমারের।

ক্রমে রামকুমার ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়েছে। ধীরে ধীরে সে নিজের স্কন্ধে তুলে নিল সংসারের অনেক দায়িত্ব। রঘুবীরের দয়ায় ক্ষুদিরামের সংসারের অবস্থা এখন অনেকটা সচ্ছল। তাঁর মনে দীর্ঘকাল-সঞ্চিত তীর্থদর্শন-বাসনা জেগে উঠল, এবং সম্ভবতঃ সন ১২৩০ সালে তিনি পদব্রজে রওনা হলেন সেতুবন্ধ-রামেশ্বর-দর্শনে। দক্ষিণদেশের অনেক তীর্থ দর্শন করে, সেতুবন্ধ হতে ৺রামেশ্বর বাণলিঙ্গশিব নিয়ে এক বৎসর পরে তিনি দেশে ফিরলেন। রঘুবীর, শীতলার পাশে বাণেশ্বর-শিবও বসলেন। প্রায় ষোল বৎসর পরে, সন ১২৩২ সালে

চন্দ্রমণি আর একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। রামেশ্বরের তীর্থ-প্রত্যাগমনের পর এই পুত্র জন্মগ্রহণ করায় ক্ষুদিরাম তার নাম রাখলেন—রামেশ্বর।

*　　　*　　　*

কাত্যায়নীর কঠিন অসুখ। তাকে দেখতে ক্ষুদিরাম গিয়েছেন তার শ্বশুরবাড়ি আনুড়ে। পীড়িতা কন্যার হাবভাব দেখে তাঁর মনে হল—ভূতাবেশ। ধ্যানস্থ হলেন ক্ষুদিরাম। পরে প্রেতযোনিকে সম্বোধন করে বললেন—"তুমি ভূত-প্রেত-দানব যে-ই হও, আমার মেয়েটিকে অকারণে কেন কষ্ট দিচ্ছ? অবিলম্বে এর শরীর ছেড়ে চলে যাও বলছি।" কাত্যায়নীর মুখে সেই প্রেতাত্মা বললে—"আমি বড় কষ্টে আছি। আপনি যদি গয়ায় পিণ্ড দিয়ে আমায় উদ্ধার করতে রাজী হন, তা'হলে আপনার কন্যাকে ছেড়ে চলে যাব।"

প্রেতাত্মার কষ্টশ্রবণে ক্ষুদিরামের প্রাণ কেঁদে উঠল। বললেন তিনি—"আমি পিণ্ডদান করলে যদি তুমি উদ্ধার হয়ে যাও তো আমি অবশ্য পিণ্ড দেব। কিন্তু তাতেই যে তুমি উদ্ধার পাবে তার প্রমাণ কি?" তখন প্রেত ক্রন্দনের সুরে বলল—"তার প্রমাণ নিশ্চয় পাবেন। এই সামনের নিমগাছের বড় ডালটি ভেঙ্গে দিয়ে যাব।"

ক্ষুদিরাম গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করার পরে নিমগাছের বড় ডালটি একদিন দিনদুপুরে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ল মড়্‌মড়্‌ করে। কাত্যায়নীও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। জীবদুঃখ-মোচনই ক্ষুদিরামকে গয়াধাম-গমনে প্রণোদিত করেছিল। কিন্তু তার পশ্চাতে যে দৈব-ইঙ্গিত ছিল, তা কি তখন কেউ জানত?

সন ১২৪১ সালের শীতের শেষে ক্ষুদিরাম গয়াদর্শনে যাত্রা করেন। তখন হাঁটা পথ। তথায় পৌঁছলেন চৈত্রের প্রথমে। তিনি প্রথম ৺কাশীবিশ্বনাথকে দর্শন করে পরে গয়ায় আসেন। মধুমাসে গয়াধামে পিণ্ডদান প্রশস্ত।

প্রায় একমাসকাল ঐ পুণ্যধামে বাস করে তিনি যথাশাস্ত্র পিতৃকার্যাদি সমাপন করলেন। পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, পূর্বপুরুষদের ঋণ সর্বাংশে পরিশোধ করে ক্ষুদিরাম পরম তৃপ্তিলাভ করেছিলেন। মন থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল। স্বচ্ছন্দ প্রাণে শ্রীভগবানের অপার করুণা স্মরণ করে তাঁর দেহ পুলকিত। রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। দেবস্বপ্ন দেখলেন—শ্রীমন্দির, বিষ্ণুপাদপদ্মে তিনি পিণ্ড দিচ্ছেন। জ্যোতির্ময় দেহে তাঁর পিতৃপুরুষগণ আনন্দে সেই পিণ্ড গ্রহণ করছেন। তদ্দর্শনে তিনি আনন্দে আত্মহারা।

পরক্ষণেই দেখেন—স্নিগ্ধজ্যোতিতে মন্দির উদ্ভাসিত। দীপ্ত হেমময় সিংহাসনে দিব্যকান্তি, জ্যোতির্ময় দেবতার আনন্দঘন মূর্তি। সূক্ষ্মদেহিগণ করযোড়ে সেই পরমপুরুষের স্তব করছেন। সেই বরেণ্য দেবতা স্নিগ্ধপ্রসন্ন দৃষ্টিতে দেখছেন। স্মিতমুখে ইঙ্গিত করে তাঁকে কাছে ডাকলেন। আনন্দে অধীর হয়ে কাঁদতে লাগলেন ক্ষুদিরাম। তখন সেই দিব্যপুরুষ মধুর স্বরে বললেন—"ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে আমি তুষ্ট হয়েছি, তোমার সেবা গ্রহণ করবার জন্য তোমার পুত্ররূপে জন্মাব।"

কাঁদতে কাঁদতে ক্ষুদিরাম বলছেন—"আমি যে বড় গরীব! আপনার সেবা কি করে করব, প্রভু!" স্নেহবিগলিত কণ্ঠে পরম-দেবতা বললেন—"ভয় কি, ব্রাহ্মণ? তুমি যেভাবে সেবা করবে

তাতেই আমি তৃপ্ত হব।" ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। এমন সময় তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। আনন্দ ও বিস্ময়ে ভাবলেন ক্ষুদিরাম—দেবস্বপ্ন তো মিথ্যা হয় না! তবে কি শ্রীভগবান জন্ম নেবেন তাঁর পুত্ররূপে! আর ভাবতে পারে না ক্ষুদিরাম। তৃপ্তির উন্মাদনায় তিনি আত্মহারা হয়ে গেলেন। এমন ভাগ্য আমার ন্যায় অকিঞ্চনের! কয়েক দিন পরেই তিনি গৃহে ফিরে এলেন। কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্ত একান্ত গোপনে রাখলেন আপন হৃদয়ের মণিকোঠায়।···

ক্ষুদিরাম যখন গয়াধামে তখন একদিন চন্দ্রমণি দাঁড়িয়ে আছেন বাড়ির পাশে যোগীদের শিবমন্দিরের সামনে। তাঁর বয়স্যা ধনীর সঙ্গে কথা বলছেন। হঠাৎ দেখলেন—মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ থেকে দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে মন্দির ভরে গেল। ক্রমে সেই জ্যোতি প্রবল তরঙ্গাকারে ছেয়ে ফেলে তাঁর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করল। তিনি এককালে মূর্ছিতা হয়ে গেলেন।···দিনে দিনে চন্দ্রাদেবী অনুভব করলেন—সেই জ্যোতি তাঁর উদরে প্রবেশ করেছে এবং তিনি অন্তর্বত্নী হয়েছেন।···

বিষ্ণু পুত্ররূপে আসবেন—ক্ষুদিরামকে গয়াধামে বলেছিলেন। এদিকে শিব জ্যোতিরূপে প্রবেশ করলেন চন্দ্রমণির উদরে! স্বরূপতঃ তাঁরা যে এক! নামে মাত্র ভেদ। রূপ! পরমদেবতার তিনটি বিশেষ রূপ—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব। আবার তিনিই ধরেছেন বহু রূপ।···

শিবমন্দিরের সেই ঘটনার পর হতে নানা দেবদেবী-দর্শন—স্বপ্নে ও জাগরণে—চন্দ্রাদেবীর জীবনের নিত্যঘটনা। তাঁরা যেন তাঁর ঘরের লোক। অশরীরিগণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন।

তাঁদের দিব্যদেহের পুণ্যগন্ধে চারিদিক পরিপূরিত হত। আবার শুনতেন মধুর নূপুরধ্বনি; কখনো দৈববাণী শুনে তিনি স্তম্ভিতা হতেন। দয়াদাক্ষিণ্য ও সেবাযত্নের জীবন্ত মূর্তি চন্দ্রাদেবীর বাৎসল্য-ভাব এখন আরো বেড়ে গেল। দেবতা-মানুষ—সকলের উপর। কারো শুকনো মুখ দেখলে তাঁর মাতৃপ্রাণ করুণায় বিগলিত হয়ে উঠত।...

গয়াধাম হতে ফিরে এসে ক্ষুদিরামের প্রথমেই চোখে পড়ল—স্ত্রীর দেহ-মনের পরিবর্তন। চন্দ্রাদেবী এত সরলা ছিলেন যে, প্রাণের স্পন্দনটি পর্যন্ত স্বামীর কাছে না জানিয়ে তৃপ্তা হতেন না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে যা যা ঘটেছে, সব বললেন তাঁকে। শুনে গয়ার স্বপ্ন যে বাস্তব তাতে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না ক্ষুদিরামের। তিনি ভীতা-চিন্তিতা স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—"গয়াধামে শ্রীভগবান অলৌকিক উপায়ে জানিয়েছেন যে, তিনিই আসবেন আমাদের পুত্ররূপে।" শুনে আনন্দে অধীরা হলেন চন্দ্রমণি। এ-ও কি সম্ভব?...

জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে গর্ভে ধারণ করা অবধি চন্দ্রার অঙ্গ-কান্তি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর সমবয়সীরা বলাবলি করতে লাগল—"বুড়ো বয়সে এত রূপ! ব্রাহ্মণী এবার বাঁচলে হয়।"

চন্দ্রাদেবীর গুর্বীদশা যত বাড়তে লাগল, তত বাড়ল তাঁর অলৌকিক দর্শনাদি। একদিন দেখছেন—এক হংসারূঢ় দেবতা। প্রখর সূর্যতাপে সেই দেবতার সকরুণ মুখখানি রাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। দেখে চন্দ্রার মাতৃহৃদয় স্নেহে উদ্বেল হয়ে উঠল। সেই দেবতাকে

তিনি সস্নেহে বললেন—"ওরে বাছা, হাঁসে-চড়া ঠাকুর, রোদে তোর মুখখানি যে শুকিয়ে গেছে। ঘরে আমানি পান্তাভাত আছে, তা-ই দু'টি খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ।" ঐ স্নেহসম্ভাষণে ঠাকুরটি মিষ্টি হেসে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। চন্দ্রাদেবীর এসব দর্শন হত সহজ অবস্থায়—সাদা চোখে।

ক্ষুদিরাম বিস্ময়ে স্ত্রীর মুখে এ-সব শুনতেন এবং মুগ্ধ হয়ে যেতেন। পুলকিত প্রাণে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন সেই শুভদিনের—ভাস্বর-জ্যোতির অরুণিমার।...

* * *

৬ই ফাল্গুন, বুধবার। রাত্রি শেষ; অর্ধদণ্ডমাত্র বাকী। চন্দ্রমণি প্রসববেদনা অনুভব করলেন এবং ধনীর সাহায্যে আশ্রয় নিলেন ঢেঁকিশালায়। অবিলম্বে এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ধনী প্রসূতিকে সময়োচিত সাহায্য করে দেখে যে, নবজাতককে পাওয়া যাচ্ছে না। ত্রস্তভাবে অনুসন্ধান করে পেলেন শিশুকে—ধান সিদ্ধ করার চুল্লীর ছাইয়ের মধ্যে। অথচ শিশু চুপচাপ শান্ত। এতটুকু কান্না নেই! বিভূতি-ভূষিত ছেলেকে কোলে নিয়ে ধনী দেখল—অপরূপ দেবশিশু! আর কত বড়—যেন ছ'মাসের ছেলে!...

শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম বালকের জন্মলগ্ন নিরূপণ করে দেখলেন—পরম শুভলগ্ন। বুঝলেন—নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে স্বয়ং গদাধরই এসেছেন। তা-ই নাম রাখলেন গদাধর। পরে বিশিষ্ট জ্যোতির্বিৎগণ নবজাতকের জন্মক্ষণ গণনা করে নির্দেশ করলেন—"এতাদৃশ ব্যক্তি ধর্মবিৎ ও মহাবরণীয় হবেন এবং সর্বদা পুণ্যকর্মের

অনুষ্ঠানে রত থাকবেন। বহুশিষ্য-পরিবৃত হয়ে দেবমন্দিরে বাস করবেন এবং নূতন ধর্মমার্গ প্রবর্তিত করে নারায়ণ-অংশসম্ভূত মহাপুরুষরূপে জগতে খ্যাতিলাভ করে সকল মানবের পূজ্য হবেন।"[১]

---

১ 'রামকৃষ্ণ' নামের আদি নিয়ে মতভেদ আছে। স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গে' (সাধকভাব) লিখেছেন—"আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষাদানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরম ভক্ত সেবক শ্রীযুক্ত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটিই আমাদের সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।"

তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে আসেন ১২৭১ সালে (১৮৬৪-৬৫ খৃঃ, 'লীলাপ্রসঙ্গ')। অথচ মন্দিরের দপ্তরের বরাদ্দ-খাতায় ১২৬৫ সালে (১৮৫৮ খৃঃ) শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যরূপে ঠাকুরের নামের উল্লেখ রয়েছে ('কথামৃত', ২য় ভাগ, ৭ম সংস্করণ)। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য শ্রীরাধাকান্তজীর মন্দিরে পূজক—পাঁচ টাকা মাইনে ইত্যাদির উল্লেখ আছে। অর্থাৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের প্রায় সাত বৎসর পূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ-নামের লিখিত উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীঠাকুরও পরবর্তী কালে বলতেন, তাঁর পূজা দেখে মোহিত হয়ে হলধারী (ঠাকুরের খুল্লতাত জ্যেষ্ঠভ্রাতা) তাঁকে কতদিন বলেছেন—'রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনেছি।' ('লীলাপ্রসঙ্গ')। এ ঘটনাও তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বে—শ্রীঠাকুরের দিব্যোন্মাদ-অবস্থার সময়।

মথুরবাবু যে 'রামকৃষ্ণ' নাম দিয়েছিলেন তারও কোন প্রমাণ বা কারণ পাওয়া যায় না।

ঠাকুরের বংশতালিকা:—মাণিকরাম। ক্ষুদিরাম, রামশীলা, নিধিরাম, রামকানাই। রামকুমার, রামেশ্বর···। রাম-অক্ষয়, রামলাল, শিবরাম।

উপর্যুক্ত নামের তালিকা-দৃষ্টে মনে হয়, 'রামকৃষ্ণ' তাঁর বংশানুক্রমিক নাম। আমরা এ গ্রন্থে বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরকে গদাধর ও রামকৃষ্ণ এ দুই নামে অভিহিত করব।

দিন দিন শিশু শশিকলার ন্যায় বাড়তে লাগল। আর ঐ ক্ষুদ্র শিশুটির কি অলৌকিক আকর্ষণ! নির্লিপ্ত সংসারী ক্ষুদিরামকেও এ শিশু যেন স্নেহপাশে বেঁধে ফেলেছে। কমনীয়-কান্তি শিশুটিকে তিনি চোখের আড়াল করতে পারেন না। চন্দ্রমণি তো শিশুগত-প্রাণ! বালকের দিব্য আকর্ষণ পিতা-মাতার উপর নিবদ্ধ না থেকে অলঙ্ঘনীয় প্রভাব বিস্তার করল সমস্ত পল্লীবাসীদের উপর।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্ম থেকেই অনেক কিছু অলৌকিক দেখিয়ে-ছিলেন; তবু বাৎসল্যরস সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল পিতামাতার হৃদয়ে। তাঁরা কৃষ্ণকে আদরের 'গোপাল' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি। গদাধরের জন্মের পূর্ব থেকেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী অনেক কিছু অলৌকিক ব্যাপার দেখেছেন—দিব্যদর্শন, দিব্যশ্রবণ করেছেন। তবু পিতামাতার প্রাণ সে সবে বোধ মানে না।

শিশুর বয়স সাত-আট মাস। চন্দ্রমণি স্তন দিয়ে বালককে মশারির নীচে শুইয়ে এসেছেন। শিশু অকাতরে ঘুমুচ্ছে দেখে তিনি গৃহকর্মে রত হলেন। মাঝে মাঝে দেখে আসেন ছেলেকে। একবার এসে দেখেন যে, মাশারির ভিতর শিশু নেই! তার স্থানে মশারিজুড়ে শুয়ে আছে এক দীর্ঘকায় পুরুষ! চন্দ্রমণি আতঙ্কে কেঁদে উঠলেন। চিৎকার শুনে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে এলেন ক্ষুদিরাম। চন্দ্রাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন এবং দেখলেন যে মশারির ভিতর শিশু অকাতরে ঘুমুচ্ছে!…

·· হামাগুড়ি-দেওয়া শেষ করে গদাই এখন 'হাঁটিহাঁটি পা পা'—করে চলতে শিখেছে। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে দাঁড়ায়—মায়ের

স্নেহচুম্বনের আশায়। চন্দ্রমণি গদাইকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দেন। ক্ষুদিরাম রঘুবীরকে সাজাবেন বলে একমনে সুরভি ফুলের মালা গাঁথছেন। গদাই পেছন থেকে এসে বাবার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণির নয়নমণি! ক্রমে আরো বড় ও দুরন্ত হয়ে উঠেছে গদাই। মা তাকে মাঝে মাঝে ধুতি-চাদর পরিয়ে দেন। বেশ মানায়, যেন বালক গৌরাঙ্গ। এই সময়ে গদাইর খেলার সাথী জুটে গেল—একটি ছোট বোন জন্মগ্রহণ করেছে।...

গদাই সবেমাত্র আধ আধ কথা বলতে শিখেছে। ক্ষুদিরাম তাকে কোলে করে নিজ পূর্বপুরুষদের নামাবলী, দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তব, প্রণামাদি আবৃত্তি করাতেন, অথবা শুনাতেন। রামায়ণ-মহাভারতের কোন বিচিত্র উপাখ্যান দু-এক বার শুনেই গদাই সে-সব পরিষ্কার পুনরাবৃত্তি করছে দেখে ক্ষুদিরামের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। এই করে ক্ষুদিরাম বালককে অনেক কিছু শেখাতে লাগলেন। কিন্তু ধারাপাতের নামতা যখন শেখাবার চেষ্টা করলেন—গদাই কিছুতেই তা পড়বে না। শিশুবোধে ক্ষুদিরাম বেশী পীড়াপীড়ি করতেন না। তাকে শুধু স্তব-স্তুতিই খুব শিখাতে লাগলেন, অল্পদিনেই গদাই মুখে মুখে অনেক কিছু শিখল বাবার কাছ থেকে। ·

পঞ্চম বর্ষে যথাশাস্ত্র বিদ্যারম্ভ করিয়ে ক্ষুদিরাম গদাধরকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। বাড়ির খুব কাছে গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বিস্তৃত মণ্ডপে পাঠশালা বসে, সকাল বিকাল দু'বেলা। গদাই সমবয়সীদের পেয়ে খুবই খুশী হল। লেখাপড়া ছাড়াও

খেলাধুলার বড় সুবিধে। অবসর-সময়ে সঙ্গীদের নিয়ে সে খেলায় মেতে যায়।...

পাঠশালায় গদাধরের পড়াশুনা মন্দ অগ্রসর হল না। অল্পকালের মধ্যেই সে সাধারণভাবে লিখতে পড়তে শিখল। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের উপর তার বিশেষভাবে বিতৃষ্ণা। বালকের প্রতিভার বিকাশ দেখা যেত, নিত্য-নূতন উদ্ভাবনী শক্তিতে ও অনুকরণ-প্রিয়তায়, দেবদেবী-মূর্তি-গঠন ও চিত্রাঙ্কনে। গদাধর যা একবার শুনে বা দেখে তা কখনই বিস্মৃত হয় না। গ্রামে কথকতা ও যাত্রাগান প্রায়ই হত। গদাই শুনে শুনে অনেক ভজনগান, শাস্ত্রোপাখ্যান ও যাত্রার পালা শিখে ফেলল। ক্ষুদিরাম লক্ষ্য করলেন—বালক অকপট ও নির্ভীক। নিজের দোষত্রুটী কখনো গোপন করে না আর প্রাণান্তেও মিথ্যা কথা বলে না। সর্বোপরি বালকের স্বভাবজাত সহজ সরল দেবভক্তি ক্ষুদিরামকে স্মরণ করিয়ে দিত বালকের জন্মসম্বন্ধে গয়াধামে দৃষ্ট স্বপ্নকথা।...

কুসুমকোরকে সৌরভ যে সঞ্চিত আছে—তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন পুষ্পটি বিকশিত হয়। সেই সৌরভ-উচ্ছ্বাসের ন্যায় ঠিক কোন্ সময়ে যে গদাধরের ঐশী স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা রেখা কেটে সঠিক করে বলা সুকঠিন। রামকৃষ্ণ-জীবনে দিব্যভাবাবেশের প্রথম বিকাশ হয়েছিল অতি শৈশবেই। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছ-বছর। সকল দেশে সাধারণ বালক-বালিকারা যে বয়সে খেলাধুলায় মত্ত থাকে, সেই বয়সে তাঁর হয়েছিল প্রথম ঈশ্বরাবেশ।...

পরবর্তী জীবনে দক্ষিণেশ্বরে ঐ ঘটনা তিনি নিজ মুখে

বলেছিলেন। তাঁর ভাষাই আমরা উদ্ধৃত করছি—"সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে। আমার তখন ছয় কি সাত বৎসর বয়স। একদিন সকাল বেলায় টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আল্‌পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তা-ই দেখছি ও (মুড়ি) খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় এক ঝাঁক দুধের মত সাদা বক ঐ কালমেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। সে এক রকম বাহার হল! দেখতে দেখতে অপূর্বভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হল যে, আর হুঁশ রইল না। পড়ে গেলুম। মুড়িগুলি ছড়িয়ে গেল আলের ধারে। কতক্ষণ যে ঐভাবে পড়েছিলাম, বলতে পারি নে। লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁশ হয়ে যাই।"

এই ঘটনা ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রাদেবীকে খুবই উদ্বিগ্ন করেছিল। তাঁদের ধারণা—গদাইর উপর কোন উপদেবতার ভর হয়েছে অথবা উহা মূর্ছারোগ। যদিও গদাধর পুনঃ পুনঃ তাঁদের বলেছিল—সে সংজ্ঞাহীন হয় নি; ঐ সময়ে তার মনপ্রাণ অপূর্ব আনন্দে আপ্লুত হয়ে এক অভিনব ভাবে লীন হবার ফলেই ঐরূপ অবস্থা হয়েছিল। তবু তাঁরা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও ঔষধাদি ব্যবহার করাতে ত্রুটী করেন নি।

* * *

এর কিছুকাল অর্থাৎ প্রায় দেড় বৎসর পরে কামারপুকুরের দরিদ্র চাটুজ্যে-পরিবারে এক মহাশোকাবহ ঘটনা সকলকে

হতবুদ্ধি করে ফেললে। ক্ষুদিরামের আকস্মিক দেহত্যাগ! ক্ষুদিরামের বয়স অষ্টষষ্টিতম। শরীর বিশেষ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ভাগিনেয় রামচাঁদের সেলামপুরের বাড়িতে শারদীয়া দুর্গোৎসবে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও তিনি গেলেন। সঙ্গে রামকুমার। কিন্তু তথায় পৌঁছেই তিনি কঠিন গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন। খুবই বাড়াবাড়ি অসুখ। ৺পূজার তিন দিন কেটে গেল কোন প্রকারে। কিন্তু দশমী দিন প্রতিমাবিসর্জনের পূর্ব হতেই তিনি নির্বাক ও হতচেতন হয়ে গেলেন। নিরঞ্জনের পরে রামচাঁদ এসে দেখে যে, মামার অন্তিমকাল উপস্থিত। কাঁদতে কাঁদতে রামচাঁদ বললে,—"মামা মামা, তুমি যে সর্বক্ষণ রঘুবীর রঘুবীর বলতে, এখন সে-নাম করছ না কেন?" রঘুবীরের নাম শুনেই ক্ষুদিরামের সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি কম্পিতকণ্ঠে জবাব দিলেন—"কে, রামচাঁদ? প্রতিমা-বিসর্জন করে এলে? তা'হলে আমায় একবার বসিয়ে দাও। আমি বসে শরীর ছাড়ব।" সন্তর্পণে তাঁকে বিছানার উপর বসিয়ে দেওয়া হল। পূত-গম্ভীর স্বরে তিনবার রঘুবীরের নাম উচ্চারণ করে ক্ষুদিরাম প্রশান্তমনে ধীরে ধীরে 'শ্রীরামচরণে' চিরলীন হলেন।

২

কামারপুকুরের এ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণপরিবারে দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু দুঃখ ছিল না। ক্ষুদিরামের রামগত-জীবন আনন্দ বিচ্ছুরিত করত চারিদিকে। তাঁর সেই শান্ত-সৌম্য মূর্তি শুধু নিজ পরিবারটিকে নয়, সমগ্র গ্রামবাসীদের দিত দিব্য আনন্দ। ক্ষুদিরামের অকাল মৃত্যুতে সর্বাপেক্ষা বেশী আঘাত পেল বালক গদাধর। তিনি শুধু যে তার স্নেহময় পিতা ছিলেন তা নয়। ক্ষুদিরামের দেবোপম জীবন দিব্যপ্রভাব বিস্তার করেছিল গদাধরের জীবনে। তিনি ছিলেন একাধারে প্রেমময় পিতা ও জ্ঞানময় গুরু। ক্ষুদিরামের মধ্যে গদাধর পেয়েছিল—আদর্শ মানব, আর ক্ষুদিরাম দেখেছিলেন গদাইর মধ্যে—শিশু-ভগবান।

পিতার মৃত্যু গদাধরের প্রজ্ঞাময় মনে চকিতে উদ্ঘাটিত করল সংসারের বাস্তব রূপ। গৌতম-বুদ্ধ বার্ধক্য, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দেখে জীবনের অনিত্যত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন। যে দৃশ্য গৌতমের যুবক-মনে জগতের বাস্তব রূপ প্রকটিত ক'রে তাঁকে যতি-জীবনের প্রেরণা দিয়েছিল—সেই অনুপ্রেরণা বালক গদাধর পেল পিতার মৃত্যুরূপ একটি মাত্র সাধারণ ঘটনা থেকে। তখন হতেই জগৎ ও জাগতিক সব কিছুর উপর গদাধরের এল তীব্র বৈরাগ্য। বালকের রঙ্গরসপ্রিয়তা, নৃত্যগীতাদি রূপান্তরিত হল গভীর ভাবুকতায়। ভূতির খালের শ্মশান বা মানিকরাজার আম্রকানন প্রভৃতি নির্জন স্থানে তখন হতে

বালককে প্রায়ই একাকী বিচরণ করতে দেখা যেত। কিন্তু নিজের মনের বৈরাগ্য-অনলের আঁচ পাছে অন্য কেউ টের পায়, সেজন্য বাহ্যিক ব্যবহারাদিতে গদাধর খুবই সতর্ক, বিশেষকরে নিজ জননীর নিকট। মায়ের কাছে কাছে থাকা, দেবসেবা ও গৃহকর্মাদিতে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করা, গদাধরের এখন নিত্যকর্ম।

গ্রামের পাশ দিয়েই ৺পুরীধামের হাঁটা-পথ। প্রতি বৎসর বহু দরিদ্র-যাত্রী ও সাধু-বৈরাগী ঐ পথে জগন্নাথ-দর্শনে গমনাগমন করে। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের অতিথিশালায় প্রতিদিনই ভিড় লেগে যেত যাত্রীদের। গ্রামের ঘরে ঘরে সাধুসেবার জন্য ছিল দরাজ ব্যবস্থা।

চন্দ্রমণির দাক্ষিণ্য ও সেবাযত্নের আকর্ষণে বহু সাধুর আগমন হত ক্ষুদিরামের ক্ষুদ্র কুটীরে। তিনি নিজে উপোসী থেকেও সাধুদের সিধা দিতেন। চন্দ্রাদেবী মুখের গ্রাস তুলে ধরতেন গরীব কাঙ্গালদের হাতে। সকলেই জানত—চন্দ্রমণি কাউকে রিক্তহস্তে ফিরতে দেবেন না।

পিতার মৃত্যুর পর হতে গদাধর সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গপ্রিয় হয়ে উঠল। সুদর্শন সেই দেববালকের মধুর আচরণ ও প্রাণঢালা সেবাতে পরিতুষ্ট হয়ে সন্ন্যাসিগণ তাকে ভগবদ্ভজন ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা দিতেন এবং অকুণ্ঠ আশীর্ব্বাদ করতেন। সাধুগণ বালক গদাধরকে এতই ভালবাসতেন যে, কেউ বা তাকে সাজিয়ে দিতেন বিভূতি দিয়ে—কোনদিন বা তিলক-চন্দন ধারণ করাতেন। আবার কেহ বা তাকে ডোর-কৌপীন পরিয়ে বালক-সন্ন্যাসী সাজিয়ে আনন্দ করতেন।

ঐকালের আর একটি ঘটনা গদাধরের জীবনে এক নূতন অধ্যায় সূচিত করেছিল। বালকের বয়স তখন আট বৎসর। তখনো উপনয়ন হয় নি। একদিন কামারপুকুরের দু'মাইল উত্তরে আনুড় গ্রামে জাগ্রতাদেবী ৺বিশালাক্ষীর মন্দিরে মানত দেবার জন্য যাচ্ছিল গ্রামের প্রসন্নময়ী-প্রমুখা অনেক স্ত্রীলোক। সকলের সঙ্গে গদাধরও চলল দেবীদর্শনে। প্রান্তরপথে যেতে যেতে সঙ্গিনীদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে গদাধর দেবীমহিমা গান করতে লাগল। বালক প্রাণ ঢেলে মধুর কণ্ঠে গাইছে মায়ের নাম। হঠাৎ গান গাইতে গাইতে চুপ হয়ে গেল গদাই। চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা। অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আড়ষ্ট, মুখে স্বর্গীয় আভা। রোদ লেগে কোমল বালকের সর্দি-গর্মি হয়ে থাকবে ভেবে রমণীগণ বিশেষ উদ্বিগ্না হলেন। কেউ দিচ্ছে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা, কেউ পাখা দিয়ে বাতাস করছে। কিন্তু বালকের কোন সংজ্ঞা নেই। জনহীন প্রান্তর— এখন উপায় ?

হঠাৎ প্রসন্নময়ীর মনে হল—গদাইর উপর দেবীর ভর হয়নি তো ? প্রসন্নের কথায় সকলেই কাতরপ্রাণে দেবীর নিকট প্রার্থনা করতে লাগল। আশ্চর্য ! রমণীগণ কিছুক্ষণ দেবীর নামগান করার পরেই গদাধরের বদনমণ্ডলে ফুটে উঠল দিব্যহাস্যচ্ছটা। ধীরে ধীরে সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা দিল। তখন সকলেই বুঝল যে, বালকের উপর দেবীর ভর হয়েছে। ক্রমে প্রকৃতিস্থ হল গদাই। তখন সকলে আনন্দে দেবীস্থানে উপস্থিত হয়ে যথাবিধি পূজাদি সমাপনান্তে বাড়ীতে ফিরে এল। চন্দ্রাদেবী সব শুনে খুবই উদ্বিগ্না হলেন পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য। গদাধর কিন্তু মাকে পুনঃপুনঃ

বলেছিল যে, দেবীর চিন্তা করতে করতে তার মন লীন হয়ে গিয়েছিল দেবীর পাদপদ্মে।

*　　　*　　　*

নবমবর্ষ উত্তীর্ণ হতে চলেছে দেখে চন্দ্রাদেবী ও রামকুমার গদাধরের উপনয়নের আয়োজন করতে লাগলেন। দরিদ্র পরিবারের সাত্ত্বিক আয়োজন। দিন স্থির হয়েছে।…

ধনী কামারণী গদাধরের আঁতুড় ঘরে গিয়েছিল। উনুনের ছাই-এর গাদা থেকে তুলে ধনীই তাকে প্রথম কোলে নিয়েছিল। বালবিধবা নিঃসন্তান ধনী। তার প্রাণের সবটুকু বাৎসল্যরস নিংড়ে দিয়েছিল গদাইর উপর। গদাইর মুখে মা-ডাক না শুনলে, তাকে লুকিয়ে একটু কিছু খাওয়াতে না পারলে ধনীর দিন যেন আর কাটে না! একদিন অশ্রুপূর্ণলোচনে বালকের নিকট প্রাণের আর্তি জানিয়ে ধনী বলল—সে যেন উপনয়নকালে তাকে মা বলে ডেকে তার হাত থেকে প্রথম ভিক্ষা নেয়। গদাধর ধনীর আন্তরিকতায় দ্রব হয়ে তার অভিলাষ পূর্ণ করতে স্বীকৃত হয়েছিল। তদবধি ধনী একটি একটি করে পয়সা জমাচ্ছে—গদাধরের ভিক্ষামাতা হবার আশায়।

সেই উপনয়নকাল উপস্থিত। রামকুমারের নিকট গদাধর তার প্রতিশ্রুতির কথা জানাতেই দৃঢ়স্বরে রামকুমার বললেন—"তা কি করে হয়? ধনীর জন্ম যে নীচ কুলে! আমাদের বংশে কখনো তো এমনটি হয় নি! আর হতেও পারে না।"—ক্ষুদিরাম ছিলেন সদাচারী, অশূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ। গদাধরও পিতার ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর কথা জানত, তথাপি সে জেদ করতে লাগল। রামকুমারও

বংশমর্যাদা-রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর। গদাধরও নিজ সত্যরক্ষার সঙ্কল্পে অচল অটল। সে বলল—"সত্যভ্রষ্ট, মিথ্যাচারী ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞসূত্রধারণে কখনো অধিকারী হতে পারে না।" ব্যাকরণ, কাব্য ও স্মৃতির পণ্ডিত রামকুমার। ন'বৎসর বয়স্ক অপরিপক্ব-বুদ্ধি ঐ বালকের মুখে অত বড় কথা আশা করেন নি, আর গদাইর এহেন দার্ঢ্য দেখে তিনি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত পিতৃসুহৃদ্ ধর্মদাস লাহার মধ্যস্থতায় গদাই জয়ী হল। সত্যই জয়লাভ করল।...সব কিছুর চাইতে সত্য বড়। সত্যই ধর্ম—ধৃতি। সত্যই পরম পুরুষার্থ।

নবমবর্ষবয়স্ক বালকের বাচনিক-সত্যরক্ষার জন্য এতটা দৃঢ়তা অমানবত্বদ্যোতক নয় কি ? সত্যস্বরূপকে কায়মনোবাক্যে আঁকড়ে ধরে থাকার স্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আবাল্য দেখতে পাওয়া যায়। এমন কি, ক্ষুদিরামও লক্ষ্য করে আনন্দিত হয়েছিলেন যে, বালক গদাই কখনো মিথ্যা কথা বলতে জানে না।

তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চারিপাদ ধর্মের মধ্যে কলিকালের জন্য 'সত্য'ই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—"সত্যকথা কলির তপস্যা।" আবাল্য কায়মনোবাক্যে সত্যপালন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আর একটা উজ্জ্বল দিক।

উপনয়নের পর হতে গদাধরের ভাবপ্রবণ মন রঘুবীরের সেবা-পূজা ও ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেল। মাঠে, বাটে, আম্রকাননে খেলুড়েদের সাথে যে বালক খেলায় কাটাত অনেক সময়, সেই গদাই এখন নবানুরাগে দেবপূজায় তন্ময়। অতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা সহকারে গদাধর পূজা করে রঘুবীরকে, বাণেশ্বর-শিবকে, শীতলা-মাতাকে। পূজা-

কালে অশ্রুসিক্ত হয়ে কাতর প্রার্থনা করে দেবদর্শনের জন্য। সে ব্যাকুলতা দেখে সকলের বিস্ময় লাগে। অল্পদিনের মধ্যে বিগ্রহ জীবন্ত হয়ে উঠল গদাধরের আকুল প্রার্থনায়। জাগ্রত দেবতার আবির্ভাব হল গদাইর পূত সরল হৃদয়ে। এখন গদাধরের প্রায়ই ভাবাবেশ হয়। দিব্যদর্শনের ফলস্বরূপ তার অঙ্গে ফুটে উঠেছে দিব্যকান্তি, বালক রূপান্তরিত—দেববালকে।

··ঐ সময়ে গদাধরের ধ্যানপ্রবণতা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। শিবরাত্রির দিন। গদাধরের বয়স তখন দশ বৎসর মাত্র। বালক যথারীতি উপবাসী থেকে শিবপূজাদিতে রাত্রি অতিবাহিত করতে কৃতসঙ্কল্প। প্রতিবেশী সীতানাথ পাইনদের বাড়িতে ঐ রাত্রিতে শিবমহিমাসূচক যাত্রার আয়োজন হয়েছে। গদাধর প্রথম প্রহরের পূজাসমাপনান্তে শিবধ্যানে মগ্ন, এমন সময় তার সমবয়সীরা এসে ধরে বসল যে, তাকে শিবের অভিনয় করতে হবে। যাত্রার দলে যে শিব সাজত, সে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় যাত্রা হবার আর কোন উপায় নেই।···

বন্ধুদের অনুরোধ কিছুতেই এড়াতে না পেরে তাকে অগত্যা রাজী হতে হল। শিব সেজে ধীরপদক্ষেপে আসরে এসে যখন গদাধর দাঁড়াল, তখন সকলের মনে হল যেন সাক্ষাৎ শিব এসেছেন নরদেহে। অভাবনীয় আনন্দের স্রোত বয়ে গেল জনতার মধ্যে। কেউ হরিধ্বনি করে উঠেছে। মেয়েরা উলু দিল—কেউবা শাঁখ বাজাল। শ্রোতৃমণ্ডলীকে শান্ত করবার জন্য স্বয়ং অধিকারী আরম্ভ করল শিবস্তুতি। এদিকে গদাধর শিবচিন্তায় তন্ময় ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ভাবাবেশে চিত্রপুত্তলিকার মত একই ভাবে দণ্ডায়মান। তার

দু'গণ্ড বয়ে চলেছে অশ্রুর ধারা। বহুক্ষণ পরেও যখন তার সম্বিৎ ফিরে এল না, তখন সকলেই মনে করল—গদাইর উপর শিবের ভর হয়েছে! যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল। অনেকে কাঁধে করে তাকে পৌঁছে দিল বাড়িতে। গদাধর সারারাত ভাবসমাহিত। এদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি চলেছে। ভোরবেলায় গদাধর সহজ অবস্থায় ফিরে এল।...

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে বালককাল হতেই সকল ভাবের উন্মেষ, সমাবেশ, বিকাশ ও চরম প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। ভূমার ধ্যানে, দেবীধ্যানে ও শিবধ্যানে তাঁর ভাবাবেশ হতে লাগল। রামকৃষ্ণের দেহটি ক্রমে যেন হয়ে দাঁড়াল সকল দেবদেবীর আবির্ভাব-স্থান। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে এমনটি আর কোন যুগে কোন অবতারে হয় নি।

গদাধরের বিদ্যাভ্যাস কতদূর অগ্রসর হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। বোধ হয় বেশী দূর নয়। কারণ অপরাবিদ্যার্জনে ও পার্থিব সুখলাভের উপর তার আবাল্য বিতৃষ্ণা। এই বয়সেই পরা ও অপরা বিদ্যার প্রভেদ সে জেনেছে। সে বুঝেছে—যা ভূমা তা-ই পরমসুখদায়ী। সম্বোধিলাভ করে ভূমাকে জানবার ও পাবার জন্য সে দৃঢ়সঙ্কল্প। 'তৎ'-লাভের অনুকূল সব কিছুতেই গদাধরের প্রীতি। রামায়ণ, মহাভারত সে এমন সুন্দর পাঠ করে যে, লোক দাঁড়িয়ে যায়! শ্রুতিধরত্বগুণে রামকৃষ্ণায়ণ-পুঁথি, যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা সব তার কণ্ঠস্থ।

ক্রমে তের-চৌদ্দ বৎসরে পদার্পণ করেছে গদাধর। এ সময়ের মধ্যে তাদের ঐ ক্ষুদ্র পরিবারের বিশেষ ঘটনা—রামেশ্বরের ও

সর্বকনিষ্ঠা সর্বমঙ্গলার বিবাহ, রামকুমারের প্রথম পুত্র রাম-অক্ষয়ের জন্ম এবং সূতিকাগৃহেই রামকুমারের পত্নীর মৃত্যু। রামেশ্বর যদিও কৃতবিদ্য, কিন্তু সংসারের কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য করতে তিনি অপারগ ছিলেন। অথচ রামকুমার যজন-যাজন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, স্মৃতির বিধান ও বিদায়-আদায়ে যা উপার্জন করতেন, সংসারের যাবতীয় খরচের পক্ষে তা পর্যাপ্ত হত না। ধীরে ধীরে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। সেজন্য বাধ্য হয়ে অধিক অর্থাগমের পথের সন্ধান তাঁকে করতে হল। অনেক ভেবে তিনি গেলেন কলিকাতায় এবং ঝামাপুকুরে টোল খুলে ছাত্রদের পড়াতে লাগলেন।···

গদাধরের ঐ সময়কার জীবন নিরন্তর ভগবদ্‌ভাবময়। নিত্য হৃদয়দেবতার পূজাদি ছাড়াও সে অনেক সময় কাটাত ধ্যানাদিতে। তার মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনবার জন্য প্রতিদিন বিকালে ক্ষুদিরামের অঙ্গনে বসত ক্ষুদ্র আসর। গদাধর কখনো রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণাদি পাঠ, আবার কখনো ভজনকীর্তন ক'রে সকলকে দিব্যানন্দ দিত। আবার সান্ধ্য সম্মিলনেও গ্রামের আবালবৃদ্ধ সকলে সমবেত হত। গদাধরের মধুর কণ্ঠের ভাবপূর্ণ মনোহারী ভজন সকলকে সিক্ত করত চোখের জলে। ঐ সময় হতেই তার জীবনে বয়ে চলেছিল একটি নিরবচ্ছিন্ন ভগবদ্-ভাবধারা—যার সুশীতল স্পর্শে শীতল হত বহুলোকের প্রাণ-মন। যা কিছু ঈশ্বরীয় তাতেই তার প্রীতি, অনুরাগ ও বিধৃতি। আর যা জাগতিক তাতে গদাধরের বিরাগ ও বিরক্তি।···

সাংসারিক কাজকর্ম-তত্ত্বাবধানের জন্য রামকুমার বৎসরান্তে

একবার করে বাড়িতে আসেন। তিনি দেখতেন—গদাইর আর সবই তো খুব ভাল, কিন্তু লেখাপড়ার দিকে খুবই ঔদাসীন্য। পিতৃহীন ছোট ভাইটির ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভেবে রামকুমারের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। অথচ স্নেহের গদাইকে কিছু বলতেও তাঁর মন সরত না।

রামকুমার কলিকাতায় কয়েক বৎসর চতুষ্পাঠী চালাচ্ছেন। চতুষ্পাঠীর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। টোলে পড়ান ছাড়াও, পাড়ার বিশিষ্ট ঘরে যজন-যাজনাদিতে রামকুমারের দু'পয়সা প্রাপ্তি ছিল। তিনি একা সব দিক আর সামাল দিতে পারছেন না। তখন তাঁর মনে পড়ল গদাইর কথা।—তাকে আনলে তো বেশ হয়! টোলে পড়বে। পূজা-অর্চনা করবে আর খাওয়া-দাওয়ার দেখাশুনার সাহায্যও হবে। ওর ভাবী জীবনেরও একটা উপায় হয়ে যাবে।

বাড়িতে এলেন রামকুমার। মা ও ভাইর সঙ্গে পরামর্শ করে গদাধরের কাছে কলিকাতা যাবার কথা পাড়লেন। অগ্রজের ইচ্ছা তার কাছে পিতৃ-আদেশ-তুল্য। এক কথায় রাজী হয়ে গেল গদাধর। শুভদিনে রঘুবীরকে প্রণাম করে, চন্দ্রমণির চরণধূলা ও স্নেহচুম্বন নিয়ে গদাধর দাদার সঙ্গে কলিকাতায় চলল।

৩

প্রথম কয়েকদিন মায়ের জন্য গদাধরের মন কেমন কেমন করত। অল্পদিনেই কেটে গেল সে ভাবটা। কলিকাতা শহরের রং-তামাসা দেখে নয়—মনোমত কর্ম পেয়ে। রামকুমার যে যে বাড়িতে পূজা করতেন, গদাধর ক্রমে সব কাজই হাতে নিল। তা ছাড়া দাদার সেবাযত্ন। অল্পদিনের মধ্যেই তার মধুর ভজনগান ও মিষ্ট ব্যবহারে প্রিয়দর্শন কিশোর যজমান-পরিবারবর্গের পরমপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বিশেষকরে গদাধরের ভক্তিপূর্ণ পূজা ও ধ্যানের তন্ময়তা সকলকার দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু পড়াশুনায় গদাধর সম-উদাসীন। কয়েক মাস রামকুমার তা লক্ষ্য করে করে একদিন একটু কড়া সুরেই বললেন—"পড়াশুনা যে মোটেই করছিস নে, ব্যাপার কি? তোর চলবে কি করে?" খানিক চুপ করে থেকে সহজ সুরেই গদাধর বলল—"এ-সব চালকলাবাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই নে। আমি এমন বিদ্যা শিখতে চাই, যাতে যথার্থ জ্ঞান হয় এবং মানব-জন্ম সার্থক হয়।" গদাইর কাছ থেকে এ জবাব রামকুমার আশা করেন নি। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। —গদাই বলছে কি! পড়াশুনাকে বলছে চালকলাবাঁধা বিদ্যা! সময়ান্তরে ভাইকে ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন ভেবে তখনকার মত তিনি চুপ হয়ে গেলেন। গদাধরের বয়স তখন সতর বৎসর মাত্র।···

আরো দু'বৎসর কেটে গেল। এ সময়ের মধ্যে রামকুমারের আর্থিক অবস্থা দিন দিন ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। নানা দুশ্চিন্তায় তাঁর শরীর মন অবসন্ন ও জর্জরিত, টোল বন্ধ করে অন্য কিছু করবেন কিনা তাই তিনি ভাবছেন। ·· এদিকে সাংসারিক সব কিছুর উপরই গদাধরের ঔদাসীন্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু তার ধ্যানের গভীরতা ও ভাবের তন্ময়তা দেখে রামকুমার একদিকে যেমন খুশী হচ্ছেন, অন্যদিকে হলেন চিন্তিত। ঐ সময়ে একটিমাত্র ঘটনা দু'জনের জীবনের গতিকেই নূতন পথে টেনে আনবার সূচনা করল।

*　　　　*　　　　*

কলিকাতার জানবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার রামচন্দ্র দাসের স্ত্রী রাসমণি। চার কন্যার মা। এমন সময় স্বামীর মৃত্যু হয়। অগাধ বিষয়-সম্পত্তি। স্বামীর মৃত্যুর পরে বিষয়-আশয়ের তত্ত্বাবধানের ভার নিতে হল রাসমণিকে নিজের হাতে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর অসাধারণ কর্মকুশলতায় জমিদারির অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হল। পুণ্যকর্মে অজস্র অর্থদান, অকাতরে অন্নদান, বহু জনহিতকর কর্মের অনুষ্ঠান এবং তাঁর অসীম সাহসিকতার সুযশ কলিকাতা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল দূর দূর স্থানে। তাঁর রাণী নাম সার্থক হল। তাঁর দেবীভক্তি এত গভীর ছিল যে, জমিদারি সেরেস্তার কাগজপত্রে নিজ নামের যে শিলমোহর ব্যবহার করতেন, তাতে লেখা ছিল—"কালীপদ-অভিলাষিণী শ্রীমতী রাসমণি দাসী।" দেবদ্বিজে ভক্তিমতী রাণী যদিও তথাকথিত নীচকুলোদ্ভবা, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন—দেবী-অংশ-সম্ভূতা, ভগবতীর অষ্ট-সখীর একজন।

দীর্ঘদিন হতেই রাণী কাশীতে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার দর্শনে যাবেন সঙ্কল্প করেছিলেন, কিন্তু অলঙ্ঘনীয় নানা কারণে এতদিন যাওয়া হয় নি। এখন তাঁর জামাতারা উপযুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে মথুরামোহন বিশ্বাস তো সকল কাজকর্মে তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ।

৺কাশীযাত্রার জন্য প্রচুর অর্থ পৃথক্ করে রাখা ছিল। ১২৫৫ সালে রাণী কাশী যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। অনেক নৌকা বোঝাই হল পূজোপকরণ ও নানা দ্রব্যসম্ভারে। সকল আয়োজন সম্পূর্ণ। কিন্তু যাত্রার অব্যবহিত পূর্বরাত্রে[১] ভগবতী ভবতারিণী জ্যোতির্ময় দেহে রাণীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন—"কাশী যাবার দরকার নেই। ভাগীরথীতীরে কোন মনোরম স্থানে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সেবাপূজাদির ব্যবস্থা কর। আমি এখানেই তোর নিত্য সেবাপূজা গ্রহণ করব।"

দেবীর প্রত্যাদেশ! রাণী কাশীযাত্রা স্থগিত করে ভগবতীর আদেশপালনে যত্নপর হলেন। কলিকাতার নিকটে বারাণসী-সমতুল্য গঙ্গার পশ্চিমকূলে শ্রীমন্দির-নির্মাণের উপযোগী স্থান অনেক চেষ্টাতেও না পেয়ে, অগত্যা গঙ্গার পূর্বকূলে—দক্ষিণেশ্বরে তিনি কিনলেন প্রায় ৬০ বিঘা জমি। ঐ জমির একাংশের মালিক ছিল—হেষ্টি সাহেব। আর বাকী অংশ ছিল কবরডাঙ্গা ও গাজীর পীরস্থান। স্থানটি দেখতে কূর্মপৃষ্ঠের মত। তন্ত্রমতে এরূপ

১ কারো মতে—রাণী কাশীযাত্রায় রওনা হয়ে প্রথম দিন বর্তমান দক্ষিণেশ্বরের ৺কালীমন্দিরসংলগ্ন গঙ্গাবক্ষে রাত্রিবাস করেন। সে সময়ই দেবীর প্রত্যাদেশ পান ও তিনি কাশীযাত্রা স্থগিত রাখেন।

স্থানই শক্তিসাধনার অনুকূল। দেবীর ইচ্ছাতেই পাওয়া গেল অমন স্থান।

মনোমত জায়গা পেয়ে, বহু অর্থব্যয়ে রাণী নির্মাণ করলেন—সুদৃশ্য নবরত্নশোভিত বিরাট কালীমন্দির, নাটমন্দির, দ্বাদশ শিবমন্দির, রাধাকান্তজীর মন্দির, চাঁদনী, সম্মুখে বাঁধা ঘাট, ভাঁড়ার ঘর, ভোগঘর, অতিথিশালা, নওবত, মনোরম উদ্যান, আরো কত কি! গঙ্গাবক্ষে বহুদূর হতে দেখা যেত দেবীদেউলের চূড়া। নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করতে লেগেছিল প্রায় নয় লক্ষ টাকা। পরে দেবীর সেবার জন্য প্রায় দু'লক্ষ টাকা দিয়ে রাসমণি কিনেছিলেন—দিনাজপুর জিলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার সালবাড়ি পরগণা।

এই দেবীদেউল-নির্মাণের সময় হতে দেবীমূর্তিপ্রতিষ্ঠা পর্যন্ত রাণী রাসমণি কঠোর ব্রতচারিণী হয়ে ছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন, ভূমিতলে শয়ন এবং যাবতীয় বিষয়কর্ম হতে বিরতা হয়ে অনন্যচিত্তে তিনি আরাধ্যদেবীর ধ্যান-চিন্তন করতেন।

সর্বসুলক্ষণযুক্তা দেবীমূর্তি নির্মিত হয়ে বাক্সবন্দী করা হল। কিন্তু রাণীর আন্তরিক ভক্তিতে মৃন্ময়ীমূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠলেন। তিনি আর বাক্সে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চান না, সেবা-পূজা নিতে চান। রাণীর উপর স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হল—"আমায় আর কতদিন এভাবে আবদ্ধ করে রাখবি? আমার যে এভাবে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, যত শীঘ্র পারিস্ আমায় প্রতিষ্ঠিতা কর।" নিদ্রাভঙ্গে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাক্স খুলে দেখেন—মূর্তি ঘেমেছে। রাণী অধীরা হয়ে পড়লেন। আসন্ন শুভদিনে মাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে—জেদ

করলেন রাণী। সামনের স্নানযাত্রা ও পূর্ণিমার পূর্বে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পেয়ে, ঐ দিনই দেবীপ্রতিষ্ঠার জন্য স্থির হল।…

প্রত্যাদেশ পেয়েই রাণী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা ও ভোগরাগের ব্যবস্থা করছিলেন। কিন্তু ভগবতীর ইচ্ছা পূর্ণ করার পক্ষে প্রবল অন্তরায় হল ব্রাহ্মণসমাজ। বাঙ্গলার খ্যাতনামা সকল ব্রাহ্মণই একবাক্যে বললেন—ব্রাহ্মণেতর অন্যবর্ণের ভগবতীকে অন্নভোগ দেবার অধিকার নেই। তখন রাণী ব্যাকুলা হয়ে, দিকে দিকে ব্যবস্থা চেয়ে পাঠালেন সমগ্র ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে। কিন্তু শূদ্রাণী-প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহকে অন্নভোগ দেবার ব্যবস্থা পাওয়া গেল না। ঐ মন্দিরে পূজা ও অন্নভোগ নিবেদন করা তো দূরে থাকুক, কোন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণই এমন কি প্রণাম করেও ঐ দেবী-বিগ্রহের মর্যাদা রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ব্রাহ্মণগণের হৃদয়হীনতায় রাণী একেবারে মুষড়ে পড়লেন।

ভগবতী খেতে চেয়েছেন, অথচ মাকে দু'টি অন্নভোগ দিতে পারব না ভেবে—বেদনায় তাঁর বুক ভরে গেল। এদিকে প্রতিষ্ঠার দিন নিকটবর্ত্তী, এমন সময় ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠী হতে বিধান এল—প্রতিষ্ঠার পূর্বে যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তাহলে সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা করে অন্নভোগের ব্যবস্থা করলে শাস্ত্রবিধি যথাযথ রক্ষিত হবে; এবং ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই অন্নপ্রসাদগ্রহণে কোন বাধা থাকতে পারে না।

রামকুমারের ঐ ব্যবস্থা পেয়ে রাণী ঘনান্ধকারে দেখতে পেলেন আশার আলো। তিনি তাঁর গুরুর নামে মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। কিন্তু গুরুবংশীয়দের মধ্যে পূজাদি-ক্রিয়াকর্মে

কেহই পারদর্শী ছিলেন না, সেজন্য দেবীপূজার জন্য উপযুক্ত পূজকের প্রয়োজন। অনেক চেষ্টায়ও কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শূদ্রাণীস্থাপিত মন্দিরে পূজক হতে সম্মত হলেন না। নিরুপায় হয়ে রাণী রামকুমারকেই পূজকপদ গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন করবার জন্য লিখলেন। রাণীর ঐকান্তিক অনুরোধ এড়াতে না পেরে রাজী হলেন রামকুমার।...

সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, (৩১শে মে, ১৮৫৫ ইং) বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিন মহাসমারোহে ৺ভবতারিণী প্রতিষ্ঠিতা হলেন নূতন মন্দিরে। রাধাকান্তজী আর দ্বাদশ-শিবের প্রতিষ্ঠাও হল বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে। শ্যামা, শ্যাম, মহেশ্বর পাশাপাশি বসলেন—সর্বভাবের ভাবী কেন্দ্ররূপ দক্ষিণেশ্বরে। সেদিন পূজা-অর্চনা, পাঠ, ভজন-কীর্তন, যাত্রাগান ও 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে চারিদিক মুখরিত। বিরাট আনন্দোৎসব। সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হতে বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ নিমন্ত্রিত হয়ে সমবেত হলেন। আশাতীত বিদায় পেয়ে সকলেই তৃপ্ত হলেন এবং ধন্য ধন্য করলেন। কয়েক দিন ধরে চলেছিল ঐ উৎসবানন্দ। ঐ আনন্দ-উৎসবে যোগদান করার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণও এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। পরবর্তী কালে তিনি ঐ মন্দিরপ্রতিষ্ঠা-উৎসবের কথায় বলেন—"মনে হল, ভগবতী যেন কৈলাস শূন্য করে চলে এসেছেন মন্দিরে। আর রাসমণি যেন গোটা রজতগিরিই তুলে এনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়ে দিয়েছিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সব কিছু দেখলেন—আনন্দে ঘুরে ঘুরে; কিন্তু

সারাদিন অভুক্ত থেকে সন্ধ্যায় দোকান হতে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে খেয়ে ঝামাপুকুরে ফিরে গেলেন। পরদিন প্রত্যুষেও তিনি এলেন দক্ষিণেশ্বরে, উৎসব দেখবার জন্য। সেদিনও তাঁর দাদা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে থাকার জন্য বলা সত্ত্বেও, তিনি আহারের সময় ফিরে গেলেন ঝামাপুকুরে।

…পাঁচ-সাত দিন তিনি আর দক্ষিণেশ্বরে আসেন নি। রোজই ভাবছিলেন—দাদা আজ ফিরবেন। এতদিনেও ফিরে এলেন না দেখে, উদ্বিগ্ন হয়ে দাদার খোঁজ নিতে তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে এলেন এবং শুনলেন যে, রাণীর বিশেষ অনুরোধে অগ্রজ জগন্মাতার পূজকের পদে ব্রতী হতে সম্মত হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ-কথা প্রথম বিশ্বাস করতে পারলেন না। অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করলেন—"শুনছি আপনি নাকি পূজক হচ্ছেন এখানে? তা কি সম্ভব? বাবা যে অশূদ্রযাজী ছিলেন—! অমন পিতার পুত্র হয়ে আপনি কি করে এ চাকরিতে ব্রতী হতে সম্মত হলেন?" রামকুমারও শাস্ত্র এবং যুক্তি-তর্ক সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি নিষ্ঠায় অটল। তখন এর মীমাংসার জন্য ধর্মপত্র করা ঠিক হল। ধর্মপত্রে রামকুমারের পূজক হবার সম্মতি পাওয়া গেল। শ্রীরামকৃষ্ণের মনও ধর্মপত্রের সিদ্ধান্তকে মেনে নিল ঈশ্বরেচ্ছা বলে।

ঝামাপুকুরের টোল তুলে দেওয়া হবে। অতএব রামকুমার গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরে থাকার অনুরোধ জানালেন। ইতিকর্তব্যতা স্থির করার জন্য গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন তিনি। দেবীর ভোগের প্রসাদ পাবার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হলেন না। অগত্যা দাদার

কথায় সিধা নিয়ে গঙ্গাতীরে স্বপাক খেতে রাজী হয়ে স্বপাকে খেয়ে বাস করতে লাগলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর এ আচরণ কি অনুদারতা না ঐকান্তিক নিষ্ঠা? ..

গঙ্গাতীরে বাস—পরম আকর্ষণের বস্তু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। রমণীয় স্থান—দেবালয়। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ প্রিয়দর্শন ব্রাহ্মণ-কুমার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁর তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, আপনভোলা উদাস তন্মনস্ক ভাব, নম্র অথচ তেজোদীপ্ত ব্যবহার ও সরলতা তাঁকে সর্বজনপ্রিয় করে তুলেছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই মন্দিরসংলগ্ন পঞ্চবটীর জঙ্গলটি শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান হয়ে উঠল। অগ্রজের দৃষ্টি এড়িয়ে সময় পেলেই তিনি ঐ নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে প্রবেশ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করতেন গভীর ধ্যানে। ঐ সময়টুকুই তাঁর কাছে মহাশান্তিময় মুহূর্ত।

এইভাবে প্রায় মাসখানেক কেটে গেল দক্ষিণেশ্বরে। নিজের রান্না-খাওয়া ও অগ্রজের একটু-আধটু সেবা-পরিচর্যা করা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের কোন নির্দিষ্ট কাজ নেই। আপনভাবে কাটাবার প্রচুর সময় পেয়ে দিনে দিনে স্থানটি তাঁর কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। এ সময়ের মধ্যে রাণীর জামাতা মথুরবাবুরও দৃষ্টি পড়ল এই উদাস, শান্তদর্শন কিশোরটির উপর, এবং কি জানি কেন এই ব্রাহ্মণ-কিশোরের প্রতি তিনি একটা অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করলেন। খবর নিয়ে যখন মথুরবাবু জানলেন যে, ওটি বড় ভট্চাযের ছোট ভাই, তখন ঐ ব্রাহ্মণ-যুবককে দেবীর সেবায় নিযুক্ত করবার ইচ্ছা তাঁর প্রাণে বলবতী হল। রামকুমারের নিকট ঐ প্রসঙ্গ

উত্থাপিত করতে, তিনি মথুরবাবুকে তাঁর ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা খুলে বললেন। সব শুনেও মথুরবাবু নিজ সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করে, রইলেন উহা কার্যে পরিণত করার প্রকৃষ্ট সুযোগের অপেক্ষায়।...

এমন সময় কামারপুকুরের নিকটবর্তী শিহর গ্রামের হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় চাকরির সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন। হৃদয়-রাম শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্নে—পিতৃষ্বস্রীয়া ভগ্নী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র। ছেলেবেলায় তাঁরা একসঙ্গে খেলাধূলা করতেন, হৃদয় তাঁর মামার বড়ই স্নেহের পাত্র। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স বিশ বৎসর কয়েক-মাস—হৃদয় তাঁর চার বৎসরের ছোট। আবাল্য-পরিচিত হৃদয়ের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরের ভালবাসা ও আত্মীয়তাবোধ যেন অন্য কোন এক অজ্ঞাত কারণে আরো গভীরতর ছিল। হৃদয়ও তার মামাকে প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসতেন এবং বড় আপনার জ্ঞান করতেন। দক্ষিণেশ্বরে এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে পরস্পরকে পেয়ে দু'জনেই যে পরম আহ্লাদিত হয়েছিলেন তা নিঃসন্দেহ।

জাগতিক সম্বন্ধে হৃদয়রাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগ্নে। কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি ছিলেন যুগাবতারের সেবক-সঙ্গী। অবতারের অন্যান্য পার্শ্বচরগণ যেমন নির্ধারিত কার্যসম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে বিভিন্ন লোক থেকে এসে নরদেহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যুগপ্রয়োজন-সাধনানন্তর স্ব স্ব অভীষ্ট লোকে প্রয়াণ করেন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের শরীরপরিরক্ষণরূপ বিশেষ কার্যসম্পূর্তির জন্যই হৃদয়রামের জন্ম। শ্রীঠাকুরও পরবর্তী কালে বলেছিলেন—"হৃদয় না

থাকলে সাধনকালে এ শরীররক্ষা অসম্ভব হত।" তাই আমরা দেখতে পাই দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমনের দিন হতে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কাল হৃদয় ছায়ার মত ছিলেন মামার পাশে পাশে। শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশন সবই হত একত্রে। ঐ কালে কেবলমাত্র দু'প্রহরের আহারের সময় একে অন্যের কাছ-ছাড়া হত। শ্রীরামকৃষ্ণ তখনো স্বপাকে খেতেন, আর হৃদয় মন্দিরে প্রসাদ পেতেন। হৃদয় রান্নাদির সব আয়োজন করে দিতেন, কোন কোন দিন মামার প্রসাদও গ্রহণ করতেন। রাত্রে দু'জনেই খেতেন দেবীর প্রসাদী লুচী। ··

৪

আমরা ক্রমে দেখতে পাব—শ্রীরামকৃষ্ণের পিতার মৃত্যু, রামকুমারের কলিকাতায় আগমন, দক্ষিণেশ্বরে মন্দির-প্রতিষ্ঠা, তাঁর পূজকপদগ্রহণ, মথুরানাথ হৃদয়রাম ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরীর সহিত মিলন প্রভৃতি সব কিছুই ঐশী ইচ্ছায় যুগধর্ম-সংস্থাপনের অনুকূল ঘটনা ও প্রয়োজনীয় লোকসমাবেশ মাত্র।...

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা একটি অতি কমনীয় কোমল ও ভাবময় শিবমূর্তি গড়ে তন্ময়ভাবে পূজা করছেন। এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে মথুরবাবু এলেন সেখানে। ঐ জীবন্ত মূর্তি ও ধ্যানস্থ পূজককে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এমন সুলক্ষণযুক্ত দেবভাবপূর্ণ মূর্তি তো তিনি ইতঃপূর্বে কখনো দেখেন নি! জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, ঐ মূর্তিটি শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের হাতের গড়া, তখন তাঁর বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। পূজান্তে মূর্তিটি তাঁকে দেবার অনুরোধ জানিয়ে মথুরবাবু চলে গেলেন। হৃদয়ের মারফত মূর্তিটি হাতে পেয়ে তিনি এতই মুগ্ধ হলেন যে, তা রাণীকে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ ছোট মূর্তিটির গঠনভাস্কর্যের মধ্যে মথুরবাবু দেখতে পেয়েছিলেন নির্মাতার প্রাণের চিত্র ও ভক্তির গভীরতা। এবং সেদিন হতে ছোট ভট্‌চাযকে দেবীর সেবাপূজাদিতে ব্রতী করবার আগ্রহ যেন তাঁর আরো বেড়ে গেল।

রামকুমারের মুখে মথুরবাবুর ইচ্ছা জানতে পেরে সেদিন থেকে

শ্রীরামকৃষ্ণ যথাসম্ভব তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। মানুষের দাসত্ব এবং দক্ষিণা নিয়ে ঠাকুরপূজা—এ দুটিই তাঁর বিবেক-বিরুদ্ধ।...

কালীবাড়িতে শ্রীঠাকুর হৃদয়ের সঙ্গে বেড়াচ্ছেন, দূর হতে দেখতে পেয়েই মথুরবাবু তাঁকে ডেকে পাঠালেন। মথুরবাবুর চাকরের মুখে—বাবু আপনাকে ডাকৃছেন—এই সংবাদ শুনেই তিনি মহাচিন্তিত হয়ে পড়লেন। হৃদয় মামাকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব পেল—"তুইতো জানিস নে, গেলেই আমায় এখানে চাকরি করতে বলবে।" "তাতে দোষ কি? এমন মনোরম স্থান—আর অত বড় লোকের আশ্রয়ে একটা কাজ জুটে যাওয়া তো ভাল কথাই!"—বললেন হৃদয়। শ্রীঠাকুরের চিন্তাধারা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি বললেন—"চাকরিতে আবদ্ধ থাকতে আমার আদৌ ইচ্ছা নেই। তা'ছাড়া, পূজা করতে গেলেই দেবীর গায়ের দামী দামী গয়নারও ভার নিতে হবে। ওসব আমি পেরে উঠব না। তুই যদি গয়নাগাঁটির ভার নিতে পারিস্, তা'হলে পূজা করতে আমার তত আপত্তি নেই।" হৃদয় এসেছেন চাকরির সন্ধানে, অতএব তিনি সানন্দে রাজী হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে সব শুনে খুব খুশী হয়ে বললেন মথুরবাবু—"বেশ তো, এ ব্যবস্থা খুবই চমৎকার। তুমি মায়ের বেশকারী হবে। আর হৃদয় বড়-ভট্‌চাযও তোমাকে সাহায্য করবে।"...

দেবদেউল-প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন মাসের মধ্যেই দেবীর পূজা-পরিচর্যার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন মন্দিরে। নিজ হাতে সুরভি ফুলের মালা গাঁথেন। মাকে মনের মত করে সাজান। মধুর কণ্ঠে বিহ্বল প্রাণে গান গেয়ে মাকে শোনান। দিনরাত কেমন

যেন নেশার ঘোরে কেটে যায়। সময় পেলেই তিনি অদৃশ্য হন পঞ্চবটীর জঙ্গলে। হৃদয় মামাকে দেখতে না পেয়ে এদিক সেদিক খুঁজে বেড়ান। অনেকক্ষণ পরে আবার দেখতে পান। কেমন যেন উদাস ভাব মামার। জিজ্ঞাসা করেন—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে? অনেকক্ষণ দেখতে পাইনি তো?"—"এই তো এখানেই ছিলাম।" পাশ কাটিয়ে তিনি জবাব দেন।…

* * *

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার পরের ভাদ্র মাস। পূর্বদিন জন্মাষ্টমী ছিল। কত আনন্দোৎসব হয়েছে, বিশেষকরে ৺রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে আজ নন্দোৎসব। খুব কীর্তন—মাতামাতি কীর্তন। দু'প্রহরে ভোগের পর গোবিন্দজীকে কক্ষান্তরে নিয়ে যাবার সময়, পূজক ক্ষেত্রনাথ পা পিছলে বিগ্রহসমেত পড়ে যাওয়ায় বিগ্রহের একটি পা ভেঙ্গে গেল। ঠাকুরবাড়িময় তুমুল সোরগোল উপস্থিত। মহা অমঙ্গলের সূচনা! রাণী শুনে শিহরে উঠলেন। সেবাপরাধ হয়েছে নিশ্চয়! অকল্যাণের ভয়ে সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এখন উপায়? খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সভা আহূত হল। পণ্ডিতমণ্ডলীর একমাত্র বিধান—"ভগ্নবিগ্রহ গঙ্গাজলে বিসর্জন দিয়ে নূতন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক।" মূর্তিগড়ার আদেশ দেওয়া হল।… এত প্রীতিভক্তিতে-পূজা-করা ঠাকুরকে এক কথায় জলে বিসর্জন দেওয়া! মথুরবাবুর প্রাণের ভিতরটা হু হু করে কেঁদে উঠল। তিনি রাণীকে বললেন—"এ-বিষয়ে একবার ছোট ভট্‌চাযকে জিজ্ঞাসা করলে হত না?"

শ্রীঠাকুর জগজ্জননীর বেশকারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পর হতে

মথুরবাবু রামকুমারকে বড় ভট্‌চায এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ছোট ভট্‌চায বলতেন এবং তাঁকে ভগবদ্‌ভাবে মাঝে মাঝে আবিষ্ট হতে দেখে তখন হতেই মথুরবাবু ছোট ভট্‌চাযকে দেখতেন অনন্যসাধারণ দৃষ্টিতে। মথুরের কথায় রাণীও তাতে সম্মতা হলেন। ভগ্ন বিগ্রহ সম্বন্ধে মথুরের প্রশ্ন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন—"রাণীর জামাইদের কারো যদি পা ভেঙ্গে যেত, তা হলে তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার স্থানে বসান হত কি? না, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হত? এস্থলেও তা-ই করা হোক। বিগ্রহের ভগ্নপদ জুড়ে নিয়ে যেমন পূজা হচ্ছে তেমন পূজা হবে।"

এ সহজ সমাধান শুনে সকলেই স্তম্ভিত। আত্মবৎ সেবা। গোবিন্দজীর দিব্য আবির্ভাবের বিগ্রহ! তা ফেলে দেওয়া! শ্রীরামকৃষ্ণের এই ব্যবস্থা ব্রাহ্মণদের মোটেই মনঃপূত হল না। তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন—এ কোন্ অনাসৃষ্টি কাণ্ড! ভগ্ন বিগ্রহের পূজা কি করে হয়? কিন্তু ছোট ভট্‌চাযের এ প্রেমপূর্ণ ব্যবস্থা রাণী ও মথুরবাবুর এমন মনোমত হয়েছিল যে, তাঁরা আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। রাণীর দু' চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল।···

অনুরুদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিগ্রহের ভাঙ্গা পা এমন নিখুঁতভাবে জুড়ে দিলেন যে, জোড়ার দাগটি পর্যন্ত দেখা যেত না। ঐ বিগ্রহেরই সেবাপূজা চলতে লাগল। অনেককাল পরে বরাহনগর কুটিঘাটায় একদিন তত্রস্থ প্রসিদ্ধ জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীঠাকুরকে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন—"মহাশয়! ওখানকার ৺গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?"

তদুত্তরে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন—"তোমার কি বুদ্ধি গো? অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখন ভাঙ্গা হন?"

নূতন মূর্তি এল। তা মন্দিরে তোলা রইল; প্রতিষ্ঠা করা হল না।[১] অনবধানতার জন্য পূজক ক্ষেত্রনাথের চাকরি গেল। তদবধি গোবিন্দজীর পূজার ভার পড়ল ছোট ভট্‌চাযের উপর। হৃদয়রাম হলেন ৺কালীমাতার বেশকারী।

কাশীপুর বাগানে শেষ অসুখের সময় একদিন গভীর সমাধি হতে ব্যুত্থিত হয়ে ভাবাবেশে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন "এর ভিতর দু'টি আছেন। একটি তিনি—আর একটি ভক্ত হয়ে আছে।"...

এবার তাঁর ভক্তভাবে লীলা। ভক্তরূপে তিনি করেছিলেন উদগ্র সাধনা, অভিনব লীলা। তাঁর সব কিছুই আদর্শ উপস্থাপিত করবার জন্য—বিকৃত ও দীর্ঘবিস্মৃত সনাতনধর্মকে যুগোপযোগী নব আদর্শে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য।

ভক্তরূপে তিনি যে ভবতারিণীর পূজা করেছিলেন তার মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হল মূর্তিপূজার গূঢ় মর্ম, আর জগৎ পেল সত্য-শান্তি-লাভের অবলুপ্ত সহজ পথের সন্ধান। নিরাশা-প্রপীড়িতরা শুনল বুকভরা আশা ও আনন্দের বাণী।

এ পথনির্দেশ শুধু হিন্দুজাতি বা ভারতের জন্য নয়, এ আদর্শ

১ রাণী রাসমণি ও মথুরানাথের পরলোকপ্রাপ্তির পরে তাঁদের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ নূতন বিগ্রহটি যথাশাস্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু সেই সেই সময়ে পারিবারিক বিঘ্ন-দুর্ঘটনাদি উপস্থিত হওয়ায় ঐ প্রচেষ্টা কার্যকরী হয় নি। গোবিন্দজীর নূতন বিগ্রহটি এখনো মন্দিরে সেভাবেই রক্ষিত আছে।

সমগ্র মানবজাতি ও সকল ধর্ম-ধর্মীদের জন্য। এখন আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখতে পাব দীনহীন-ভক্তপূজারিরূপে, সরল-ব্যাকুল অকিঞ্চন ভক্তরূপে। তাঁর এ লীলা অনুপম।

*　　　*　　　*

শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা তো বিগ্রহের পূজা নয়। চিন্ময়ের পূজা, দেবতার পূজা। তাঁর পূজা দেখে মুগ্ধপ্রাণে লোক দাঁড়িয়ে থাকত সারি দিয়ে। পরবর্তী কালে ঐ পূজাকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—"অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গ সম্পন্ন করার সময় ঐসকল মন্ত্র উজ্জ্বলবর্ণে নিজদেহে সন্নিবেশিত রয়েছে দেখতে পেতাম। 'রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করে নিজের চতুর্দিকে জল ছড়িয়ে যখন ধ্যান করতাম তখন দেখতাম যে, চতুর্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করে অগ্নি দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপে পূজাস্থানকে সর্ববিঘ্ন হতে রক্ষা করছে। কুণ্ডলিনীর ধ্যানকালে দেখতাম—সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী-শক্তি সুষুম্নাপথে সহস্রারে উঠছে। এবং শরীরের যে যে অংশ অতিক্রম করে ঐ শক্তি ঊর্ধ্বগামিনী হচ্ছে, সে অংশগুলি একেবারে অসাড় ও স্পন্দহীন হয়ে যাচ্ছে।"···

পূজাকালে তাঁকে তেজঃপুঞ্জ দেহে ও তন্মনস্ক বিহ্বল ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতে দেখে, সকলে বলাবলি করত—স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব যেন পূজায় বসেছেন। ধ্যানবিলীন অন্তঃকরণে তিনি দেখতেন শ্রীভগবানের দিব্যপ্রকাশ। বুক ভরে যেত আনন্দে। আনন্দাশ্রুতে বুক ভেসে যেত। পূজান্তে প্রাণের আবেগে তিনি মধুরকণ্ঠে গান করতেন। সে গানে কি ভাবুকতা

আর আত্মবিস্মৃতি! সমস্ত মন্দির যেন দিব্য প্রকাশে গম্‌গম্‌ করছে। মনে হত যেন, দেবতা কান পেতে শুনছেন ঐ প্রাণের আবেগ।

দেবীসাধক রামকুমার ভ্রাতাকে দেবসেবায় ব্রতী দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। শুধু যে আনন্দিত হলেন তা নয়। নিশ্চিন্তও হলেন। যা হোক, ছেলেটার একটা হিল্লে হয়ে গেল—ভাবলেন তিনি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সেই উদাসভাব, পঞ্চবটীমূলে একলাটি চুপচাপ বসে থাকা, বেশী বেশী ধ্যান করা, নিঃসঙ্গভাবে থাকা—এসব দেখে কখনো কখনো রামকুমারের উৎকণ্ঠা বেড়ে যেত। কিন্তু তার ভক্তিভাবে পূজা করা দেখে মথুরবাবু পর্যন্ত খুবই মুগ্ধ। তাই রামকুমার ভাবলেন—ওকে পূজাটা ভাল করে শিখিয়ে দেই। তখন হতে তিনি গদাধরকে চণ্ডীপাঠ, ৺কালীমাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজাদি বিশদ্‌ভাবে শিখাতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও অচিরে শিখে ফেললেন সব পূজাদি এবং রাজী হলেন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিতে। শুভদিনে কলিকাতার বৈঠকখানা অঞ্চলের শক্তি-সাধক কেনারাম ভট্টচাযের কাছে দীক্ষা হয়ে গেল। শক্তিমন্ত্র পেয়েই শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবেশে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। শিষ্যের ভক্তির গভীরতা দেখে গুরু একেবারে স্তম্ভিত! প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন শিষ্যকে।

ভ্রাতাকে মায়ের পূজায় নিযুক্ত করে রামকুমার বিষ্ণুঘরের পূজক হবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মথুরবাবু তো প্রাণে প্রাণে চাইছিলেন তা-ই। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবীর পূজক নিযুক্ত হলেন। রামকুমার ফেললেন তৃপ্তির নিঃশ্বাস। রামকৃষ্ণ অতি দক্ষতার

সহিত দেবীপূজা করছেন। রাণী ও মথুরবাবু তাঁর ভাবপূর্ণ পূজা দেখে মুগ্ধ। দিন দিন তাঁদের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বাড়তে লাগল ছোট ভট্‌চাযের উপর। রামকুমার এবার কতকটা নিশ্চিন্ত মনে কিছুদিনের জন্য কামারপুকুর ঘুরে আসবেন ভাবলেন। হৃদয়রাম বিষ্ণুঘরের পূজক নিযুক্ত হলেন। এদিকে রামকুমার ছুটি নিয়ে গৃহে ফিরবার আয়োজন করলেন। কিন্তু কামারপুকুর যাবার পূর্বে বিশেষ কার্যোপলক্ষে তিনি গেলেন শ্যামনগর মূলাজোড়ে; হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তিনি সেখানেই মারা যান। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করে তার এক বৎসর পরেই রামকুমার দেহরক্ষা করেন।

৫

পিতার মৃত্যু রামকৃষ্ণের প্রাণে সংসারের অনিত্যত্ব সম্বন্ধে সুগভীর ছাপ দিয়েছিল। এখন পিতৃতুল্য অগ্রজের মৃত্যুতে তাঁর অন্তর্নিহিত বৈরাগ্যানল উঠল আরো উদ্দীপিত হয়ে। অনিত্য সংসার, ক্ষণস্থায়ী জীবন, মানযশ, পার্থিব সম্পদ আরো কত অকিঞ্চিৎকর! অথচ জীবমাত্রই ঐ অনিত্য বস্তুগুলিকে আঁকড়ে ধরে আছে। দেহের নাশ অবশ্যম্ভাবী—মৃত্যু সুনিশ্চিত, অথচ…!

অগ্রজের মৃত্যুজনিত শোক শ্রীরামকৃষ্ণের মনে তীব্র অনুরাগে রূপান্তরিত হল। তিনি স্বস্বরূপে স্থিত হয়ে সৎ চিৎ-আনন্দে ডুবে থাকবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

পরবর্তী কালে তিনি নিজের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে ভাবী বার্তাবহ ত্যাগী সন্তানদের বলেছিলেন—"এখানকার (সাধন-ভজন) যা কিছু করা সে তোদের জন্য।…আর নজীরের জন্য। আমি ষোল টাং করলে তবে যদি তোরা এক টাং করিস্।" শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের প্রত্যেকটি কাজই নজীরের জন্যে—ভবিষ্যতের দিগদর্শন। ঐ সময় থেকে সুদীর্ঘ দ্বাদশবৎসরব্যাপী তিনি যে অত্যুগ্র সাধনা করেছিলেন, তা জগতের কল্যাণের জন্য। তিনি যে মহদ্ধর্ম প্রচার করতে এসেছিলেন, যে শান্তি সমন্বয় ও ঐক্যের বাণী জগৎকে শোনাতে এসেছিলেন—নিজের জীবনকেই করলেন তার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ—জীবন্ত প্রমাণ। যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে

ভারত ও ভারতেতর দেশে তুমুল ঝড় বয়ে চলেছিল, ঐ মূর্তিপূজাই তাঁর জীবনের যাত্রাপথের প্রথম নির্দেশচিহ্ন। দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী-মূর্তি-পূজাকে অবলম্বন করে তাঁর সত্যপ্রতিষ্ঠা আরম্ভ হল।

* * *

এখন হতে শ্রীরামকৃষ্ণের সবটুকু সময়ই অতিবাহিত হয় অপার্থিব বস্তুর ধ্যান-চিন্তনে। পূজান্তে মন্দিরে বসে জগন্মাতার কাছে তিনি প্রাণের তীব্র আকূতি প্রকাশ করতেন প্রার্থনা ও ভজনসঙ্গীতে। —কী আত্মহারা বিহ্বল ভাব! দ্বিপ্রহরে মন্দিরদ্বার বন্ধ হলে তিনি পঞ্চবটীতে প্রবেশ করে তথায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন। আহারে ঔদাসীন্য, নিদ্রায় বিরতি—সর্বক্ষণ তৎ-ময় ভাব। শেষের দিকে জনৈক ত্যাগী শিষ্যকে বলেছিলেন—"চৌদ্দ বৎসর ঘুমাই নি।" গাইতেন—

"ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে-যাগে জেগে আছি।
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে (মা), ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।"

রাত নিষুতি। মন্দির বন্ধ। সবাই ঘুমিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে ঘুম নেই। তিনি বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। সারারাত পঞ্চবটীর জঙ্গলে এক আমলকী গাছের তলায় বসে ধ্যান করেন। সকলের অলক্ষ্যে ভোরবেলা যখন ফিরে আসেন—উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। চোখ লাল।

দুপুর রাতে হৃদয়রামের হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গেছে। দেখেন—মামা বিছানায় নেই। কোথায় গেলেন তিনি? দুশ্চিন্তায় হৃদয়ও ঘুমুতে পারলেন না সারারাত।···চলেছে এইভাবে রাতের পর রাত। এক রাত্রে হৃদয় ঘুমের ভান করে চোখ বুজে বিছানায় পড়ে

আছেন, দেখলেন—মামা বিছানা ছেড়ে চলেছেন পঞ্চবটীর দিকে। তিনিও নিঃশব্দে দূর থেকে পিছু নিলেন। কিন্তু দেখতে দেখতে মামা অন্তর্হিত হলেন জঙ্গলের ভিতর। অবাক্ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও মামা ফিরছেন না দেখে, তিনি জঙ্গলের মধ্যে ঢিল ছুড়তে লাগলেন। জমাট নিস্তব্ধতা ভঙ্গকরা ছাড়া তাঁর ঢিল ছোড়ার কোন প্রত্যুত্তর এল না। রাতের পর রাত চলতে লাগল হৃদয়ের এই ভয়দেখান। কিন্তু তাতেও মাতুলকে প্রতিনিবৃত্ত করতে না পেরে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—"রাত্রে ঐ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে কি কর, বল দেখি?" তিনি বললেন—"ওখানে একটা আমলকী গাছ আছে। তার তলায় বসে ধ্যান করি। শাস্ত্রে বলে আমলকীতলায় বসে ধ্যান করলে সর্বকামনা সিদ্ধ হয়।"

অন্য একরাত্রে তিনি ভূতপ্রেতের আবাসস্থল সেই কবরডাঙ্গার জঙ্গলে প্রবেশ করার খানিক পরে হৃদয় চুপি চুপি গিয়ে দূর হতে দেখেন—মামা উলঙ্গ হয়ে বসে ধ্যানে মগ্ন। হৃদয় ভাবলেন—মামা কি পাগল হলেন নাকি! নেংটা হয়ে বসা—একি কাণ্ড! সাহসে ভর করে কাছে গিয়ে দেখেন—পৈতাও খুলে রেখেছেন মামা! তখন জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন—"মামা, মামা গো!" অনেক ডাকাডাকির পর তাঁর ধ্যানভঙ্গ হলে হৃদয় জিজ্ঞাসা করলেন—"একি হচ্ছে! পৈতা কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসে যে?" ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে হৃদয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি বললেন—"হৃদু, তুই কি জানিস্? এইভাবে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাতি-অভিমান—এসব

এক-একটি পাশ। এসব পাশমুক্ত হয়ে মাকে ডাকতে হয়। তাইতো খুলে রেখেছি। ধ্যানান্তে ফিরবার সময় আবার পরব।" জবাব শুনে হৃদয় স্তম্ভিত হলেন।…

জগন্মাতার দর্শনের ব্যাকুলতা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে শ্রীরামকৃষ্ণের। আরো বেশী বেশী সময় কেটে যেতে লাগল মন্দিরেই—মায়ের পূজাসেবায়। পূজা করতে বসেছেন তো পূজার আর শেষ হয় না। মাকে ফুলচন্দনে মনের মত সাজান। শ্রীঅঙ্গের স্পর্শে পাচ্ছেন কোমল স্পর্শ। সর্বাঙ্গে শিহরণ হয়। ভাবেন—মা তো পাষাণময়ী নন। মা যে আমার চিন্ময়ী!…

তন্ময়তা বেড়ে চলেছে। কতভাবে সাজান, কত উপচারে সেবা করেন—তবু তৃপ্তি নেই। আরতি করছেন তো করছেনই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছে, তবু বিরতি নেই। এ-যে ভগবতীর আরতি!

মথুরবাবু ছোট ভট্চাযের এই ভাববিহ্বল পূজা দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। "প্রতিমাকে এমন ভাবে সেবা পূজা করা কি সম্ভব?"—ভাবলেন তিনি। পরে রাণীকে বলেছিলেন—"মহা-সুকৃতির ফলে অদ্ভুত পূজক পাওয়া গিয়েছে। ৺দেবী বোধ হয় শীঘ্রই জাগ্রতা হয়ে উঠবেন।"…

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক ব্যবহার, দিব্যভাবাবেশ, গভীর অভিনিবেশ দেখে অনেকে বলাবলি করতে লাগল—ছোট ভট্চাযের মাথা খারাপ হয়েছে। আবার কেউ বলত—ভূতে পেয়েছে। তাঁর সমগ্র মনপ্রাণ দিনে দিনে তলিয়ে যাচ্ছিল জগন্মাতার ভাব-সমুদ্রে। এই তীব্র ব্যাকুলতা ও বিভোরতা ক্রমে এত বেড়ে গেল

যে, বৈধী পূজা করা বুঝিবা তাঁর দ্বারা আর সম্ভব হয় না! আহারে ঔদাসীন্য, নিদ্রায় বিমুখতা। শরীর ক্রমে ভেঙ্গে পড়ছে। বক্ষঃস্থল আরক্তিম, চক্ষু অশ্রুভরা—সর্বক্ষণ একটা অব্যক্ত অশান্তি। অন্তর্দহনে ছট্‌ফট্‌ করছেন। আর মুখে 'মা মা' আর্তনাদ।...

তীব্র ব্যাকুলতায় কখনো আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি করেন। লোকে মনে করে শূলবেদনা। দেবীদেউলে সান্ধ্য আরাত্রিকের কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠেছে। দিব্য উন্মাদ কেঁদে আকুল—"মা, আর একটা দিন কেটে গেল, তোর দেখা পেলাম কৈ? দিনে দিনে যে পরমায়ু ক্ষয় হয়ে আসছে—মাগো, তোর দয়া হল না? এখনো আমায় দেখা দিলি নি।" সে কান্নার কাতরতায় পাষাণও বিগলিত হয়।..

অবোধ শিশুর আকুল ক্রন্দন শুনে মা তাকে কোলে না নিয়ে কি থাকতে পারেন? আর কতকাল থাকবেন তিনি আড়ালে! চিন্ময়ী আনন্দময়ীরূপে দাঁড়ালেন 'মায়ের শিশুর' সামনে। শিশুকে বুকে টেনে নিলেন।

ঐ দর্শন সম্বন্ধে পরে তিনি বলেছিলেন—"...ঐ সময় একদিন জগন্মাতাকে গান শোনাচ্ছিলাম; আর কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছিলাম—'মা, এত যে ডাকছি তার কিছুই কি তুই শুনছিস্ নে? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় কি দেখা দিবি নে?' মার দেখা পেলাম না বলে তখন প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা; লোকে গামছা যেমন সজোরে নিংড়ায়, তেমনি হৃদয়টা যেন কে জোরে নিংড়াচ্ছে। মা'র দেখা বোধ হয় কোন কালেই পাব না ভেবে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছি। অস্থির হয়ে ভাবলাম—তবে আর এ জীবনের কী

প্রয়োজন ? মার ঘরে যে খাঁড়া ছিল, সহসা দৃষ্টি পড়ল তার উপর। এ মুহূর্তেই জীবনের অবসান করে দেব ভেবে, উন্মত্তের ন্যায় ঐ খাঁড়া নিতে ছুটছি। এমন সময় মা'র অদ্ভুত দর্শন পেলাম এবং বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর বাইরে কি যে হচ্ছে, কোন্ দিক দিয়ে সেদিন ও পরদিন কেটে গেল তার কিছুই জানতে পারি নি। অন্তরে কিন্তু সর্বক্ষণ বয়ে যাচ্ছিল একটা অননুভূত জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত। আর মা'র সাক্ষাৎ প্রকাশ অনুভব করছিলাম।"

ঐ দর্শনপ্রসঙ্গে অন্য সময়ে তিনি বলেছিলেন—"· দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হয়ে গেল। কোথাও কিছু নেই। শুধু এক অসীম অনন্ত চেতন-জ্যোতিসমুদ্র। যেদিকে যতদূর দেখি—চারিদিক হতে তার উজ্জ্বল তরঙ্গ একের পর এক ভীষণ গর্জনে আমার উপর মহাবেগে ছুটে আসছে। নিমিষে আমায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। এককালে কোথায় তলিয়ে দিলে। ঐ চৈতন্য-সমুদ্রের ঢেউয়ের মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে বাহ্যসংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলাম।"···ঐ প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁর একটু বহিঃসংজ্ঞা যখন ফিরে এল, তখনি কাতর কণ্ঠে 'মা মা' বলে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

পূর্বোক্ত দর্শনের উন্মাদনা উপশান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণ আকুল হয়ে উঠল, জগন্মাতার অবিচ্ছিন্ন দর্শনের জন্য। তিনি চাইতেন নিরন্তর মায়ের প্রকাশ— মায়ের মধ্যে লীন হয়ে থাকা। অবোধ শিশুর মত মায়ের কোল-ছাড়া হলেই কান্না। অপলক নেত্রে সর্বক্ষণ দেখতে চান মাকেই। মা ছাড়া আর কিছুই

চান না। মায়ের অদর্শন হলে হৃদয়ের শূন্যতা ও যন্ত্রণা কখনো কখনো এত বৃদ্ধি পেত যে, আর চাপতে পারতেন না। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যন্ত্রণায় মুখ ঘষড়ে কাঁদতেন— "মা, দেখা দে, দেখা দে।" চারিপাশে লোকের ভিড় লেগে যেত ঐ সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখবার জন্য। ঐ অসহ্য ব্যাকুলতার সময় 'মা বরাভয়া চিন্ময়ীরূপে দেখা দিতেন। কখনও হেসে কথা বলতেন; কতভাবে তাঁকে আদর করতেন, সান্ত্বনা দিতেন!'

৬

জগন্মাতার প্রথম দর্শনের পরে কয়েকদিন মন্দিরের পূজাদি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। হৃদয়রাম অন্য এক ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজাদি চালিয়ে নিলেন এবং বায়ুরোগ হয়েছে মনে করে ভূকৈলাসের রাজবৈদ্যের দ্বারা মামার চিকিৎসাদি করাতে লাগলেন। কিন্তু এ যে ভাব-রোগ! কবিরাজী চিকিৎসায় সারবে কেন?

যেদিন একটু হুঁশ থাকত সেদিন তিনিই যেতেন পূজা করতে। সে অতি অদ্ভুত পূজা। পূজাতে বসেই তিনি ধ্যানে নিশ্চল হয়ে যেতেন। পরবর্তী কালে ত্যাগী শিষ্যদের বলেছিলেন—"মা'র নাট-মন্দিরের ছাদের আলিসায় যে ধ্যানস্থ ভৈরবমূর্তি আছে, ধ্যান করতে যাবার সময় সে মূর্তি দেখিয়ে মনকে বলতাম—'মন, এমনি স্থির নিস্পন্দভাবে বসে মায়ের পাদপদ্ম চিন্তা করবি।' ধ্যান করতে বসেই শুনতে পেতাম, শরীরের সব গ্রন্থিসকল পায়ের দিক থেকে উপরে খট্‌খট্‌ শব্দে একটার পর একটা—সব গাঁট যেন ভিতর হতে তালাবন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধ্যানকালে এতটুকু নড়াচড়া, এমন কি আসন পরিবর্তন করারও সামর্থ্য থাকত না।··· ধ্যানে বসে প্রথমে জ্যোতির্বিন্দুসকল দেখতে পেতাম, কখনো বা দেখতাম যে পুঞ্জীভূত জ্যোতিতে চারিদিক পরিব্যাপ্ত, আবার কখনো বা গলিত রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিতরঙ্গে ছেয়ে গেছে সব কিছু।·· চোখ বুজে, আবার চোখ মেলেও এসব দর্শন হত।"···

এইকালে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাদিও দিনের পর দিন অভিনব ভাব

ধারণ করল। বিধির গণ্ডি প্লাবিত করে, সব কিছু চলেছে অসীম ভাব-সমুদ্রের দিকে। এখন তো তিনি পাষাণময়ী প্রতিমা দেখছেন না— দেখেন প্রাণময়ী জাগ্রতা দেবীমূর্তি। মা হাসছেন, কথা কইছেন। 'এটা কর, ওটা করিস নে' বলে নির্দেশ দিচ্ছেন।...

পূর্বে দেবীকে ভোগনিবেদন করে দেখতেন— দেবীর 'নয়ন হতে অপূর্ব জ্যোতিরশ্মি লক্‌লক্ করে নির্গত হয়ে নিবেদিত অন্নাদি সব স্পর্শ করছে।' আর এখন দেখছেন—'ভোগনিবেদন করা মাত্র, কখনো নিবেদন করবার পূর্বেই, মা অঙ্গজ্যোতিতে মন্দির আলোকিত করে খেতে বসেছেন।' হৃদয়রাম একদিন দেখেন—"মামা হাতে অর্ঘ্য নিয়ে তন্ময় হয়ে ধ্যান করছেন। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বললেন— 'রোস্ রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি তারপর খাস্।' এবং পূজা শেষ না করেই নৈবেদ্য নিবেদন করলেন।"...

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—"মায়ের নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখেছি, মা সত্যসত্যই নিশ্বাস ফেলছেন। তন্ন তন্ন করে দেখেও রাত্রে প্রদীপের আলোকে মন্দিরে মায়ের দিব্যাঙ্গের ছায়া পড়তে কখনো দেখি নি। নিজের ঘরে বসে শুনেছি, মা পাঁইজোর প'রে বালিকার মত আনন্দে ঝম্‌ঝম্ শব্দ করে মন্দিরের উপর উঠছেন। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে দেখেছি— মা মন্দিরের দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িত কেশে কখনো কলিকাতা কখনো গঙ্গা দর্শন করছেন।"

...আবার অর্ঘ্য সাজিয়ে প্রথম ঐ অর্ঘ্যদ্বারা তিনি নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্বাঙ্গ—এমন কি নিজের পা পর্যন্ত স্পর্শ করে পরে তা অর্পণ করতেন জগন্মাতার পাদপদ্মে।—এ কি সর্বত্র দিব্যদর্শন, না দেবীর

ঙ্গে নিজের অভেদবোধ, না নিজের ভিতর ওতপ্রোতভাবে দেবীর প্রকাশ অনুভব করা ?···

কখনো সিংহাসনের উপরে উঠে নিজের হাতে মাকে খাওয়াতেন।—"খা মা, খা,—বেশ করে খা।" পরে হয়ত বললেন —"আমি খাব ? আচ্ছা খাচ্ছি।"—বলে নিজে একটু খেয়ে মায়ের মুখে দিচ্ছেন।

এখন হতে জগন্মাতা সর্বক্ষণ রয়েছেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর সকল চেতনা জুড়ে। মার সঙ্গে কথাবার্তা, হাসি-তামাসা, রঙ্গ-পরিহাস, মান-অভিমান—সব কিছু। ছোট ভট্‌চাযের সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার কালীমন্দিরের আমলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল—পূজার নামে এ-সব অবৈধ কর্ম ! ভট্‌চাযের নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। এ-হেন অনাচারে যে মহা অকল্যাণ হবে ! শঙ্কিত হয়ে উঠল সকলে। ব ব্যাপার বিশদভাবে জানিয়ে কর্মচারীরা জানবাজারে মথুরবাবুকে চিঠি লিখলে। তিনি বলে পাঠালেন—"আমি নিজে গিয়ে যা হয় এর ব্যবস্থা করব।"

কাউকে কিছু না জানিয়ে একদিন পূজার সময় সোজা মন্দিরে গিয়ে হাজির হলেন মথুরবাবু। কে এল গেল মন্দিরে, সেদিকে ভাববিহ্বল পূজকের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি বিভোর—মত্ত তার মাকে নিয়ে। পূজা করতে করতে কখনো আকুল হয়ে কাঁদছেন, কখনো উদ্দাম উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠছেন ; কথা কইছেন, অভিমান করছেন মায়ের সঙ্গে আদুরে ছেলের মত। মন্দির দেবীর প্রকাশে গ্রম্ জম্ করছে। মথুরের গা ছম্ ছম্ করতে লাগল। তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন।—"এত ভাগ্য !—এ কি দেখছি ! নরজন্ম

সার্থক হল।"—ভাবলেন তিনি। অশ্রুপ্লাবনে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল; আর কিছু দেখতে পেলেন না। চোখ মুছতে মুছতে তিনি মন্দির থেকে বেরিয়ে যেমনটি এসেছিলেন তেমনই ফিরে গেলেন—জানবাজারে।—"দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হল। এতদিনে জগজ্জননী সত্যসত্যই আবির্ভূতা হয়েছেন। এই তো মায়ের ঠিক ঠিক পূজা!"—ভাবছেন মথুরবাবু। পরদিন নির্দেশ এল মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর উপর—"ভট্টচায মশাই যেভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁকে কেউ-ই বাধা দেবে না।"

ঐ দিন হতেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি মথুরের আকর্ষণ পরিণত হল গভীর শ্রদ্ধায়। ক্রমে আরো অনেক পরিচয় পেয়ে বিদ্বান বিচক্ষণ মনিব মথুরবাবু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর অন্তরঙ্গ সেবক হয়ে রইলেন।...

* * *

জগন্মাতাকে নিয়ে ঠাকুরের গভীর নিবেশ, ভাবাবেশ ও আনন্দ-বিলাস ক্রমে এত বেড়ে চলল যে, তাঁর দ্বারা আর নিয়মিত আনুষ্ঠানিক পূজা সম্ভব হল না। কখনো পূজা না করেই করেন ভোগনিবেদন। পূজায় বসে ফুলচন্দনাদিতে করেন আত্মপূজা। আবার মায়ের তিলেক অদর্শন-বিচ্ছেদে প্রলয়কাণ্ড হয়ে যায়। 'মা মা' বলে আছড়ে পড়েন মাটিতে। সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়। মায়ের অদর্শনে শ্বাসরোধ হয়ে যায়—প্রাণ যেন ছট্‌ফট্ করে। জলে পড়েন কি আগুনে পড়েন তার খেয়াল নেই। তার উপর সর্বাঙ্গে ভীষণ জ্বালা। বিরহাগ্নির দহনে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গায় পড়ে থেকেও সে জ্বালার শান্তি নেই।

হৃদয় কবিরাজী তৈল মালিশ করলেন, ঔষধ সেবন করালেন; কিন্তু কিছুই হল না। ছ'মাস ধরে চলেছে এ অসহ্য গাত্রদাহ। হঠাৎ এক অভাবনীয় উপায়ে ঐ দাহ সাময়িকভাবে শান্ত হল। তিনি বলেছিলেন—"একদিন পঞ্চবটীতে বসে আছি। সহসা দেখছি কি—মিস্-কালো-রং, আরক্তলোচন, ভীষণাকার এক পুরুষ যেন মাতাল হয়ে টলতে টলতে (নিজ শরীর দেখিয়ে) এর ভিতর হতে বের হয়ে সামনে বেড়াতে লাগল। পরক্ষণে দেখি কি, আর একজন সৌম্যমূর্তি গৈরিকধারী পুরুষ ত্রিশূলহস্তে (শরীরের) ভিতর হতে এসে ঐ ভীষণাকার (কাল) পুরুষকে সবলে আক্রমণ করে মেরে ফেললে। এবং ঐদিন হতে গাত্রদাহও কমে গেল। তার পূর্বে ছ'মাস অসহ্য গাত্রদাহ বিষম কষ্ট দিয়েছিল।"

ঐকালে গাত্রদাহের উপশম হল বটে, কিন্তু উন্মাদনার হ্রাস হল না। বরং বেড়েই চলেছিল ঐ ভাবাবেশ।

হঠাৎ একদিন ঐ দিব্য উন্মাদের সৃষ্টিছাড়া ব্যবহারে দেবদেউলে মহা সাড়া পড়ে গেল। অতি বিসদৃশ ঘটনা। রাণী এসেছেন দেবীদর্শনে। গঙ্গাস্নানান্তে তিনি মন্দিরে এসে শ্রীমূর্তির সামনে পূজা-আহ্নিক করতে বসেছেন। রাণী ছোট ভট্চাযের মধুর কণ্ঠের মা'র নামগান শুনতে ভালবাসেন—কানে যেন সুধা বর্ষণ করে। পূজা করতে করতে তিনি ছোট ভট্চাযকে মায়ের গান গাইতে অনুরোধ করলেন। শ্রীঠাকুরও রাণীর কাছটিতে বসে বিভোর প্রাণে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদের গান গাইছেন। রাণীর প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত; অথচ তাঁর অজ্ঞাতসারেই এক মোকদ্দমার চিন্তা এসে ঢুকেছে মনে। তিনি ঐ মামলার ফলাফল-চিন্তায় ডুবে

গেলেন। ঠাকুরের গান হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। বিরক্ত হয়ে রুক্ষস্বরে তিনি বলে উঠলেন—"এখানেও ঐ চিন্তা!"—বলেই রাণীর গায়ে এক চপেটাঘাত করলেন!

সামান্য একজন পূজারী রাণীর গায়ে হাত তুলেছে! মন্দিরে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। দারোয়ানরা ধরতে গেল ঠাকুরকে। কেউ গালাগাল করে। কেউ যায় মারতে। তিনি কিন্তু আপনভাবে বিভোর—মুখে মৃদুমন্দ হাসি!—

রাণীর গায়ে হাত তোলা! মথুরবাবুর প্রাণে বড় লেগেছে। কিন্তু রাণী তাঁকে বললেন—"ছোট ভট্চাযের ভিতর আবিষ্টা হয়ে মা-ই আমায় শিক্ষা দিয়েছেন।" মথুরবাবুর কিন্তু তাতেও মন উঠল না। তাঁর বিচারশীল মন! তিনি ভাবলেন—দেবীর আবেশ হয় ছোট ভট্চাযের—তা ঠিক; তার সঙ্গে বায়ুর প্রকোপও বেড়েছে নিশ্চয়। চিকিৎসা করাতে হবে। প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীনে রাখলেন ঠাকুরকে। রাণীর কিন্তু সেই থেকে ছোট ভট্চাযের উপর শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। ইনি যে অন্তর্যামী পুরুষ!—ভাবলেন রাণী।

শুধু চিকিৎসার ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত হলেন না মথুরবাবু। নানাভাবে যুক্তিতর্কের সাহায্যে ঠাকুরকে বোঝাতে লাগলেন যে, ভগবদ্-ভক্তিরও এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। সব কিছুই একটু রয়ে সয়ে করা ঠিক। দু'জনের মধ্যে এই নিয়ে বোঝাপড়া চলেছে। এমন সময় হঠাৎ একটি ঘটনায় মথুরবাবুর চোখের সামনের যবনিকা যেন চকিতে সরে গেল।··· কথাপ্রসঙ্গে একদিন মথুরবাবু ঠাকুরকে বলছেন—"ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যে নিয়ম

একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার ক্ষমতা তাঁরও নেই।" শুনে ঠাকুর স্তম্ভিত হয়ে বললেন—"ও কি কথা তোমার! যার আইন, ইচ্ছা করলে সে তখনই তা রদ করতে পারে, বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।" মথুর কিন্তু ও-কথা কিছুতেই না মেনে তর্ক জুড়লেন—"লালফুলের গাছে লাল ফুলই হয়, সাদা ফুল কখনো হয় না। কেন না, তিনি নিয়ম করে দিয়েছেন। কৈ, লালফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি করুন দেখি!" —"তিনি স্বাধীন, স্বতন্ত্র। ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন।" —বললেন ঠাকুর। মথুরবাবুর কিন্তু সে কথায় বিশ্বাস হল না। পরদিন ঠাকুর শৌচে যাচ্ছেন—ঝাউতলার দিকে। দেখলেন যে, একটা লাল জবাফুলের গাছে একই ডালে দুটো ফুল; একটি একেবারে রক্ত-লাল আর একটি ধপধপে সাদা। দেখেই, ডালটি শুদ্ধ ভেঙ্গে এনে মথুরবাবুর সামনে ফেলে দিয়ে বললেন—"এই দেখো।" মথুর তো অবাক্! তাঁকে বলতে হল—"হাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে।"

এতেও মথুরবাবু ঠাকুরকে গ্রহণ করতে পারেন নি। আরো বাজিয়ে দেখতে লাগলেন।

—"এই যে অনিদ্রা, এত যে ভাবাবেশের বাড়াবাড়ি—বোধ হয় কঠিন ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের ফল। ব্রহ্মচর্য একটু খণ্ডিত হলে হয় তো এ-ভাবটা কেটে যাবে। সব কিছুরই সাম্য হবে।"—ভাবলেন মথুরবাবু। গোপনে শহর থেকে দু'জন পরমাসুন্দরীকে নিয়ে এলেন, এবং চুপি চুপি পাঠিয়ে দিলেন ঠাকুরের ঘরে। তিনি তো বারাঙ্গনা দেখলেন না! "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।"—তিনি

তাদের ভিতর দেখলেন ভবতারিণীকে। 'মা মা' বলতে বলতে ভাবস্থ হয়ে পড়লেন। মহা লজ্জিতা হয়ে অধোবদনে তারা চলে গেল। এতেও হল না। পরে আর একবার মথুরবাবু তাঁর 'বাবাকে' নিয়ে গিয়েছিলেন মেছুয়াবাজারে এক পল্লীতে—হাবভাবসম্পন্না সুন্দরীকুলের মধ্যে। ঠাকুর তো মেয়েদের দেখেই মায়ের স্তব করতে লাগলেন। বাহ্যচৈতন্য লোপ পেয়ে গেল—তিনি বালকের মত দিগম্বর হয়ে গেলেন। রমণীগণ তো অবাক্। এও কি সম্ভব? এ কোন্ মহাপুরুষ! আত্মগ্লানিতে ভরে গেল তাদের মন। অপরাধিনীর ন্যায় তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল। তিনি তখন সমাধিস্থ!··· এমনি আরো কত রকমের পরীক্ষা করেছেন মথুরবাবু!

* * *

ঠাকুরের দ্বারা নিয়মিত সেবা পূজা আর সম্ভব নয়, বুঝলেন মথুরবাবু। তার ব্যবস্থাও করলেন। ঐ সময়ে ঠাকুরের খুল্লতাত ভাই রামতারক চট্টোপাধ্যায় চাকরির সন্ধানে দক্ষিণেশ্বরে এলেন। তাঁর ডাক নাম ছিল হলধারী। ঠাকুরের অসুখ না সারা পর্যন্ত সাময়িকভাবে মথুরবাবু তাঁকে দেবীর পূজক নিযুক্ত করলেন।

হলধারী সুপণ্ডিত, নিষ্ঠাচারী ও বিষ্ণুভক্ত। নেহাত চাকরির খাতিরে দেবীপূজায় ব্রতী হয়েছিলেন। কয়েক দিন পরেই তিনি বলি বন্ধ করার প্রস্তাব করলেন। বহু দিনের প্রথা—একজন পূজারীর কথাতেই কি তা বন্ধ হতে পারে? বলি বন্ধ করা হল না। তাই হলধারী ক্ষুণ্ণমনে পূজা করতে লাগলেন। প্রায় মাস খানেক পরে হলধারী সন্ধ্যা করতে বসেছেন। শুনলেন দেবী দৃপ্তকণ্ঠে

বলছেন—"আমার পূজা তোকে আর করতে হবে না। যদি করিস্ তো সেবাপরাধে তোর ছেলে মরে যাবে।" হলধারী তত গ্রাহ্য করলেন না, মনে হল—মাথার খেয়াল। কিন্তু কিছু দিন পরেই খবর এল—তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের পরামর্শে তিনি তখন থেকে দেবীপূজা ছেড়ে গোবিন্দজীর পূজায় ব্রতী হলেন। হৃদয়রাম হলেন দেবীর পূজক।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এখন—"সততবোধং কেবলানন্দরূপং নির্বিকল্পং" অবস্থা। মা এখন নানা রূপে, নানা ভাবে নিরন্তর তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। নিরবকাশ মাতৃদর্শন—অবিচ্ছিন্ন মাতৃ-প্রকাশ। মাতৃসাধনা পৌঁছেছে—সিদ্ধিতে। মা এখন শুধু বাইরে নন, ভিতরে ও বাইরে—সকল ব্যাপ্তিতে। চোখ বুজে, চোখ মেলে—আবার অপলক দৃষ্টিতে তিনি নিরন্তর দর্শন করছেন মাকে। নানা রূপে। কখনো মা আর তিনি অভেদ। তবু রেখেছেন ব্যবধান—মা আর শিশু। তিনি এখন মায়ের কোলের ছোট্ট শিশুটি। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে মায়ের ইঙ্গিতের মুখাপেক্ষী।…আর সেই মুখ-ঘষড়ান নেই—নেই ছট্‌ফটানি; ক্রমে বিলাস—মাতৃভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিলাস। মায়ের বিরহজনিত গাত্রদাহ এখন রূপান্তরিত হয়েছে দিব্য-আনন্দ-উচ্ছলতায়, পরিপূর্ণতায়।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বাক্য নূতন রূপ পেয়েছে। মা-ই সব। মা-ই সকল চেতনায়—সকল দ্যোতনায়, ত্রিকাল ও কালাতীত সত্তায়। সকল বস্তুতে, প্রাণীতে ও বাণীতে। সকল গুণে।

শুধু সত্ত্বে নয়, তমঃ-তেও তিনি। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'—এই দিব্য অনুভূতি।...

আবার স্থূলদৃষ্টিসম্পন্নরা যাকে প্রতিমাপূজা বলে—তা-ই যে জ্ঞানাতীত পরমতত্ত্বের একটি প্রকৃষ্ট স্তর, তারই প্রতিষ্ঠা করলেন নিজের জীবনাদর্শ দ্বারা। এ যেন তাঁর সমন্বয়রূপ জীবন-বেদের প্রথম শ্লোক!

* * *

যুগধর্মসংস্থাপনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর নিরন্তর কঠোর সাধনা করেছিলেন। প্রথম চারি বৎসরের সাধনকালে, তিনি জগজ্জননীর মুখ চেয়ে একাই চলেছিলেন সাধনপথে। পরে জগন্মাতা মাতৃমুখাপেক্ষী শিশুর প্রসারিত হাত দু'টি ধরে, তাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। এই সাধনপথে আন্তরিকতা ও তীব্র ব্যাকুলতাই ছিল তাঁর একমাত্র পাথেয়। ঐ ব্যাকুলতা কত গভীর ও তীব্র ছিল, তার আভাস পাওয়া যায় ঠাকুরের নিজের কথা থেকে।

..."শরীরের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মাথার চুল বড় হয়ে ধূলা-মাটি লেগে আপনিই জট পাকিয়ে গিয়েছিল। ধ্যান করতে বসলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুর মত স্থির হয়ে যেত যে, পাখীরা জড় পদার্থ মনে করে নির্ভয়ে মাথার উপর বসে থাকত। আর জটার মধ্যে ঠোঁট দিয়ে নেড়েচেড়ে খাবার অন্বেষণ করত। আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হয়ে মাটিতে এমন মুখ ঘষড়াতাম যে, মুখ কেটে গিয়ে রক্ত পড়ত। এইভাবে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা

দিয়ে যেত তার হুঁশই থাকত না। পরে সন্ধ্যায় মন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ শুনে মনে পড়ত—দিন শেষ হয়েছে। জীবনের আর একটা দিনও বৃথায় চলে গেল, মার দর্শন পেলাম না। তখন তীব্র বেদনায় প্রাণ এমন ব্যাকুল করে তুলত যে, আর স্থির থাকতে পারতাম না। আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে—'মা, এখনো আমায় দেখা দিলি নি' বলে আর্তনাদে দিক পূর্ণ করতাম। আর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতাম। লোকে বলত—'পেটে শূলব্যথা হয়েছে—তাই অত কাঁদছে'।"

পরবর্তী কালে বালকভক্তদের লক্ষ্য করে তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন—"লোকে স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয়-সম্পত্তি হারিয়ে ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে। কিন্তু ঈশ্বরলাভ হল না বলে কে অমনধারা কাঁদে বল দিকি! অথচ বলবে—'তাঁকে এত ডাকলাম, তবু তিনি দর্শন দিলেন না। ঈশ্বরের জন্য ওরূপ ব্যাকুলভাবে একবার কাঁদুক দেখি, কেমন-না তিনি দর্শন দেন!'" কথাগুলির আন্তরিকতা শ্রোতাদের মর্মে আঘাত করত।

এই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে এবং পরবর্তী জীবনে ঠাকুরের নিত্য নূতন কত অনুভূতি, কত দর্শন হয়েছে! সে-সকল দর্শন ও অনুভূতির বিষয় জগৎ কতটুকুই বা জানতে পেরেছে? সেই অনন্ত-অসীম অনুভূতির সম্বন্ধে তিনি এক সময় বলেছিলেন—"এখানকার উপলব্ধি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।" সেই 'অবাঙ্‌মনসোগোচরং' রাজ্যের খবর যতটুকু পাওয়া গিয়েছে তাও প্রকাশ করার স্থান এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে নেই। সেজন্য আমরা তাঁর বিভিন্ন সাধন ও দর্শনাদির সামান্যভাবে কিছু উল্লেখমাত্র করে যাব এখানে।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার ক্রম বিভিন্ন সাধনমার্গের স্তরজ্ঞাপক নয়। সকল ধর্মই ভগবানলাভের এক একটি পথ—এই সত্য-প্রদর্শনই তাঁর সাধনার মূলসূত্র এবং মর্মবাণী।…অদ্বৈতভাবে সিদ্ধি-লাভের পরেও তিনি একেশ্বরবাদ ইসলামধর্ম সাধনা করেন।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ছোট-বড় এবং ভাল-মন্দরূপ যে দ্বন্দ্ব বা সংকীর্ণতাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্রম বরং তারই নিরাকরণ করেছে। তিনি চিনির পাহাড়ের গল্পটি বলেছিলেন—"একদানা দু'দানা চিনি খেলেই যে-পিঁপড়ের পেট ভরে যায়, সে-পিঁপড়েই চিনির পাহাড়ে কত চিনি আছে তার খবর করতে চায়!…শুক সনকাদি বড়জোর এক-একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে। শ্রীভগবান চিনির পাহাড়ের তুল্য।"

তিনি সকল ধর্মে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করে পরম সত্য উপলব্ধি করেছিলেন—'যত মত, তত পথ'। প্রত্যেক ধর্মই পরাশান্তি-লাভের একটি পথ।… এই মহামানবের জীবনে অনুষ্ঠিত হয়ে, সন্দেহ ও বিতর্কের বর্তমান যুগেও বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরান, ত্রিপিটক ও জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি সকল ধর্মশাস্ত্র পাশাপাশি একই বেদীতে স্থান পেয়েছে।…

প্রথম চার বৎসরে নানা ভাবে জগন্মাতার দর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের গতি তথায় রুদ্ধ হয় নি; চলেছিল বেগবতী স্রোতস্বিনীর মত অনন্ত ভাব-সমুদ্রে। তিনি এখন ডুবে গেলেন দাস্যভাবের সাধনায়। রামচন্দ্রের দর্শনের জন্য তিনি নিজের উপর রাম-দাস হনুমানের ভাব সম্যক্‌রূপে আরোপ করলেন।…

দাস্যভাবে সাধনায় চরম অনুভূতি তাঁর নিজের কথা থেকেই জানা যায়।—"ঐ কালে একদিন পঞ্চবটীতে উদাস মনে বসে আছি, এমন সময় দেখি—এক নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী নারীমূর্তি অদূরে আবির্ভূতা হয়ে স্থানটি আলোকিত করে দিল। তাঁর মুখে প্রেম-দুঃখ-করুণা ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ অপরূপ লাবণ্য। ঐ মূর্তি প্রসন্ন-দৃষ্টিপাতে মন্থরপদে উত্তরদিক হতে দক্ষিণে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। স্তম্ভিত হয়ে ভাবছি—'কে ইনি?' সহসা কোত্থেকে একটা হনুমান উ-উপ্ শব্দে লাফিয়ে এসে তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল। ভিতর হতে কে যেন বলে উঠল—'সীতাদেবী। জনকরাজ-নন্দিনী সীতা—রামময়-জীবিতা সীতা।' তখন 'মা মা' বলে অধীর হয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছি, এমন সময় চকিতে ঐ মূর্তি (নিজ শরীর দেখিয়ে) এর মধ্যে প্রবিষ্ট হল। আনন্দে অভিভূত ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম। ধ্যান-চিন্তাদি না করে, এমন সহজ অবস্থায় কোন দর্শনাদি ইতঃপূর্বে আর হয় নি।"

৭

রাণী রাসমণির কালীবাড়ির সুযশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধুসেবায় রাণী মুক্তহস্ত। বহু তীর্থযাত্রী সাধু, সাধক ও সিদ্ধ-পুরুষের সমাগম হতে লাগল দক্ষিণেশ্বরে। ঐ কালে কোন সাধুর নিকট ঠাকুর প্রাণায়ামাদি হঠযোগের ক্রিয়া অভ্যাস করেছিলেন। এবং ঐ যোগাভ্যাসের ফলে তাঁর জড়সমাধি হবার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে যে জগতের কল্যাণের জন্য থাকতে হবে! সেজন্য দেব-ইচ্ছায় তাঁর জড়সমাধি হল না।...

হলধারীর কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরে পূজা করতেন, এদিকে গোপনে পরকীয়া-প্রেম-সাধনে প্রবৃত্ত হলেন। বৈষ্ণবমতে এ-ও একটা সাধনপথ। নানা কুৎসা রটে গেল তাঁর নামে। বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন বলে, ভয়ে হলধারীর সামনে কেউ কিছু বলতে সাহস করত না। সদ্‌ধর্মপ্রবর্তক শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হয়ে একদিন তাঁকে বলতে গেলেন। কিন্তু ফল হল বিপরীত। হলধারী রেগে বললেন —"কনিষ্ঠ হয়ে তুই আমায় অবজ্ঞা করলি! তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে।"

এর কয়েক দিন পরেই এক সন্ধ্যারাত্রে ঠাকুরের তালুদেশ হতে অজস্র রক্তপাত হতে লাগল। তিনি বলেছিলেন—"সিম্‌পাতার রসের মত মিস্ কাল রক্ত।...মুখের ভিতর কাপড় গুজে দিয়েও রক্ত চাপতে পারছিলাম না। সংবাদ পেয়ে সকলে এসেছে।

হলধারীও এল শশব্যস্ত হয়ে। তাকে বললাম—'দাদা, শাপ দিয়ে তুমি আমার কি অবস্থা করলে বল দেখি?' —সেও কাঁদতে লাগল।

"ঠাকুরবাড়িতে সে-দিন একজন প্রাচীন সাধু এসেছিলেন। গোলমাল শুনে তিনিও এলেন। সব পরীক্ষা করে বললেন—'দেখছি, তুমি যোগ-সাধনা করতে। ভয় নেই। রক্ত বের হয়ে গিয়ে ভালই হয়েছে। হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়। তোমারও তা-ই হচ্ছিল।...মাথায় না উঠে ঐ রক্ত আপনা থেকেই যে মুখের ভিতর দিয়ে বেরুবার পথ করে নিয়েছে—এতে ভালই হল। কারণ জড়সমাধি হলে তা কিছুতেই ভাঙত না। তোমার শরীর দ্বারা জগন্মাতার বিশেষ কোন কাজ আছে। তাই তিনি এভাবে রক্ষা করলেন।' সাধুর ঐ কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম।" ঠাকুরের শরীর দেবরক্ষিত এবং দেবকার্যের জন্য। কাজ সমাধা না হওয়া পর্যন্ত তা কি নষ্ট হতে পারে!

*　　　*　　　*

হলধারীর সঙ্গে ঠাকুরের সম্বন্ধটি বেশ রহস্যময়। ঠাকুর বয়ঃকনিষ্ঠ এবং হলধারীর ভাষায় 'আকাট মূর্খ'। হলধারী বয়োজ্যেষ্ঠ, শাস্ত্রজ্ঞ এবং পাণ্ডিত্যাভিমানী। অথচ ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশ, জগদম্বার ভাবে বিভোর তন্ময়তা, ভগবদ্‌নাম-গুণগানশ্রবণে অপূর্ব উল্লাস প্রভৃতি দেখে তাঁর মনে হত, রামকৃষ্ণের ভিতর নিশ্চয়ই ঐশ্বরিক আবেশ হয়েছে। হৃদয়কে বলতেন—"হৃদে, তুই নিশ্চয়ই ওর ভিতর কিছু দেখেছিস্, নইলে এত করে ওর সেবা করা কখনো সম্ভব নয়।"

ঠাকুরের 'পূজা' দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন হলধারী। বলতেন —"রামকৃষ্ণ, এবার আমি তোকে চিনেছি।" এসব ঘটনার অভাবনীয় পরিসমাপ্তি হল একদিন। হলধারী কালীকে বলতেন তমোগুণময়ী এবং ঠাকুরকে তামসীদেবীর আরাধনা করতে বিরত করতেন। একদিন ঠাকুর মন্দিরে গিয়ে ভবতারিণীকে সজলনয়নে জিজ্ঞাসা করলেন—"মা, তুই কি তমোগুণময়ী? হলধারী যে বলছে!" জগন্মাতার মুখে তাঁর যথার্থ স্বরূপতত্ত্ব শুনে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর হলধারীর কাছে ছুটে গেলেন এবং একেবারে তাঁর কাঁধে চেপে বসে বলতে লাগলেন—"তুই মাকে তামসী বলিস্? মা কি তামসী? মা যে ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী।" ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের স্পর্শে পূজার আসনে উপবিষ্ট হলধারীর অন্তর আলোকিত হয়ে গেল। তিনি ঠাকুরের ভিতর জগন্মাতার প্রকাশ দেখতে পেয়ে আবেগভরে ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলেন।

হৃদয়রাম দেখেছিলেন ঐ অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি হলধারীকে পরে জিজ্ঞাসা করলেন—"মামা, এই তো তুমি বল—রামকৃষ্ণকে ভূতে পেয়েছে। তাই যদি হয়, তুমি তাঁকে পূজা করলে যে?" হলধারী বললেন—"কি জানি হৃদু, কালীঘর হতে ফিরে এসে সে আমাকে কি যে একরকম করে দিল, আমি সব ভুলে গিয়ে তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রকাশ দেখতে পেলাম! কালী-মন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই, তখনই আমার ঐ রকম হয়ে যায়। কি এক চমৎকার ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারি নে!"

তখন থেকে ক্রমে ক্রমে অনেক ভাগ্যবানই ঠাকুরের ভিতর জগন্মাতার ও বিভিন্ন দেবদেবীর দিব্যপ্রকাশ দেখে তাঁকে দেবমানব-জ্ঞানে শ্রদ্ধা-পূজা করতে আরম্ভ করেছিল।...

*　　　*　　　*

ঐ কালের কোন সময়েই 'টাকা মাটি—মাটি টাকা'-রূপ অভিনব সাধন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ সাধনকালে শ্রীঠাকুর মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান লাভ করেন। 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন'—এ শাস্ত্রবাক্য প্রমাণিত হল। পরে তিনি করেছিলেন সমদর্শন ও সমজ্ঞানের অন্যান্য সাধনা। আব্রহ্মস্তম্ব সকল বস্তু ও প্রাণীতে শ্রীভগবানের প্রকাশ উপলব্ধি করে ঠাকুর 'শুনি চৈব শ্বপাকে চ' সমদর্শী হলেন।

তখন ভাবের আতিশয্যে সব একাকার—ব্রহ্মাকার হয়ে গেল। সামান্য জাতিকুলের গণ্ডি ভেঙ্গে গেল—ভাবের বন্যায়। অজ্ঞাত-জাতি কাঙ্গালীদের ভুক্তাবশেষ মহাপ্রসাদজ্ঞানে তিনি গ্রহণ করলেন, আর তাদের ভোজনস্থান মুক্ত করলেন সম্মার্জনী ধরে। ভগবান যে সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। হেয়-উপাদেয় —এ-বুদ্ধির স্থান কোথায়? মেথরও যে ভগবানের এক রূপ! মেথরের কাজও ভগবানের পূজা। তাই তিনি অশুচি স্থান ধৌত করে নিজের মাথার জটাবদ্ধ চুল দিয়ে তা মুছে দিলেন! এতেও তো শেষ হল না! পরে পরে করলেন আরো রোমাঞ্চকর অভিনব সাধনা। শাস্ত্রে এসব সাধনার উল্লেখ কোথাও তো নেই! শাস্ত্র তো অবতারপুরুষদের অনুশাসনবাক্য—মহামানবদের বাণী ও নির্দেশ। ঠাকুরের সমবুদ্ধির সাধনা চরমে উঠল, যেদিন তিনি

অপরের পুরীষ জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করলেন নির্বিকার চিত্তে। যেন সুরভি চন্দন আর পুরীষে এতটুকু প্রভেদ নেই! এ সাধনায়ও তিনি সিদ্ধ হলেন।

এসকল সাধন-ইঙ্গিত তিনি কোন গুরু-উপদেশ হতে পান নি। তাঁর শুদ্ধ মনের ইঙ্গিতেই তিনি এসব সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি বলতেন—"শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক। মন শুদ্ধ হলে সে মনই গুরুর কাজ করে।" তাঁর আজন্ম পরিশুদ্ধ মন প্রথম হতেই সদ্‌গুরুর ন্যায় তাঁকে সাধনপথের নির্দেশ দিয়েছিল। শুধু তা-ই নয়। তাঁর শুদ্ধ মনই যুবক-সন্ন্যাসীর বেশে অনুরূপ সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে তাঁকে সর্ববিষয়ে নির্দেশ দিত। ঐ সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর পরবর্তী কালে বলেছিলেন—"আমারই ন্যায় দেখতে এক যুবক-সন্ন্যাসিমূর্তি ভিতর হতে যখন তখন বের হয়ে আমায় সকল বিষয়ে উপদেশ দিত। তার মুখ থেকে যা শুনেছিলাম, সেসব তত্ত্বকথাই ব্রাহ্মণী, ন্যাংটা প্রভৃতি এসে পুনরায় উপদেশ দিয়েছিলেন। এতে মনে হয়, শুধু শাস্ত্রবিধির সত্যতা প্রমাণ ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই তাঁরা গুরুরূপে এ জীবনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া তাঁদের গুরুরূপে গ্রহণ করার অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।" ..

সাধনার প্রথম চার বৎসরের শেষ দিকে ঠাকুরের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। ঠাকুর তখন কামারপুকুরে। পাল্কিতে করে একদিন শিহড়ে হৃদয়রামের বাটীতে যাচ্ছেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ছায়া-শীতল পথ। প্রাকৃতিক শোভাসমৃদ্ধ মনোরম আবেষ্টনী। সুনীল আকাশ। ঠাকুর প্রকৃতির সৌন্দর্যসম্ভার সম্ভোগ

করতে করতে যাচ্ছেন আনন্দিত মনে। হঠাৎ দেখলেন—তাঁর শরীর হতে দিব্যকান্তি দু'টি কিশোর বালক সহসা বহির্গত হয়ে বনকুসুম-অন্বেষণে কখনো ছুটে যাচ্ছে প্রান্তরমধ্যে, আবার কখনো পাল্কির খুব কাছে এসে সস্মিতমুখে তাঁর সঙ্গে নানা কথা ও হাস্য-পরিহাস করতে করতে চলেছে কাছে কাছে। অনেকক্ষণ ঐভাবে নানা খেলা করে দিব্য মূর্তিদ্বয় তাঁর দেহের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করল। সহজ অবস্থায় দেখলেন ঠাকুর এ লীলাভিনয়।*

* এর প্রায় দেড় বৎসর পরে দক্ষিণেশ্বরে একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর ঐ দর্শনের কথা বলেন। ব্রাহ্মণী উত্তেজিত কণ্ঠে আবেগভরে বলে উঠলেন—"বাবা, তুমি ঠিক দেখেছ। এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব। নিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে তোমার ভিতর রয়েছে।" তারপর ব্রাহ্মণী চৈতন্যভাগবত থেকে অনুরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করলেন।

শুধু যে 'গদাধর'-ই এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে তা নয়। তাঁতে সঙ্গত হয়েছিল শিব-শক্তি, রাম-সীতা, যীশু-মহম্মদ, নিত্যানন্দ-চৈতন্য এবং আরো অনেক শক্তির অবতার। তা আমরা পরে পরে দেখতে পাব।

৮

ঠাকুরের প্রথম চার বৎসরের শ্রেষ্ঠ সাধনায়—এবং তাঁর জীবনেরও সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনায় তিনি এখন ব্রতী হলেন। শুধু তাঁর জীবনের কেন, জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসেও তা দুস্তরতম সাধনা। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'-র অপেক্ষাও দুস্তর সাধন-সমুদ্রে তিনি ঝাঁপ দিলেন। তার-ই পরিচয় আমরা এখন পাব।…

গদাই উন্মাদ হয়েছে, মন্দিরে আর পূজা করতে পারছে না—শুনলেন চন্দ্রমণি। শুনলেন রামেশ্বর। মাতৃবক্ষ নিংড়ে স্নেহ-প্লাবনের ধারা নেমে এল চন্দ্রমণির চক্ষে।—হা রঘুবীর! এত ছিল আমার কপালে! অস্থির হয়ে উঠল মায়ের প্রাণ। চিঠির পর চিঠি লিখিয়ে চন্দ্রমণি বাড়িতে আনলেন তাঁর স্নেহের নিধিকে। তখন ১২৬৫ সালের আশ্বিন কি কার্তিক মাস।··

শ্রীরামকৃষ্ণের উন্মনা-উন্মাদভাব, আর তাঁর 'মা-মা' রবে কাতর ক্রন্দন শুনে চন্দ্রমণির বুক ফেটে যায়। তিনি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক ও নানা ঔষধাদির ব্যবস্থা করালেন। ওঝা এল, চণ্ড নামাল। সকলেই বললে—এতো ভূতে পাওয়া নয়!

শ্রীঠাকুর বয়স্যদের সঙ্গে আগের মত হাসি-ঠাট্টা, সহজ মিষ্ট ব্যবহার করতেন কিন্তু তবু কেমন যেন একটা অন্তরাল রয়েছে। বয়স্যেরা ঠিক আগের মত আর তাদের গদাইর কাছ ঘেঁষে গলাগলি হয়ে দাঁড়াতে পারে না।… কিছুদিন পরে তিনি কতকটা শান্তভাব ধারণ করলেন। তখনো তাঁর ভাবাবেশ হয়। নিরন্তর এক

আনন্দের নেশায় তিনি যেন বিভোর হয়ে থাকেন। বাহ্যিক উচ্ছ্বাস তত নেই। নেই সেই বিরহের মর্মভেদী আর্তনাদ। এখন যেন পরিপূর্ণতার আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ তাঁর মন। তাতে নেই তরঙ্গ, নেই স্ফীতি—শান্ত, প্রশান্ত পয়োধির মত। জগন্মাতার বিভিন্ন দর্শনে তিনি আত্মস্থ। আহারাদিও অনেকটা স্বাভাবিক।

… শ্রীঠাকুর ভূতির খাল ও বুধুই-মোড়ল শ্মশানে অনেক সময় কাটান। দিনে রাতে তথায় করেন নানা সাধনা। '৺মায়ের' সঙ্গিনী ডাকিনী-যোগিনীদের আহ্বান করে ভোগ চড়ান, তাঁদের নিয়েই আনন্দ করেন। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত। অথচ গদাই বাড়ি ফিরছে না দেখে রামেশ্বর ডাকতে ডাকতে শ্মশানের দিকে গেলেন। দূর থেকেই দাদার গলার শব্দ শুনে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"যাচ্ছি গো দাদা, তুমি আর এদিকে এগিয়ো না। তা হ'লে এরা (উপদেবতারা) তোমার অনিষ্ট করবে।"…

ক্রমে বাধাশূন্য নিরন্তর দর্শন ও জগন্মাতার নানাভাবে বিলাস শ্রীরামকৃষ্ণের মনকে ক্রমে আরো শান্ত করল। বাহ্যতঃ গদাইকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ দেখে চন্দ্রমণির চোখের কোণে আনন্দাশ্রু নেমে এল। এবার গদাইর বিয়ে দিতে হবে—ভাবলেন চন্দ্রমণি। রামেশ্বরের সঙ্গে একান্তে পরামর্শ করে চারিদিকে উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন—গোপনে গোপনে। গদাধর জানতে পারলে যদি বেঁকে বসে! পাত্রী তো জুটেছে। কিন্তু অত টাকা কোথায়? পাত্রী যত বড় ও যত বেশী সুন্দরী, পণ তত বেশী। ক্রমে চন্দ্রমণি ও রামেশ্বরের মন গভীরবিষাদময় হয়ে গেল।

এখন উপায় ? তাঁরা যে বড় গরীব ! মাতা-পুত্রের পরামর্শ যদিও হচ্ছিল অতি নিভৃতে, তবু শ্রীঠাকুরের কিছুই অবিদিত ছিল না। তিনি চুপ-চাপ দেখছিলেন মজাটা। যখন হতাশার কালছায়ায় চন্দ্রমণির মন আচ্ছন্ন, তখন ভাবাবিষ্ট হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বললেন—"এখানে সেখানে অনুসন্ধান করা বৃথা। জয়রামবাটীর রামচন্দ্র মুখুজ্যের বাড়িতে পাত্রী কুটো-বাঁধা আছে। দেখ গে।"

তাঁর কথামত সন্ধান নেওয়া হল। অন্য সব বিষয়ে যা হোক ঠিকই, কিন্তু কন্যা নিতান্ত বালিকা—সবেমাত্র ছয় বৎসরে পড়েছে। ভবিতব্যজ্ঞানে চন্দ্রাদেবী ঐ মেয়ের সঙ্গেই গদাধরের বিবাহ স্থির করলেন। অনন্তর সন ১২৬৬ সালের বৈশাখের শেষে এক শুভদিনে এই পরমশুভ পরিণয় সম্পন্ন হল। পণ লেগেছিল তিন শত টাকা। শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স তখন চব্বিশ বৎসর আর শ্রীসারদামণি সবেমাত্র ছয় বৎসরে পড়েছেন। অনাড়ম্বর বিবাহ। অতি সহজ ও সাধারণ ঘটনা। কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটি জগতের ইতিহাসে যে কত বড় স্থান অধিকার করেছে, কত বড় অসামান্য ঘটনায় পর্যবসিত হয়েছে, তা আমরা পরে দেখতে পাব। এবং সে সম্বন্ধে সামান্য আলোচনাও করব।...

গরীব হলেও বংশের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য চন্দ্রাদেবী গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ি হতে কিছু গহনা চেয়ে এনে নববধূকে সাজিয়েছিলেন। ঐ সব গহনা ফিরিয়ে দেবার সময় হয়েছে। অথচ চন্দ্রাদেবী কিছুতেই বালিকা-বধূর গা থেকে গহনাগুলি খুলে দিতে পাচ্ছেন না। মনের কষ্টে বৃদ্ধা অঞ্চল দিয়ে চোখের জল মোছেন আর সারদাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন

শ্রীঠাকুর বুঝতে পারলেন মায়ের প্রাণের ব্যথা। বধূ যখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন তার গা থেকে তিনি অতি সন্তর্পণে সব গহনা খুলে এনে মায়ের হাতে দিলেন। কিন্তু জেগে উঠেই সারদা সজলনয়নে মাকে বললেন—"আমার গহনা কোথায় গেল?" চন্দ্রমণি তার কি জবাব দেবেন? তাঁরো যে বুক ফেটে যাচ্ছে! সজলনয়নে স্নেহের পুতলিকে কোলে টেনে নিয়ে বললেন—'কেঁদো না, মা। গদাধর তোমায় এর চেয়ে ভাল ভাল ঢের গহনা গড়িয়ে দেবে।'

কিন্তু সেদিনই বধূর খুড়ো এসে সব ঘটনা জানতে পারলেন, এবং মহা অসন্তোষ প্রকাশ করতে করতে কন্যাকে নিয়ে চলে গেলেন বাড়িতে। পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দেবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন—"ওরা এখন যা-ই বলুক আর করুক না কেন, বিয়ে তো আর ফিরবে না!"...

বিবাহের পরেও শ্রীঠাকুর এক বৎসরের বেশী কামারপুকুরে ছিলেন। সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বধূ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। কুলপ্রথানুসারে তাঁকে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে যেতে হল। এক শুভদিনে স্ত্রীকে 'যোড়ে' নিয়ে তিনি কামার-পুকুরে ফিরে এলেন। এর কিছু দিন পরেই অনেকটা সুস্থ শরীরে তিনি দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন করে পূর্বের ন্যায় ব্রতী হলেন মায়ের পূজায়।...

এতদিন মন্দিরের 'মা' যেন তাঁর সন্তানের অদর্শনে ব্যাকুলা হয়ে ছিলেন। আসতেই বুকে জড়িয়ে নিলেন শিশুকে। শ্রীঠাকুরের সেই উন্মাদনা আরম্ভ হল আরো তীব্রভাবে। সেই গাত্রদাহ,

সেই অস্থিরতা। সর্বক্ষণ বুক লাল হয়ে থাকে। চোখের পলক নেই। অপলক নেত্রে আত্মহারা হয়ে তিনি শুধু মাকে দেখেন। নানা ভাবে—নানা রূপে ; সকল বস্তুতে —সকল ব্যাপ্তিতে।

··· মথুরবাবুর বিস্ময় লাগল। বে' করে তো মনটা ঠাণ্ডা হবার কথা। কিন্তু এ যে দেখছি বিপরীত ! এতে মথুরের শ্রদ্ধাভক্তি আরো বেড়ে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের উপর। তিনি অস্থির হয়ে কলিকাতার সেরা কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীনে শ্রীঠাকুরকে রাখলেন। চিকিৎসায় কোন ফল দেখা গেল না, তবু চলেছে নানা চিকিৎসা। একদিন হৃদয়ের সঙ্গে শ্রীঠাকুর কবিরাজের বাড়িতে গিয়েছেন। সেখানে কবিরাজের এক নিকট আত্মীয়—আর একজন প্রবীণ বৈদ্য উপস্থিত ছিলেন। রোগের সব লক্ষণ শুনে তিনি বললেন—"এঁর তো দিব্যোন্মাদ-অবস্থা বলে মনে হচ্ছে ; এ যোগজ ব্যাধি। ঔষধে সারবার নয়।" হল-ও তাই। রোগের উপশম না হয়ে বেড়েই চলল—সেই উন্মাদ-উন্মনা অবস্থা।

কামারপুকুরে চন্দ্রাদেবী শুনলেন—ছেলের অসুখের কথা। কেঁদে কেঁদে 'বুড়ো শিবের' দুয়ারে শরণ নিলেন। জাগ্রত দেবতা বুড়ো শিব। তিনি প্রায়োপবেশন করে পড়ে রইলেন। প্রত্যাদেশ হল—"মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।" প্রত্যাদিষ্টা বৃদ্ধা তখন হত্যা দিলেন মুকুন্দপুরের শিবের কাছে। দু-তিন দিন পরেই শিব দিব্য দেহে আবির্ভূত হয়ে চন্দ্রাদেবীকে বললেন —"ভয় নেই, তোমার ছেলে পাগল হয় নি। ঐশ্বরিক আবেশে তার ওরূপ অবস্থা হয়েছে।" কথঞ্চিৎ শান্ত-মনে চন্দ্রাদেবী বাড়িতে ফিরে এলেন।···

এদিকে এক অভাবনীয় ঘটনা মথুরবাবুর জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। ঠাকুরের ভিতর মথুরবাবুর এক অলৌকিক দর্শন হল।

ঐ ঘটনা সম্বন্ধে ঠাকুর পরে বলেছিলেন—"বল্লুম, 'তুমি এ কি করছ? তুমি বাবু, রাণীর জামাই। লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও; ওঠ!' সে কি তা শোনে? তারপর একটু ঠাণ্ডা হয়ে সব কথা ভেঙ্গে বললে—অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল। বললে—'বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলুম— যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যখন পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে। চোখ ভাল করে পুঁছে ফের দেখলাম। দেখি তা-ই! এভাবে যতবার দেখি— তুমি নও, মা আর শিব।' এই বলে, আর কাঁদে! আমি বল্লুম— 'আমি তো কৈ কিছু জানি নে, বাপু।' কিন্তু সে কি শোনে? ···অনেক করে বুঝিয়ে সুজিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়। মথুর কি সাধে এতটা করত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিলেন।"

ঐ দর্শনের পর মথুরবাবুর চমক ভাঙ্গল। তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি শ্রীঠাকুরকে দেখেছিলেন মহামানবরূপে; আর নরদেহে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও সেবা করেছিলেন— ঐদিন হতে শ্রীঠাকুরকে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁর সেবা করাকে তিনি মনে করতেন পরমপুরুষার্থ।···

৯

ঠাকুর কামারপুকুর হতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। তার কিছুদিন পরেই কয়েক দিন মাত্র রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করে রাণী রাসমণি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে শরীরত্যাগ করে গমন করলেন অভীষ্ট লোকে।

ঠাকুর বলতেন— শরীরত্যাগের কিছু দিন পূর্বে রাণী তাঁর কালীঘাটের আদিগঙ্গার তীরস্থ বাড়িতে এসে বাস করেছিলেন। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁকে গঙ্গাগর্ভে আনা হয়। সে স্থান তখন আলোকমালায় সজ্জিত ছিল। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—"সরিয়ে দে, সরিয়ে দে—ওসব রোস্‌নাই আর ভাল লাগছে না। এখন আমার মা আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গপ্রভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে।··· (কিছুক্ষণ পরে) 'মা এলে!' "—বলেই কালীপদ-অভিলাষিণী রাসমণি শান্তভাবে কালীপদে মিলিতা হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্ম-সমন্বয়-সাধনার মন্দির নির্মাণ করে রাণী যুগধর্ম-স্থাপনের সহায়ক হয়েছিলেন। এবং এই বিশেষ কার্যসাধনের জন্যই বোধ হয় জগন্মাতা নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর অষ্টসখীর একজনকে। যে কালে রাণী শিব, কালী ও বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করে একই স্থানে স্থাপন করেছিলেন, সে সময়ে ঐ জাতীয় বিভিন্নভাবসমন্বিত কোন প্রসিদ্ধ মন্দির কদাচিৎ দৃষ্ট হত। ঐশী শক্তির অলক্ষ্য ইঙ্গিতে তাঁর প্রাণে যে ঐ প্রকার অনুপ্রেরণা

এসেছিল, তা আমরা আজ এত বৎসর পরে যুগধর্মের প্রয়োজন ও প্রভাব দেখে সহজেই অনুমান করতে পারি।

রাণীর দেহত্যাগের কিছু দিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে এলেন যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী—যিনি রামকৃষ্ণের ভিতর ভাব, মহাভাব, ঈশ্বরের আবেশ ও প্রকাশ দেখে তাঁকে অবতার বলে প্রথম ঘোষণা করেন। পরে তিনি খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সভায় শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করে, তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করেছিলেন।

ঠাকুর একদিন সকালবেলা পোস্তার ধারে বাগানে ফুল তুলছেন। মালা গেঁথে সাজাবেন মাকে। এমন সময় দেখলেন—একখানি নৌকা বকুলতলার ঘাটে এসে লেগেছে। একজন ভৈরবী সে নৌকা থেকে নেমে এলেন চাঁদনির দিকে। দেখেই, ভৈরবী কে এবং কেন এসেছেন, ঠাকুর তা জানতে পারলেন। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে, তিনি ভৈরবীকে ডেকে আনতে বলেন হৃদয়কে।—"ভৈরবী অপরিচিতা, ডাকলেই আসবে কেন?"—বিস্মিত হয়ে হৃদয় বললেন।—"আমার নাম করে বললেই আসবে"—ঠাকুরও বললেন বালকের মতো। হলও তাই। হৃদয় গিয়ে মামার নাম করে বলতেই ভৈরবী বিনা-প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে ঠাকুরের ঘরে চলে এলেন এবং ঠাকুরকে দেখেই আনন্দ ও বিস্ময়ে অধীরা হয়ে সজলনয়নে বললেন—"বাবা, তুমি এখানে রয়েছ? গঙ্গাতীরে আছ জেনে এত দিন তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।"—"আমার কথা কি করে জানলে, মা?"—জিজ্ঞাসা করলেন ঠাকুর। ভৈরবী সোল্লাসে বললেন—"জগদম্বার কৃপায় সে-কথা আমি জানতে পেরেছিলাম।"

দীর্ঘ দিন অদর্শনের পর বালক যেমন মাকে কাছে পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে প্রাণের সব কথা বলে, তেমনিভাবে শ্রীঠাকুরও ভৈরবীর কাছে বসে নিজের অলৌকিক দর্শন, ভগবৎপ্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা ও অসহ্য গাত্রদাহ প্রভৃতি সব কিছু অবস্থার কথা বলে যেতে লাগলেন। নির্বাক্ বিস্ময়ে শুনছেন ভৈরবী।—"হ্যাঁগা, আমার এসব কি হল? সত্যই কি পাগল হয়ে গেলাম! জগদম্বাকে মনে-প্রাণে ডেকে শেষটায় কি আমার কোন কঠিন ব্যাধি হল?"—আবেগভরে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর। করুণার্দ্রকণ্ঠে আশ্বাস দিয়ে ব্রাহ্মণী বলছেন—"তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার মহাভাব হয়েছে—তাইতো এসব অবস্থা! এ ভাব চেনবার কি কারো সাধ্য আছে? এ অবস্থা হয়েছিল রাধারাণীর, এ মহাভাব হয়েছিল শ্রীচৈতন্যের। ভক্তিশাস্ত্রে এসব কথা লেখা আছে।" ..

হৃদয় অবাক্ বিস্ময়ে দেখছিলেন—দু'জন অপরিচিতের মধ্যে অন্তরঙ্গের মত ব্যবহার! ক্রমে বেলা বেড়েছে। শ্রীঠাকুর প্রসাদী ফল মিষ্টি মাখন মিশ্রি খেতে দিলেন ভৈরবীকে। কিন্তু ছেলেকে না খাইয়ে মা তো খাবেন না! তাই ঠাকুরকে আগে একটু খেতে হল।

দেবীদর্শন ও জলযোগান্তে ভৈরবী ব্রাহ্মণী নিজ আরাধ্য রঘুবীরের ভোগের জন্য সিধা নিয়ে গেলেন পঞ্চবটীর দিকে।

রান্নাদি শেষ হয়েছে। ব্রাহ্মণী কণ্ঠস্থিত রঘুবীর-শিলার সামনে ভোগনিবেদন করে ইষ্টধ্যানে বসেছেন। অভূতপূর্ব দর্শনলাভে ক্রমে তিনি সমাধির অতল তলে ডুবে গেলেন।

দু'গণ্ড বেয়ে পড়ছে আনন্দাশ্রু। এদিকে শ্রীঠাকুর ভাবাবিষ্ট হয়ে এলেন পঞ্চবটীতে এবং রঘুবীরকে নিবেদিত ভোগ খেতে লাগলেন। পরে সহজ অবস্থায় এসে ব্রাহ্মণী যা দেখলেন তাতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। ধ্যানে যা দর্শন হয়েছে, চোখ মেলেও দেখতে পেলেন তা-ই। তাঁর ইষ্ট—তাঁর ভগবান রঘুবীর রামকৃষ্ণরূপ ধরে পূজা গ্রহণ করছেন। এদিকে শ্রীঠাকুর ভাবাবস্থা হতে নেমে এসে নিজ কার্যের জন্য যেন ক্ষুব্ধ হয়ে বলছেন—"কে জানে, বাপু, আত্মহারা হয়ে কেন এরূপ করে বসি!"

ইষ্টদর্শনে পুলকিতা ভৈরবী বললেন—"বেশ করেছ, বাবা! এ তো তুমি কর নি! তোমার ভিতর যিনি রয়েছেন তিনি-ই করেছেন। ধ্যানে যা দেখেছি, চোখ মেলে তা-ই প্রত্যক্ষ করলাম। আমার পূজা সার্থক হয়েছে। আর বাহ্যপূজার কোন প্রয়োজন নেই।" বলেই ব্রাহ্মণী অতি ভক্তিভরে খেতে লাগলেন ঐ প্রসাদ।

রঘুবীরকে জীবন্ত পেয়েছেন। জীবন্ত দেখছেন সামনে। পূজা-ধ্যানের লয় হল ইষ্টদর্শনে। প্রেমরোমাঞ্চিত দেহে ব্রাহ্মণী দীর্ঘকাল-পূজিত নিজ রঘুবীর-শিলা বিসর্জন দিলেন গঙ্গাগর্ভে।...

প্রথম দিনই রামকৃষ্ণের ভিতর রামচন্দ্রের দর্শনলাভ করে ভৈরবীর দৃঢ় ধারণা হল—ইনি তো সাধারণ সাধক বা সিদ্ধ-মহাপুরুষ নন! ইনি ভগবান্ স্বয়ং। ঠাকুরের দিব্য অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতিসকল শাস্ত্রের সঙ্গে সব মিলিয়ে পেয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার! সে কথা হাঁকডাক করে তিনি সকলকে বলতে লাগলেন। মথুরবাবু শুনলেন। শুনল আর আর সকলে। মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল কালীবাড়িতে।

এই ভাবে ছয়-সাত দিন কেটে গেল। ব্রাহ্মণী পঞ্চবটীতে আছেন। তীক্ষ্নদর্শী ঠাকুর ভাবলেন—ব্রাহ্মণীর এখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। জগতের লোক নিজের মন নিয়ে সব কিছু বিচার করে। তাঁদের এ ঘনিষ্ঠতা অন্যে কি চক্ষে দেখবে কে জানে? ব্রাহ্মণীকে বলামাত্রই তিনিও বুঝলেন ব্যাপারটি এবং কালীবাড়ি ছেড়ে দক্ষিণেশ্বর গ্রামেই গঙ্গাতীরে দেবমণ্ডলের ঘাটে চলে গেলেন।

দূরে সরে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনটি পড়ে থাকে সারাক্ষণ শ্রীঠাকুরের উপর। সেই ব্রহ্ম-গোপালকে দেখবার জন্য, কিছু খাওয়াবার জন্য তিনি রোজ আসেন কালীবাড়িতে। ভিক্ষায় যা জুটে, তা-ই নিয়ে আসেন গোপালকে খাওয়াতে। কত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হয়। দিব্য ভাবাবেশ হয় ঠাকুরের। মহা আনন্দে কিছু সময় কাটিয়ে ব্রাহ্মণী নিজ আস্তানায় ফিরে যান।

একদিন মথুরবাবুর সঙ্গে পঞ্চবটীতে বসে ঠাকুর নানা কথা বলছেন। বললেন—"ভৈরবী বলে যে, অবতারের সব লক্ষণ নাকি এ শরীর-মনে আছে। তাঁর অনেক শাস্ত্র পড়া আছে...।" সরলতার প্রতিমূর্তি বাবার কথা শুনে মথুরবাবু বলছেন—"তিনি যাই বলুন না কেন, অবতার তো আর দশটির বেশী নেই? সুতরাং তাঁর কথা সত্য হবে কেমন করে? হাঁ, তবে তোমার উপর মা কালীর কৃপা হয়েছে—এ খুব সত্য।"

এসব কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় ব্রাহ্মণী একথালা মিষ্টান্ন হাতে নন্দরাণীর আবেশে তন্ময় হয়ে এলেন পঞ্চবটীতে। কাছে এসেই বিপরীত ভাবের লোক দেখে নিজের ভাবসম্বরণ করলেন এবং মিষ্টান্নের থালাটি দিলেন হৃদয়কে। ব্রাহ্মণীকে দেখেই ঠাকুর

বললেন—"ওগো, তুমি এখানকার সম্বন্ধে যা যা বল, তা ওঁকে বলছিলাম। ইনি বললেন—'অবতার তো দশটি ছাড়া আর নেই!' "

মথুরবাবুর দিকে তাকিয়ে ভৈরবী বললেন— "কেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতে চব্বিশ অবতারের কথা বলার পরে, ব্যাসদেব শ্রীহরির অসংখ্য বার অবতীর্ণ হবার কথা তো বলেছেন? বৈষ্ণব-শাস্ত্রগ্রন্থেও মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে।..." ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে মথুরামোহন চুপ করে রইলেন।

*   *   *

কয়েক মাস ধরে ঠাকুরের অসহ্য গাত্রদাহ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গঙ্গার জলে সর্বাঙ্গ ডুবিয়ে, মাথায় ভিজে গামছা চাপা দিয়ে পড়ে থেকেও গাত্রদাহের কিঞ্চিন্মাত্র উপশম হয় না। কত কবিরাজী চিকিৎসা হল, অথচ গাত্রদাহের বিরাম নেই। ব্রাহ্মণী সব শুনে বললেন—"এ তো অসুখ নয়! ভগবদ্দর্শনের জন্য অতি তীব্র ব্যাকুলতার ফলেই সর্বাঙ্গে এ দাহ। শ্রীমতীর এমনধারা হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে। চৈতন্যদেবের জীবনেও এ অবস্থা হয়েছে। এ দাহ-উপশমের ঔষধ অতি অপূর্ব। সর্বাঙ্গে সুগন্ধি চন্দনলেপন করে, সুরভি ফুলের মালাধারণ করলেই এ দাহ প্রশমিত হবে।"

এ বিধান শুনে মথুরবাবু প্রভৃতি সকলেই কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। পরে ব্রাহ্মণীর বিশেষ আগ্রহে শ্রীঠাকুরের সর্বাঙ্গ চন্দনলিপ্ত ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত হল। তিন দিন মাত্র ব্যবহারের পরেই সম্পূর্ণ সেরে গেল ঐ অসহ্য গাত্রদাহ। সকলেই

হতবাক্, বিস্মিত। এতে ভৈরবীর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে কে বাস করছেন, তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝলেন। জোর গলায় বলতে লাগলেন— ইনি নরদেহে স্বয়ং ভগবান।

এর কিছু দিন পরে শ্রীঠাকুরের শরীরে দেখা দিল আর এক উৎকট উপসর্গ। বৃকোদরের ক্ষুধার মত সর্বভুক্ ক্ষুধা। এ ব্যাধিরও চিকিৎসা করলেন ভৈরবী। এও যোগজ ক্ষুধা। শাস্ত্র মিলিয়ে দেখলেন, পেলেন ক্ষুধা-উপশমের সমাধান। ঠাকুর এক সময়ে বলেছিলেন—"ঐ সময় একটা বিপরীত ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল। যতই কেন খাইনা পেট কিছুতেই যেন ভরৃত না। এই খেয়ে উঠলুম, আবার তখনই মনে হত—কিছু খাই। দিন-রাত্তির কেবল 'খাই খাই' ইচ্ছা; তার আর বিরাম নেই। ভাবলুম—এ আবার কি ব্যারাম হল! বামনীকে বল্লুম। সে বললে—'বাবা, ভয় নেই। ঈশ্বরপথের পথিকদের ওরকম অবস্থা কখন কখন হয়ে থাকে, শাস্ত্রে ওকথা আছে। আমি ওটা ভাল করে দিচ্ছি।' ব্রাহ্মণী মথুরকে বলে ঘরের ভিতর চিঁড়ে মুড়কি থেকে সন্দেশ রসগোল্লা লুচি অবধি যত রকম খাবার আছে, সব থরে থরে সাজিয়ে রাখলে। আর বললে—'বাবা, তুমি এই ঘরে দিন-রাত্তির থাক, আর যখন যা ইচ্ছে হবে তখনই তা খাও।' সেই ঘরে থাকি, বেড়াই, সে-সব খাবার দেখি, নাড়াচাড়া করি। কখনো এটা থেকে কিছু খাই, কখনো ওটা থেকে কিছু খাই। এই রকমে তিন দিন কেটে যাবার পর সে বিপরীত ক্ষুধা ও খাবার ইচ্ছাটা চলে গেলে, তবে বাঁচি।"

ক্রমেই ব্রাহ্মণী জেদ করতে লাগলেন, আবার ঘোষণা করলেন—"রামকৃষ্ণ অবতার। এ আমার গায়ের জোরের কথা

নয়, শাস্ত্র এর প্রমাণ। শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করব। এ মহাভাব আধিকারিক পুরুষ ছাড়া কারো হয় না— হতে পারে না। শক্তি থাকে তো কেউ আমার কথা খণ্ডন করুক।”

মথুরবাবুর মনের ভিতর নানা তোলপাড় করছে। ভাবলেন— ভৈরবী যা এতদিন থেকে বলছেন—তার একটা হেস্তনেস্ত করা যাক্। বৈষ্ণবচরণ মহাপণ্ডিত ও উচ্চাঙ্গের সাধক। মথুরবাবু তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। আরো অনেক ভক্ত-সাধক ও পণ্ডিতের সমাগম হল। কালীবাড়িতে সভা বসল। ঠাকুরের সম্বন্ধে যা শুনেছেন এবং স্বচক্ষে যা দেখেছেন সব বলতে লাগলেন ব্রাহ্মণী। শাস্ত্র উদ্ধৃত করে প্রমাণ দেখালেন। তুমুল আলোচনা চলেছে। অথচ যাঁকে নিয়ে এত সব কাণ্ড তিনি আপনভাবে বিভোর হয়ে নির্বিকার চিত্তে নির্লিপ্ত বালকের মত বসে আছেন। আত্মদৃষ্টির সৌম্যকান্তি নেমে এসেছে তাঁর মুখমণ্ডলে। আবার কখনো বেটুয়া থেকে ডুটি মৌরি বা কাবাবচিনি মুখে দিচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবচরণ বললেন—“এঁর শরীরে মহাভাবের লক্ষণ সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ‘মহাভাব’ সাধারণ জীবের হতে পারে না। কেবল-মাত্র ভাবময়ী শ্রীরাধিকা ও ভগবান শ্রীচৈতন্যের জীবনেই এ পর্যন্ত ‘মহাভাবের’ বিকাশ দেখা গিয়েছে।” শুনে সকলে তো অবাক্। আর ঠাকুর! তিনি মথুরবাবুকে বলছেন—“ওগো, বলে কি? যা হোক বাপু, রোগ নয় শুনে মনটায় আনন্দ হচ্ছে।…”

কিছুদিন পরে আবার বসল আরো বিরাট এক সভা। বৈষ্ণব-চরণ, ডাকসাইটে ও বিখ্যাত তান্ত্রিক-সাধক গৌরীপণ্ডিত এবং

আরো অনেক পণ্ডিতের সমাগম হয়েছে। অনেক শাস্ত্রীয় আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর, সব তর্কের সমাধান করে গৌরীপণ্ডিত দৃপ্তকণ্ঠে ঠাকুরকে সম্বোধন করে বললেন—"বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে? এতো অতি সাধারণ কথা! আমার ধারণা—যাঁর অংশ হতে যুগে যুগে অবতারগণ লোক-কল্যাণসাধনে জগতে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন এবং যাঁর শক্তিতে তাঁরা ঐ কার্য সাধন করেন—আপনি তিনি-ই।" ঠাকুর শিশুর হাসি হেসে বললেন—"ও বাবা! তুমি যে দেখছি তাকেও ছাড়িয়ে যাও। কেন বল দেখি? এতে কি দেখেছ বল দেখি?" গৌরী বললেন—"শাস্ত্রপ্রমাণ এবং নিজ অনুভব হতেই বলছি। এ-বিষয়ে যদি কেউ বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করে আমার সঙ্গে বাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহলে আমি আমার পক্ষসমর্থনে প্রস্তুত আছি।"

ভাবাবিষ্ট ঠাকুর বললেন—"তোমরা সব কত কথা বল, কিন্তু কে জানে, বাপু, আমি তো কিছু জানি নে।"... এবার যে ছদ্মবেশে আসা!

জীবকোটীর সাধন সিদ্ধিলাভের জন্য। ঈশ্বরকোটী নিত্যসিদ্ধ, তাঁদের সিদ্ধি আগে, সাধন পরে এবং তাও লোকশিক্ষার জন্য। তাঁরা আজন্ম সিদ্ধ। ঠাকুর বলতেন—"কোন কোন ফলের ফল আগে আসে, ফুল পরে।"

এতদিন শ্রীঠাকুর 'নিজ অন্তঃপুরে' খুঁজেই পেয়েছিলেন সব কিছু—জগদম্বার ওতপ্রোতভাবে দর্শন, ভাব, সমাধি, মহাভাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কালী—এঁদের সব তিনি দর্শন করেছেন। একমাত্র নিজ 'মন-গুরু'র সাহায্যে তিনি পৌঁছেছিলেন সকল উপলব্ধির চরমে। শাস্ত্র-অনুগামী সাধনমার্গের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করা এখনও বাকী আছে, তাই বোধ হয় জগন্মাতার ইঙ্গিতে বহুশাস্ত্র-পারদর্শিনী প্রবীণা সাধিকা যোগমায়ার অংশসম্ভূতা যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর দক্ষিণেশ্বরে গুরুরূপে আগমন।

শ্রীঠাকুরকে ব্রাহ্মণী বললেন—"বাবা, তোমাকে যথাশাস্ত্র তন্ত্রমতে সাধন করাব।" মন্দিরের মাকে জিজ্ঞাসা না করে 'মায়ের শিশু' কোন কাজই করেন না। মায়ের অনুমতি পেয়ে ব্রাহ্মণীর নির্দেশ মত তিনি তন্ত্রসাধনায় মগ্ন হলেন। সাধনের সব উপচার ভৈরবী নিজে আহরণ করে আনতেন। সব আয়োজনও করে দিতেন তিনিই। যথাশাস্ত্র মুণ্ডাসন স্থাপিত হল পঞ্চবটীতে ও বিল্বমূলে। ঐ সাধনায় শ্রীঠাকুর এত তন্ময় হয়ে গেলেন যে, মাসের পর মাস দিনরাতের হুঁশ ছিল না। কত দর্শনের পর দর্শন, অনুভূতির

পর অনুভূতি, সিদ্ধির পর সিদ্ধিতে যে তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলেন, তার সংখ্যা-সীমা নেই। এইভাবে বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সব সাধনে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন। ভৈরবী তো অবাক্। অধিকাংশ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে শ্রীঠাকুরের তিন দিনের বেশী সময় লাগে নি। তন্ত্রের সকল সাধনার পরিসমাপ্তিতে আনন্দপুলকিত চিত্তে ভৈরবী বললেন—"বাবা, এবার তুমি দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে।"

ঐকালে দশভুজা হতে দ্বিভুজা পর্যন্ত কত বিভিন্ন দেবীমূর্তি যে তিনি দর্শন করেছিলেন তার 'ইতি' হয় না। তাঁদের কী অনুপম রূপলাবণ্য! আবার কোন কোন দেবীমূর্তি তাঁকে নানাভাবে উপদেশ দিতেন। শ্রীঠাকুর বলেছিলেন—"ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্তির অঙ্গ হতে সৌন্দর্য যেন চারিদিকে গলে ছড়িয়ে পড়ছিল দেখেছিলাম।"... তা ছাড়া ভৈরবাদি অনেক দেবমূর্তির দর্শনও তিনি ঐ সময় পেয়েছিলেন; আর দিব্যশক্তিপ্রভাবে জানতে পেরেছিলেন যে, উত্তরকালে বহু লোক তাঁর নিকট ধর্মলাভের জন্য সমবেত হবে।

তন্ত্রসাধনার পরিসমাপ্তির পরে কয়েক বৎসর পর্যন্ত শ্রীঠাকুরের শরীরের কান্তি বেড়ে দেহ যেন জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছিল। যে দেখত সেই অবাক্ বিস্ময়ে হা করে চেয়ে থাকত তাঁর দিকে। মানুষের শরীরে তো অমন কান্তি হয় না! তিনি তখন জগন্মাতার কাছে কাতরপ্রাণে প্রার্থনা করতেন—"মা, আমার এ বাহ্যরূপে কী হবে? এ রূপ তুই ফিরিয়ে নে।" তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ হয়ে তিনি সর্বভূতে জগন্মাতাকেই দর্শন করতে লাগলেন। সবই মায়ের প্রকাশ—মায়ের রূপ।...

*　　*　　*

৺চণ্ডীতে আছে—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।' যিনি সর্বভূতে চিন্ময়রূপে, তিনিই আবার মাতৃরূপে। শ্রীঠাকুরের তন্ত্রসাধনার পরে তাঁর গর্ভধারিণী-মা দেবী চন্দ্রমণি দক্ষিণেশ্বরে এলেন (১৮৬৫ সালে)। শ্রীঠাকুর সকালে উঠে আগে গর্ভধারিণী মায়ের পাদবন্দনা করেন। তারপরে যান মন্দিরে। 'মাতৃদেবো ভব।' চন্দ্রমণিও দেবী। তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। পাছে মায়ের মনে আঘাত লাগে সেজন্য তিনি গোপনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে থাকতে পারলেন না— মায়ের চোখের জল পড়বে এই ভেবে। এখানে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে পাই আদর্শ মানবরূপে। জাগতিক দায়িত্বজ্ঞান ও দ্রবীভূত স্নেহ-মমতার এতটুকু কমতি কোথাও নেই। মোহাতীত বিজ্ঞানীর অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়েও, মায়ের মৃত্যুতে অবাধ অশ্রু তাঁর দু'গণ্ড প্লাবিত করে ঝরে পড়ল। তিনি যথাশাস্ত্র সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। পিতৃকর্মাদিতে সন্ন্যাসীর অধিকার নেই। তাই গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে অশ্রুজলে তর্পণ করে পুত্রের কর্তব্য সমাপ্ত করলেন।

আদর্শ রমণী ছিলেন চন্দ্রমণি। সারাটি জীবন দেব-দ্বিজ-আর্ত-সেবায় কাটিয়ে শেষের দিনে এলেন গঙ্গাতীরে— গঙ্গা ও গদাধরের কাছে। প্রায় দ্বাদশ বৎসর গঙ্গাতীরে বাস করে তিনি দেবীলোকে চলে গেলেন (২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬)।

শ্রীঠাকুরের মা সরলতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। ভগবানকে ছাড়া কিছুই চান না ; জাগতিক কোন বৈভবে তাঁর এতটুকু আকর্ষণ নেই। মথুরবাবু ঠাকুরকে বাবা বলতেন। শ্রীঠাকুরের মা যখন

দক্ষিণেশ্বরে এলেন, তাঁকে ডাকতেন 'ঠাকুর-মা'। মথুর তাঁর 'বাবাকে' কোন জিনিস দিতে পারেন নি! একবার একটি তালুক লেখাপড়া করে দিতে চেয়েছিলেন—তাতে লাঠির তাড়া খেতে হয়েছিল। তাই বড় খেদ ছিল তাঁর মনে। মথুরবাবু একদিন ঠাকুর-মাকে বললেন—"তুমি যদি আমায় পর মনে না কর তো, আমার কাছ থেকে তোমার যা ইচ্ছা তা চেয়ে নাও।" বৃদ্ধা আকাশ-পাতাল ভেবে কোন জিনিসের অভাব খুঁজে পেলেন না। হঠাৎ মনে পড়ল—তাঁর গুল্ ফুরিয়ে এসেছে। তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন,—"এতক্ষণে মনে পড়েছে। যদি নেহাত দেবে তো গুলের দোক্তাতামাক এক আনার কিনে দিও।" শুনে মথুরের চোখে এল অশ্রুপ্লাবন। আবেগভরে ঠাকুর-মাকে প্রণাম করে ভাবলেন—"এমন মা না হলে কি অমন ত্যাগী ছেলে হয়?"···

* * *

শাক্ত-তন্ত্রোল্লিখিত সাধনসকলে সিদ্ধিলাভ করার পর শ্রীঠাকুর বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবের সাধনে ব্রতী হলেন। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে জটাধারী নামক জনৈক সিদ্ধ রামাইত-সাধু দক্ষিণেশ্বরে আসেন। শ্রীঠাকুর ঐ সাধুর নিকট রামমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে বাৎসল্যভাবের সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। ঐ জটাধারীর সঙ্গে অষ্টধাতুনির্মিত বালক-রামচন্দ্রের একটি ছোট বিগ্রহ ছিল। নাম রামলালা। কিন্তু অলৌকিক প্রেম-ভক্তিতে জটাধারীর কাছে ঐ বিগ্রহ তাঁর ইষ্টদেব রামচন্দ্রের ভাবঘনমূর্তি। সেজন্য তিনি ঐ বিগ্রহের সেবা-পূজাদিতেই তন্ময় হয়ে ঐশী ভাবের দিব্যানন্দে ভরপুর থাকতেন। তাঁর দিব্য দর্শন হত যে, তাঁর রামলালা চিন্ময়রূপ ধরে

খেলা করে বেড়াচ্ছে— নানাভাবে দর্শন দিচ্ছে, চিরসঙ্গিরূপে সর্বক্ষণ রয়েছে।

জটাধারীর নিকট বাৎসল্যভাবের সাধনে দীক্ষিত হবার পর হতে শ্রীঠাকুরও ডুবে গেলেন ঐ ভাবে। তিনি জটাধারীর কাছে চুপটি করে বসে থাকেন— তন্ময় হয়ে দেখেন রামলালার দিব্য খেলা, দিব্য লীলা। ক্রমে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। রামলালা আর জটাধারীর কাছে থাকতে চাচ্ছে না। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের খুব নেওটা হয়ে উঠল। তিনি যখনই জটাধারীর কাছ থেকে চলে আসবার জন্য পা বাড়ান— রামলালাও তাঁর সঙ্গ নেয়। বারণ করলেও শুনে না। সঙ্গে সঙ্গে আসে নাচতে নাচতে। কখনো বা কোলে উঠবার আবদার ধরে।

শ্রীঠাকুর বলেছিলেন—"একদিন নাইতে যাচ্ছি, রামলালা বায়না ধরলে— সেও যাবে। কি করি, নিয়ে গেলুম। তারপর জল থেকে আর কিছুতেই উঠবে না। যত বলি কিছুতেই শোনে না! শেষে রাগ করে জলে চুবিয়ে ধরে বল্লুম— তবে নে, কত জল ঘাঁটতে চাস ঘাঁট। আর সত্যসত্যই দেখলুম— সে জলের ভিতর হাঁপিয়ে শিউরে উঠল! তখন আবার তার কষ্ট দেখে—কি কল্লুম বলে, কোলে করে জল থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসি।"

আরো কত দিব্যলীলা চলেছিল! ক্রমে রামলালা সর্বক্ষণ শ্রীঠাকুরের কাছেই থাকতে লাগল। জটাধারীর কাছে আর যাবার নামটিও নেই। এদিকে বৃদ্ধ সাধু রান্না করে বসে আছে, কিন্তু রামলালা কোথায়? খুঁজতে বেরিয়ে দেখেন যে, রামলালা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরে দিব্যি খেলা করছে; তখন জোর করে নিয়ে

খান রামলালাকে। এইভাবে রামলালার সঙ্গে দিব্য লীলাখেলা চলেছিল অনেক দিন।

তারপর একদিন জটাধারী এসে সজলনয়নে শ্রীঠাকুরকে বললেন —"রামলালা আমায় কৃপা করে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছে। যেমনটি দেখতে চাইতাম, তেমনি ভাবে দর্শন দিয়ে বলেছে— তোমাকে ছেড়ে সে কিছুতেই যাবে না। তোমার কাছে সে সুখে আছে এই ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে।" এই বলে রামলালাকে শ্রীঠাকুরের হাতে দিয়ে বাবাজী বিদায় নিলেন। সেই অবধি রামলালা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছেই রইল।···

সাধারণের চোখে রামলালা একটি ছোট্ট ধাতবমূর্তি। কিন্তু শ্রীঠাকুরের কাছে দিব্যলীলাময় চিন্ময় বাল-ভগবান। ভবতারিণীর মৃন্ময় মূর্তি যেমনি করে চিন্ময়ী হয়েছিলেন— লীলাময়ী হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে লীলাখেলা করেছিলেন, তেমনি ভাবে রামচন্দ্রের এই ক্ষুদ্র প্রতীকটিও বালক রামচন্দ্ররূপে চিন্ময়রূপ ধরে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন।

এ দর্শন চর্মচক্ষের দর্শন নয়—ভাবময় চক্ষের দর্শন, দিব্যচক্ষুর দর্শন। ভাবচক্ষু ছাড়া চিন্ময়রূপদর্শন হয় না। অমন যে অর্জুন— শ্রীকৃষ্ণের সখা, তাঁরো দিব্যচক্ষুর প্রয়োজন হয়েছিল ভগবানের আসল রূপটি দেখবার জন্য। এ ভাব অসাধারণ জিনিস, আরো অসাধারণ মহাভাব। শ্রীঠাকুর বলেছিলেন— 'পূজার চাইতে জপ বড়, জপের চাইতে ধ্যান; ধ্যানের চাইতে ভাব বড়, ভাবের চাইতে বড় মহাভাব।'— 'মহতো মহীয়ানের' ভাব বলেই মহাভাব। এই মহাভাব সর্বভাবের সমাবেশ ও সম্পূর্তি।

প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর মহাভাবময়। মহাভাব আর প্রেম একই জিনিস। আর 'স ঈশ অনির্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ।'

* * *

বাৎসল্যভাবসাধনার সময় শ্রীঠাকুর নিজেকে ভাবতেন মা কৌশল্যা। নিজের উপর কায়মনোবাক্যে নারীভাব— মায়ের ভাব আরোপ করেছিলেন'। বাৎসল্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে শ্রীঠাকুরের মনে মধুরভাবে সাধন করার ইচ্ছা বলবতী হল।

বৈষ্ণবশাস্ত্র মধুরভাবকে শান্তাদি ভাবপঞ্চকের সার বা পরিপূর্তি বলে বর্ণনা করছে। আবার একমাত্র মধুরভাবেই শান্তাদি সকল ভাবের সমাবেশ। মধুরভাবে সাধনকালে তিনি স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। ঠাকুরের চিহ্নিত সেবক মথুরবাবু বহুমূল্য বারাণসী-শাড়ী, ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি, নানা রকমের সোনার গহনা প্রভৃতি এনে দিলেন। ঐ বেশে অতি নিকট আত্মীয় হৃদয়রামও শ্রীঠাকুরকে স্ত্রীলোক বলে ভ্রম করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে জন্ম হতে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনাই ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য। সেজন্য তিনি প্রত্যেক ভাবে সাধনের সময় শাস্ত্রোক্ত 'লিঙ্গ' বা চিহ্ন ধারণ করে সাধন করেছিলেন। তন্ত্রসাধনসময়ে রক্তবস্ত্র, সিন্দুর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করতেন। বৈষ্ণবতন্ত্র সাধনকালেও তিনি আচার্যপ্রবর্তিত ভেক, যথা— শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দন ও তুলসীমালা প্রভৃতি নিয়েছিলেন বলে শুনা যায়। আবার অদ্বৈতভাবে সাধনকালে তিনি শিখাসূত্র ত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসের পূর্ণাঙ্গ চিহ্ন— কাষায়বস্ত্র ধারণ করেন। সবটাতেই দিয়েছেন দীর্ঘকালবিস্মৃত শাস্ত্রের যথার্থ মর্যাদা।...

এখন হতে শ্রীঠাকুর শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের জন্য দিনের দিন ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তাঁর প্রার্থনা ও আকুল ক্রন্দনে দিক পরিপূরিত হয়ে গেল। কৃষ্ণবিরহ তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ এতটা অধিকার করেছিল যে, দিন পক্ষ মাস চলে যাচ্ছে—তিনি আহারনিদ্রা পরিত্যাগ করে, অস্থির প্রাণে কেবল বিলাপ করছেন। প্রাণের নিদারুণ দহনে পুনরায় দেখা দিল গাত্রদাহ। ঐ সময়কার বিরহের প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণবিরহের প্রাবল্যে ঐ কালে তাঁর শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়ে সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত হত। দেহের গ্রন্থিসকল শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং হৃদয়ের তীব্র যন্ত্রণায় তিনি মৃতের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে থাকতেন।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ অসম্ভব। সেজন্য শ্রীঠাকুর এখন একান্তমনে ডুবে গেলেন শ্রীমতীর ধ্যানে। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই রাধারাণী তাঁকে দর্শন দিলেন। শুধু দর্শন নয়, সর্বমাধুর্যময়ী শ্রীমতী তাঁর শ্রীঅঙ্গে মিশে গেলেন। পরে সে দর্শন সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন—"শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বহারা, সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুষ্পের কেশরের ন্যায় গৌরবর্ণ ছিল।"

তাঁর অঙ্গে শ্রীমতী প্রবেশ করার পর শ্রীঠাকুর নিজেকে শ্রীরাধিকা বলে নিরন্তর উপলব্ধি করতেন এবং মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাপ্রসূত মহাভাবের আতিশয্য তাঁর ভিতর দেখা দিল। শ্রীমতীর অপরূপ রূপ ফুটে উঠল তাঁর শ্রীঅঙ্গে। তাঁর শরীরটিও যেন হয়ে গেল

স্ত্রীশরীর—সর্বাংশে পূর্ণাঙ্গ শ্রীমতী—ভাবে, মহাভাবে, কৃষ্ণপ্রেমে, দেহের রূপে, গুণে। এর অল্পকাল পরেই তিনি পেলেন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন। দিব্যমূর্তি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে প্রবেশ করল। ঐ দর্শনের আনন্দে তিনি অনেক দিন বিভোর হয়ে ছিলেন। কখনো আব্রহ্ম-স্তম্ব সর্বত্র কৃষ্ণের দর্শন হত, আবার কখনো অনুভব করতেন —তিনিই কৃষ্ণ। আত্মবিভূতির সর্ববৈভবময় শ্রীঠাকুরের তখনকার উপশান্ত ও আনন্দময় জীবন মহাভাবে পরিপূর্ণ ছিল। সে ভাবাবেশে তিনি অনুক্ষণ ডুবে থাকতেন। শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণের মিলন-রাস-উৎসব চলেছিল তাঁর ভিতর। একরস অনির্বচনীয় আনন্দ!

এর অনেক বৎসর পরে যখন ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হয়েছেন, তখন একদিন শ্রীঠাকুর বাগান হতে একটি ঘাসফুল তুলে এনে হর্ষোৎফুল্ল বদনে সকলকে দেখিয়ে বলেছিলেন—"তখন তখন (মধুরভাব-সাধনকালে) যে কৃষ্ণমূর্তি দেখতাম, তাঁর অঙ্গের এই রকম রং ছিল।"

ঐ সময়ের আর একটি দর্শনের কথাও তিনি ভক্তদের নিকট বর্ণন করেন—"একদিন বিষ্ণুমন্দিরের সামনের দালানে বসে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ শুনছিলাম। শুনতে শুনতে ভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় দর্শন হল। পরে দেখলাম, ঐ মূর্তির পাদপদ্ম হতে দড়ার মত একটি জ্যোতি নির্গত হয়ে প্রথমে ভাগবত স্পর্শ করল, পরে (নিজের বুক দেখিয়ে) আমার বুকের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে রইল।" ভগবান, ভাগবত, ভক্ত—তিন-ই সঙ্গত হল শ্রীঠাকুরের ভিতর। তিন-ই এক।

১১

সকল প্রকার দ্বৈতভাবসাধনার চরম সিদ্ধিতে উপনীত হবার পরে শ্রীঠাকুরের মনে ভাবাতীত অদ্বৈতসাধনার ইচ্ছা বলবতী হয়। তাঁর চিরশুদ্ধ মনে যখনই যে বাসনার উদয় হত, জগন্মাতা অবিলম্বে তা পূর্ণ করে দিতেন। বেদান্তসাধনের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে অভাবনীয় উপায়ে জটাজুটধারী ব্রহ্মদর্শী উলঙ্গ পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। নর্মদাতীরে ও অন্যান্য স্থানে সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধন করে নির্বিকল্প-সমাধিযোগে তিনি ব্রহ্মোপলব্ধি করেছিলেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞ তোতা তীর্থভ্রমণ করতে করতে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তাঁদের প্রথম মিলন গঙ্গাতীরে—কালীমন্দিরের ঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনীতে। শ্রীঠাকুর আনমনে বসেছিলেন। তাঁর তপোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাতেই তোতা চিনতে পারলেন। স্তম্ভিত হয়ে ভাবলেন—এ তো অসাধারণ পুরুষ—বেদান্তসাধনার উপযুক্ত অধিকারী। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তোতাই শ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি বেদান্তসাধনা করবে?"

প্রশ্ন শুনে শ্রীঠাকুরের যেন চমক ভাঙ্গল। তিনি একবার ভাল করে দেখলেন সেই সৌম্যকে। তারপর বললেন—"আমি তো ও সব কিছু জানি নে! আমার মা জানেন। তিনি বলেন তো করব।"

"আচ্ছা তবে যাও। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করে এস।"—

বললেন তোতাপুরী। শ্রীঠাকুর ধীরে ধীরে মন্দিরে গিয়ে ভাবাবেশে মার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন—"যাও, বেদান্তসাধনা কর। তোমার জন্যই ঐ সন্ন্যাসীর এখানে আসা।" মায়ের আদেশ পেয়ে খুশী হয়ে তিনি এলেন তোতাপুরীর কাছে, এবং বললেন—"মায়ের প্রত্যাদেশ হয়েছে।" তোতাপুরী অদ্বৈতজ্ঞানী—তাঁর কাছে দেবীপূজা, ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তির উপাসনা প্রভৃতি সবই মায়ার এলাকার মধ্যে—অজ্ঞানপ্রসূত! মন্দিরের মা'র আদেশ নিয়ে এসেছে দেখেই তোতা বুঝলেন—লোকটি শক্তিসাধক। যাই হোক, তোতা বললেন যে বেদান্তসাধনে প্রবৃত্ত হবার পূর্বে তাঁকে নিজের শ্রাদ্ধাদি সমাপনান্তে বিরজাহোমাগ্নিতে শিখাসূত্র আহুতি দিয়ে যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করতে হবে। শ্রীঠাকুর একটু ইতস্তত: করে বললেন—"এসব গোপনে করলে যদি চলে তো সন্ন্যাস নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। প্রায় এক বৎসর হল আমার শোকসন্তপ্তা গর্ভধারিণী-মা এসেছেন এখানে। আমি সন্ন্যাসী হয়ে গেছি জানতে পারলে, তাঁর প্রাণে বড় আঘাত লাগবে। তাঁর প্রাণে আমি কষ্ট দিতে চাই নে।"

তোতাপুরী তাতেই রাজী হলেন। তিনি গোপনেই সন্ন্যাস দেবেন শ্রীরামকৃষ্ণকে এবং শুভদিনের প্রতীক্ষায় পঞ্চবটীতলে নিজের আসন লাগালেন।

শুভদিনে পুণ্য ব্রাহ্মমুহূর্তে তোতাপুরী শিষ্যকে সঙ্গে করে পঞ্চবটীর নিকটস্থ কুটীরে প্রবেশ করলেন। হোমের সব আয়োজন প্রস্তুত ছিল। যথাবিধি হোমাগ্নি প্রজ্বালিত হল। তোতাপুরী মন্ত্রপাঠ করে শিষ্যের দ্বারা ঐ হোমানলে আহুতিপ্রদানানন্তর

বিরজাহোম সমাপন করলেন, এবং শিষ্য শিখাসূত্র আহুতি দিয়ে গুরুপ্রদত্ত দণ্ড, কৌপীন ও বহির্বাসে ভূষিত হল।

অতঃপর আরম্ভ হল— ব্রহ্মোপদেশ। ব্রহ্মজ্ঞ তোতা শিষ্যকে মহাবাক্য উপদেশ করে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হতে বললেন। সমাধিনিষ্ঠ তোতা শিষ্যকে অবিলম্বে অদ্বৈতভাবের চরম অনুভূতি— নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় করাবার জন্য বদ্ধপরিকর। পরবর্তী কালে শ্রীঠাকুর নিজেই বলেছেন— "(সন্ন্যাস)-দীক্ষাপ্রদানানন্তর ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ দিয়ে, মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যেতে বললে। আমার কিন্তু এমনই হল যে, ধ্যানে বসে চেষ্টা করেও মনকে নামরূপের গণ্ডীর পরপারে নিয়ে যেতে পারলুম না। অন্য সব বিষয় থেকে মন অতি সহজেই গুটিয়ে আসতে লাগল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে জগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্ঘনমূর্তি জীবন্তরূপে দেখা দিয়ে, নামরূপত্যাগের কথা এককালে ভুলিয়ে দিতে লাগল। সিদ্ধান্তবাক্যসকল শুনে ধ্যানে বসে বারংবার যখন এরূপ হতে লাগল, তখন নির্বিকল্প সমাধি সম্বন্ধে একপ্রকার নিরাশ হলাম। চোখ মেলে ন্যাংটাকে বললাম— "হল না। মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করে আত্মধ্যানে মগ্ন হতে পারলুম না।" শুনে ন্যাংটা বিষম উত্তেজিত হয়ে তিরস্কার করে বলল— "কেঁও নহি হোগা?"— বলেই কুটীরমধ্যে চারিদিকে দেখে এক টুকরা কাঁচ কুড়িয়ে আনল, আর সূচের মত তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করে বলল— "এই বিন্দুতে মনকে গুটিয়ে আন।" তখন পুনরায় দৃঢ়সঙ্কল্প করে ধ্যানে বসলাম। জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হওয়া

মাত্র, জ্ঞানকে অসি কল্পনা করে, জ্ঞান-অসি দ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দু'খণ্ড করে ফেললাম। তখন মনে আর কোন-রূপ বিকল্প রইল না। সমস্ত নামরূপের রাজ্য ছাড়িয়ে মন একেবারে হুহু করে উপরে উঠে গেল এবং সমাধিতে মগ্ন হয়ে গেলাম।"

শ্রীঠাকুর নির্বিকল্প সমাধির অতল গভীরতায় ডুবে গেলেন। তোতা অনেকক্ষণ বসে বসে দেখলেন শিষ্যকে। পরে নিঃশব্দে বাইরে এসে কুটীরের দ্বার বন্ধ করে পঞ্চবটীতে নিজের আসনে বসলেন— ভিতর থেকে সাড়া দিলেই দরজা খুলে দেবেন।

সেদিন গেল, রাত এল। পরের দিনরাতও কেটে গেল। এ ভাবে অতীত হয়ে গেল তিন দিন, তিন রাত। তথাপি ভিতর থেকে দরজা খুলে দেবার ডাক এল না। বিচলিত হলেন ন্যাংটা। নিজের আসন ছেড়ে শিষ্যের অবস্থা দেখবার জন্য দরজা খুললেন। অবাক্ বিস্ময়ে দেখলেন— যেমনটি বসিয়ে গিয়েছিলেন, শিষ্য ঠিক সেভাবেই বসে আছে। দেহে প্রাণের প্রকাশ নেই, হৃদয়ের স্পন্দন স্তব্ধ; কিন্তু বদনমণ্ডল প্রশান্ত, গম্ভীর ও জ্যোতিপূর্ণ। শিষ্য বসে আছে দীপ্ত শিলামূর্তির মত। বুঝলেন, শিষ্যের চিত্ত এখনো সচ্চিদানন্দে লীন হয়ে আছে।

তোতা যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না। এও কি সম্ভব! যে নির্বিকল্প-সমাধিলাভ করতে তিনি চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনা করেছিলেন, শিষ্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হল!... ন্যাংটা শিষ্যকে পুনরায় পরীক্ষা করতে লাগলেন। সব লক্ষণ দেখছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দেখলেন, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ— হৃদয়ের

স্পন্দনও স্তব্ধ। শিষ্যের শরীরে বার বার হাত দিয়ে দেখেছেন—চেতনার কোনপ্রকার লক্ষণ নেই। অথচ মুখমণ্ডলে দিব্যানন্দের প্রশান্তি। সর্বাঙ্গ যেন জ্যোতির্ময়। আনন্দে, বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন তোতা—"য়হ ক্যা দৈবী মায়া!" সত্যই তো নির্বিকল্প সমাধি!

অনন্তর ন্যাংটা শিষ্যকে সমাধি হতে ব্যুত্থিত করবার প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলেন। গম্ভীর স্বরে 'হরি ওম্' মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। বহুক্ষণ 'হরি ওম্' ধ্বনি করতে করতে ক্রমে শ্রীঠাকুরের মন সহজাবস্থায় নেমে এল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করলেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তোতা। বুঝলেন, শিষ্য অমানব মানব। তোতাপুরী পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। তিন দিনের বেশী একস্থানে কখনো থাকেন না। কিন্তু কি এক দিব্য আকর্ষণে তিনি রয়ে গেলেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস করে এগারটি মাস দক্ষিণেশ্বরে। ঐ কালে তাঁর একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল— শিষ্যকে অখণ্ড ব্রহ্মানন্দে, নির্বিকল্প ভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা। সাধনের পর সাধন চলতে লাগল। অনুভূতির পর অনুভূতি। বেদান্ত-বিচার আর সেই সাধনা।

শ্রীঠাকুরের দিব্যসঙ্গে তোতাপুরী এতই আনন্দে ছিলেন যে, যাবার কথা যেন ভুলে গেলেন। এই দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে, তোতার বেদান্তময় জীবনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ভাবের প্রভাব পড়েছিল প্রচুর। আর পরাপ্রজ্ঞ তোতাপুরী বুঝেছিলেন যে, শিষ্যের অদ্বৈতসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি উপলক্ষ মাত্র।

একদিনের একটি ছোট ঘটনা ন্যাংটার প্রজ্ঞাঘন মনে সুগভীর ছাপ দিয়েছিল।

শ্রীঠাকুর একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— "তোমার তো ব্রহ্মলাভ হয়েছে, সিদ্ধ হয়েছ। তবে কেন নিত্য ধ্যানাভ্যাস কর?" ন্যাংটা অতি ধীরভাবে তাঁর পরিচ্ছন্ন লোটাটি দেখিয়ে বললেন— "দেখেছ, কেমন উজ্জ্বল? আর যদি নিত্য না মাজা হয়, মলিন হয়ে যাবে না? মনও তেমনি, জানবে। ধ্যানাভ্যাস দ্বারা মনকেও এভাবে নিত্য মেজেঘসে না রাখলে মলিন হয়ে পড়ে।" গুরুর মুখের দিকে তাকিয়ে স্মিত মৃদুকণ্ঠে শ্রীঠাকুর বললেন— "কিন্তু যদি সোনার লোটা হয়?" তোতা স্বীকার করলেন— সোনার লোটা হলে নিত্য মাজার প্রয়োজন নেই। আর বুঝলেন শিষ্যের ইঙ্গিত। শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণ সাধক নন। সাধনভজন দ্বারা তিনি সিদ্ধ হন নি। তিনি চিরশুদ্ধ, চিরসিদ্ধ।

আরো অনেক শিখেছিলেন তোতা শ্রীঠাকুরের চিরনির্মল পরিপূর্ণ জীবন দেখে। নির্বিকল্প সমাধির পরেও তোতার জীবনে যেটুকু অসমাপ্তি ছিল, তা যেন পূর্ণ হল শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসঙ্গে।

তোতাপুরী আবাল্য অদ্বৈতবাদী। একনিষ্ঠভাবে শুদ্ধ অদ্বৈতভাবের সাধনাই করেছেন। ব্রহ্মাতিরিক্ত সব কিছুই মায়ার এলাকায়। দ্বৈতভাবের স্থান নেই সেখানে, দেবদেবী নেই— সগুণ ঈশ্বরও নেই; এবং এক অদ্বৈতভাবেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কিন্তু সর্বভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সর্বভাবের সমন্বয় তাঁর জীবনে। অদ্বৈতভাবে নির্বিকল্প সমাধিতে

প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও অনেক সময় তিনি দ্বৈতভাবে থাকতেন, ভক্তি-ভক্তের ভাব আশ্রয় করে। আবাল্য অভ্যাসের অনুগামী তখনো তিনি সকাল সন্ধ্যায় করতালি দিয়ে করতেন হরিনাম, মায়ের নাম, বিভিন্ন দেবদেবীর নামগান। এক দিন শ্রীঠাকুর পঞ্চবটীতে ন্যাংটার কাছে বসে আছেন। নানা প্রসঙ্গ ও আলোচনা চলছে। এদিকে সন্ধ্যা সমাগতা দেখে শ্রীঠাকুর কথা বন্ধ করে হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করছেন। ন্যাংটা তো অবাক্! এ করছে কি? বিদ্রূপের সুরে বললেন—"আরে, কাঁ্যাও রোটি ঠোক্‌তে হো?" শ্রীঠাকুর ভাবস্থ হয়ে বালকের ন্যায় হাসতে লাগলেন, আর বললেন— হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করাকে বলছে— রোটি ঠোকা! তদ্দর্শনে তোতার প্রজ্ঞাচক্ষু যেন খুলে গেল। তিনি বুঝলেন।

দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরী সম্বন্ধে শেষের দিকের ঘটনা। ন্যাংটা শক্তি মানেন না। মানেন না শক্তির কৃপা ছাড়া যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভও অসম্ভব। ঐটুকু মানার তাঁর প্রয়োজন ছিল। অথবা তোতাকে নিমিত্ত করে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যে অভেদ— প্রতিষ্ঠিত হল এ সত্য।

ন্যাংটা হঠাৎ কঠিন রক্তামাশয়রোগে আক্রান্ত হলেন। সকল চিকিৎসা, নানা ঔষধ পথ্য সবই ব্যর্থ হল। রোগের উপশম কিছুতেই হচ্ছে না। গভীর রাত্রি ধুনির পাশে তিনি বসে আছেন। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা; ছট্‌ফট্‌ করছেন। তাই তোতা ভাবলেন— মনকে সমাহিত করে রাখি; দেহের কষ্ট দেহেতে পড়ে থাক। ধ্যানে বসলেন, কিন্তু মন সংহৃত করতে পারছেন না;

মন যেন পেটের যন্ত্রণার সঙ্গে জড়িত হয়ে থাকতে চায়। বারবার চেষ্টা করেও যখন বিফলমনোরথ হলেন, তখন তাঁর মনে অতি তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হল। —এ পাঞ্চভৌতিক দেহটার জন্য আমি কেন যন্ত্রণা ভুগি! এ দেহটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দেব। মনে এ ভাবনার উদয় হতেই তোতাপুরী দৃঢ়সঙ্কল্প করে ব্রহ্মধ্যানে আত্মস্থ হলেন। ধীরে ধীরে নামলেন গঙ্গাগর্ভে। ক্রমে হেঁটে অগ্রসর হচ্ছেন গভীর জলের দিকে। এগুচ্ছেন তো এগুচ্ছেন, কিন্তু গভীর জল আর পান না! ক্রমে পেরিয়ে এলেন পরপারে। তবু গঙ্গাতে হাঁটুজল। অবাক্ হয়ে গেলেন তোতাপুরী। এ ক্যা দৈবী মায়া! হঠাৎ তোতার হৃদয়কন্দর এক দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। তিনি স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন— জলে স্থলে সর্বত্র শক্তির স্পন্দন। চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে সেই মহাশক্তির নিঃশ্বাসে। যে ব্রহ্মকে তিনি এতকাল ধ্যানগম্য করে এসেছেন, সে ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। যা কিছু ক্রিয়া সবই শক্তির খেলা। তাঁরই ইঙ্গিতে জন্ম মৃত্যু, বন্ধন মুক্তি। শিব নির্গুণ ব্রহ্ম হয়ে পড়ে আছেন, আর শক্তি করছেন লীলাখেলা।

সঙ্গে সঙ্গে ন্যাংটা নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক বোধ করলেন। মন এক অব্যক্ত আনন্দে যেন দুলছে। তিনি ফিরে এলেন পঞ্চবটীতে। মন স্বতঃই লুটিয়ে পড়ল 'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা'— সেই দেবীর চরণে। শিবশক্তির একত্র মিলনদর্শনে তাঁর হৃদয় অপূর্ব আনন্দে উল্লসিত।

পরদিন ভোরবেলা শ্রীঠাকুর গিয়ে দেখেন যে, ন্যাংটা আর

এক মানুষ হয়ে গেছেন। আনন্দ উপছে পড়ছে সর্বাঙ্গে। নীরোগ শরীর, পুলকিত তাঁর মন। শ্রীঠাকুরের কাছে তিনি পূর্বরাত্রির সব ঘটনা আর দিব্য অনুভূতির কথা বিবৃত করলেন। সব শুনে শ্রীঠাকুর হেসে বললেন—"আগে যে মাকে ব মানতে না! আমার সঙ্গে 'শক্তি ঝুট্' বলে তর্ক করতে! এখন তো দেখলে, বুঝলে? আমায় 'মা' আগেই বুঝিয়েছেন—'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি আর দাহিকাশক্তি যেমন পৃথক নয়, ঠিক তেমনি।"

এর কয়েক দিন পরে মন্দিরের মাকে প্রণাম করে তোতাপুরী চিরবিদায় নিলেন শ্রীঠাকুরের কাছ থেকে।

ঐ কালের একটি ছোট ঘটনায় একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে ঐশী শক্তির যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তাঁর বিরাট মনে পরদুঃখকাতরতা কত গভীর ছিল— তার একটা মনোরম ছবিও দেখতে পাই।

মথুরামোহনের স্ত্রী জগদম্বা দাসী হঠাৎ কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। রোগের খুবই বাড়াবাড়ি। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার বৈদ্য সকলেই জবাব দিয়ে গিয়েছে। অগত্যা মথুরবাবু ছুটে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। উন্মত্তের ন্যায় তাঁর অবস্থা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদপ্রান্তে পতিত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"আমার যা হবার তা তো হতে চলল! বাবা, তোমার সেবাধিকার হতেও এবার বঞ্চিত হব। তোমার সেবা আর করতে পারব না।"

মথুরের ঐ প্রকার আর্তি দেখে শ্রীঠাকুরের প্রাণ করুণায় বিগলিত হয়ে গেল। তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে মথুরকে বললেন—"ভয় নেই। তোমার স্ত্রী সেরে যাবে।" বাবার অভয়বাণী শুনে জানবাজারে ফিরে এসে মথুর দেখেন যে, স্ত্রীর অবস্থা ভালর দিকে ফিরিতেছে।

শ্রীঠাকুর বলতেন—"সেদিন থেকে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করতে লাগল। আর তার রোগটার ভোগ (নিজের শরীর দেখিয়ে) এ শরীরের উপর দিয়ে হতে লাগল।"

ব্রহ্মোপলব্ধিরও স্তর আছে। নির্বিকল্প সমাধির গভীরতা ও স্থিতিবিশেষে আনন্দ এবং অনুভূতির তারতম্য আছে। ঐ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে বলেছিলেন—"দেবর্ষি নারদ দূর হতে ঐ ব্রহ্মসমুদ্র দেখেই ফিরেছেন। শুকদেব স্পর্শ মাত্র করেছেন। আর জগদ্‌গুরু শিব সেই অমৃতসমুদ্রের তিন গণ্ডুষ জল পান করে শব হয়ে পড়ে আছেন।"…

সাধারণ জীব (অর্থাৎ জীবকোটী) কঠোর সাধনাবলে নির্বিকল্প সমাধিলাভ করতে পারে, কিন্তু অতি দীর্ঘকাল তাতে অবস্থিতি হয় না—শাস্ত্র বলে 'বড় জোর একুশ দিন', তার পরেই তারা স্বরূপে লীন হয়ে যায়, দেহটা ঝরে পড়ে শুকনো পাতার মত। কিন্তু ঈশ্বরকোটী বা অবতারকল্প পুরুষগণ নির্বিকল্প সমাধিতে দীর্ঘকাল অবস্থান করতে পারেন এবং সেই সমাধি হতে ব্যুত্থিত হয়ে তাঁরা লোককল্যাণ-চিকীর্ষারূপ একমাত্র শুদ্ধ বাসনা অবলম্বন করে জগতে থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনেতিহাস কিন্তু আরো অভূতপূর্ব, অলৌকিক। তিনি সুদীর্ঘ ছ'মাস নিরন্তর অবস্থান করেছিলেন নির্বিকল্প সমাধিতে। তারপরে মহাশক্তির বিশেষ ইচ্ছায় লোক-কল্যাণের জন্য পার্থিব জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁকে 'ভাবমুখে'*

* 'ভাবমুখে' থাকা—অর্থাৎ ক্ষুদ্র 'অহং' বা আমিত্বের বিলোপসাধনের পর সর্বাবস্থায় বিরাট 'আমি' বা ঈশ্বরেচ্ছার সহিত মনকে একীভূত করে লোক-কল্যাণসাধন করা।

থাকতে হয়েছিল। ঐ কালে তিনি বিচরণ করতেন নির্বিকল্প ও সবিকল্পে, অদ্বৈত ও দ্বৈতে, বিজ্ঞান ও পরাভক্তিতে।

* * *

দীর্ঘ ছ'মাস নির্বিকল্প ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করার পরে তিনি 'ভাবমুখে' থাকার জন্য আদ্যাশক্তি দ্বারা আদিষ্ট হন। আমরা পূর্বে তা উল্লেখ করেছি। এর পরে শ্রীঠাকুরের মনে অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে জানবার ইচ্ছা হল। তিনি জগদম্বাকে বললেন— "মা, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তোকে কেমনভাবে ভজনা করে, তা আমায় জানিয়ে দে।"

কিছুদিন পরেই দক্ষিণেশ্বরে একজন মুসলমান ফকির এলেন, সুফী সম্প্রদায়ের। নাম গোবিন্দ রায়। গোবিন্দের প্রেম ও সরলতা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেব খুবই মুগ্ধ হন, এবং তাঁর নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করে ইসলামধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হলেন। ঐ সময়ে তিনি আল্লামন্ত্র জপ করতেন, নামাজ পড়তেন এবং আহার-বিহারাদিতেও সম্পূর্ণ মুসলমানভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ ভাবে তিন দিন সাধন করার পর— 'এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট সুগম্ভীর জ্যোতির্ময় পুরুষ-প্রবরের দিব্যদর্শনলাভ করেছিলেন।' পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধি করে, তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁর মন লীন হয়ে গিয়েছিল।

তেরশত বৎসর পূর্বে শ্রীমহম্মদ সগুণ একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিয়েছিলেন— 'এক ঈশ্বর, এক ধর্ম।' ঐ এক ঈশ্বর, বেদান্তের নিরাকার সগুণ ব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র। আর এক ধর্ম তা বেদান্তধর্ম। আপাত-দৃষ্টিতে যে বহু ধর্ম, তা-ই পারমার্থিক দৃষ্টিতে এক ধর্ম।

এরও প্রায় দেড় বৎসর পরের ঘটনা। ঈশাপ্রবর্তিত ধর্মের গূঢ়মর্ম জানবার ইচ্ছা হল শ্রীঠাকুরের মনে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির দক্ষিণ পাশেই যদুলাল মল্লিকের মনোরম বাগানবাটী। যদুবাবু ও তাঁর ধর্মপ্রাণা বৃদ্ধা মাতা শ্রীঠাকুরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতেন। যদুবাবুর উদ্যানবাটীর বৈঠকখানাগৃহের দেয়ালে অন্যান্য চিত্রের মধ্যে মেরীকোলে ঈশার একখানি কমনীয় মূর্তিও বিলম্বিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক দিন ঐ বৈঠকখানায় বসে সেই ছবিখানি তন্ময় হয়ে দেখছিলেন। ক্রমে ঈশার অত্যদ্ভুত জীবনচরিত ভাবতে ভাবতে তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। এমন সময় দেখলেন— ছবিখানি যেন প্রাণবন্ত ও জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। দেবজননী ও দেবশিশুর অঙ্গ হতে দিব্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর ভিতর প্রবেশ করতে লাগল। গভীর ধ্যানস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। ধ্যানে দেখলেন— ঈশার শান্তিময় দিব্যমূর্তি ও প্রার্থনামন্দির। ধূপ-দীপে আমোদিত করে তথায় খৃষ্টীয় পাদরিগণ কাতরপ্রাণে পূজা ও প্রার্থনা করছে। ভাবে মগ্ন হয়ে তিনি কালীবাড়িতে ফিরে এলেন।

তিন দিন সে তন্ময়তা চলেছিল। জগন্মাতা ক্ষমারূপে ও প্রেমরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়মন্দিরে উদ্ভাসিতা হয়ে রইলেন। এ তিন দিন তিনি কালীঘরে যান নি। শেষের দিন ভাববিভোর হয়ে পঞ্চবটীতলে পাদচারণ করছেন, দেখলেন— গৌরবর্ণ এক দেব-মানবমূর্তি দেবদ্যুতি বিকিরণ করতে করতে স্থিরদৃষ্টিতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর বিশাল নয়নযুগলে অপার করুণা ও মুখমণ্ডলে দেবভাব অঙ্কিত। কে ইনি সৌম্য— ভাবছেন শ্রীঠাকুর!

তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তল হতে ধ্বনিত হল—ইনিই সেই ঈশামসি, যিনি জীবোদ্ধারের জন্য হৃদয়ের শোণিত দান করেছেন। ধীর শান্ত পাদবিক্ষেপে সেই পরমপুরুষ এগিয়ে এসে শ্রীঠাকুরকে আলিঙ্গন করে লীন হয়ে গেলেন তাঁর শরীরে।

দু'হাজার বৎসরের অনির্বাণ অম্লান ধর্মজ্যোতি মিশে গেল শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদেহে। শ্রীঠাকুরের মন বিরাট ব্রহ্মসমুদ্রে ডুবে গেল। অনেককাল পরে দক্ষিণেশ্বরে ঈশার প্রসঙ্গকালে তিনি ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"হাঁরে, তোরা তো বাইবেল পড়েছিস্। বল দেখি, তাতে ঈশার চেহারার বর্ণনা কেমন লেখা আছে?··· আমি কিন্তু দেখেছি তাঁর নাক একটু চাপা।"

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম বা শিখধর্ম সাধন করেছিলেন বলে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবান তথাগত সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—"বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি। তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয়, বোধস্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধস্বরূপে লীন হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।"

জৈনধর্মপ্রবর্তক তীর্থঙ্করদের এবং শিখগুরু নানকের উপরও তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। গুরু নানক বিদেহ জনকের অবতার, তিনি বলতেন এবং ঐ সকল ধর্মকেও ভগবানলাভের সত্যপথ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর ঘরে অন্যান্য দেবদেবীর আলেখ্যের সঙ্গে মহাবীর তীর্থঙ্করের একটি প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি স্থাপিত ছিল।

"সকল ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ"—এই সত্যবাণী শ্রীঠাকুরের সর্বধর্মের সাধন ও সিদ্ধিপ্রসূত। ইহা বিচার ও বুদ্ধিপরিকল্পিত নয়। শ্রীঠাকুরের ভিতর দিয়ে সর্বধর্মসমন্বয়রূপ যে মহদ্ধর্ম জগতে প্রচারিত হয়েছে, 'রামকৃষ্ণরূপ' ঐ মহদ্ধর্মের প্রতীক।

শেষের দিনে কাশীপুরবাগানে অবস্থানকালে নিজের ছবি দেখে তিনি ভাবস্থ হয়ে বলেছিলেন—"এই মূর্তি ঘরে ঘরে পূজা হবে।" আর তাঁর অভয়বাণী—"যাঁদের শেষ জন্ম তাদের এখানে (তৎ-প্রচারিত উদার ধর্মমতে) আসতে হবে।"—অর্থাৎ যারা এ উদার ধর্মভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করবে, তাদেরই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

১৩

শ্রীঠাকুরের নির্বিকল্প অবস্থায় ছ'মাসকাল অবস্থানের পরেই, 'ভাবমুখে' মনকে নামিয়ে রাখার জন্য ব্রহ্মশক্তির ইচ্ছায় তাঁর কঠিন পেটের অসুখ হল। ফলে তাঁর শরীর কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল। বাবার শীর্ণ শরীর দেখে মথুরবাবু বিশেষ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। সামনে বর্ষাকাল। বর্ষার গঙ্গাজলে তাঁর পেটের অসুখ আরো বাড়তে পারে ভেবে বাবাকে কিছুদিনের জন্য কামারপুকুরে পাঠানই ঠিক করলেন মথুরবাবু। কামারপুকুরে 'শিবের সংসার' জেনে জগদম্বা দাসী নিজের হাতে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলেন— প্রদীপের সলতেটি পর্যন্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কামারপুকুরে গেলেন। সঙ্গে হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী। প্রায় সাত বৎসর পরে শ্রীঠাকুরকে পেয়ে আত্মীয়স্বজন ও গ্রামবাসীদের প্রাণে যেন আনন্দ উৎসব লেগে গেল। জয়রাম-বাটীতে লোক পাঠান হল নববধূকে আনবার জন্য। শ্রীসারদাদেবী সানন্দে কামারপুকুরে এলেন। বলতে গেলে এই তাঁর প্রথম স্বামিসন্দর্শন।

শ্রীসারদাদেবীও এ ক'বৎসর স্বামীকে দেখেন নি। তাঁর সাত বৎসর বয়সে দ্বিরাগমনের সময় শ্রীঠাকুর যে জয়রামবাটী গিয়েছিলেন, তার অস্ফুট স্মৃতির মধ্যে এইটুকু মাত্র তাঁর মনে আছে যে, তিনি ঘরের এক কোণে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁকে খুঁজে বের করে ভাগ্নে হৃদয়রাম অনেক পদ্মফুল দিয়ে তাঁর পাদপূজা করেছিল। আর

তিনি স্বেচ্ছায়ই শ্রীঠাকুরের পা ধুইয়ে, মাথার চুল দিয়ে তাঁর পা মুছে দিয়েছিলেন; তাঁকে পাখা দিয়ে বাতাসও করেছিলেন। তা দেখে প্রতিবাসিনীরা সকলে হেসে উঠেছিল। বালিকা শ্রীসারদাদেবী পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর ছোট্ট কচিহাত দুটি নেড়ে নেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বীজন করছেন— এ চিত্রটি ভাবুকের প্রাণে গভীর অনুপ্রেরণায় দোলা এনে দেয়।

জয়রামবাটীতে বসে এ ক'বৎসর শ্রীসারদা তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছেন। কিন্তু কামারপুকুরে এসে নিমেষে তাঁর মনের সব মেঘ কেটে গেল— মিটে গেল চক্ষুকর্ণের দ্বন্দ্ব। তেমনটিই আছেন তিনি— স্নেহ ও মমতাময়। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীসারদা তাঁর সেবার ভার সব তুলে নিলেন নিজের হাতে। শ্রীঠাকুরও স্নেহমমতায় আরো কাছে আকর্ষণ করতে লাগলেন পত্নীকে; আর সযত্নে শিখাতে লাগলেন খুঁটিনাটি সব কাজ— প্রদীপে পলতেটি কি করে রাখতে হয় তাও বাদ দেন নি। তাঁর সপ্রেম ব্যবহারে ও আন্তরিকতায় শ্রীসারদা অভিভূতা হলেন। সময়ের ব্যবধান তাঁদের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি করতে পারে নি। তাঁরা যেন চিরমিলিত একপ্রাণ— একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ। শ্রীঠাকুর নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন। শ্রীসারদাদেবী তন্ময় হয়ে শুনতেন। শ্রীঠাকুরের ভাবাবেশ হত, তিনি অবাক হয়ে দেখতেন।

তাঁদের এই ঘনিষ্ঠতা ভৈরবী ব্রাহ্মণী ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁর ভয় হল যে, এতে শিষ্যের আদর্শচ্যুতি হবে। তিনি শ্রীঠাকুরকে পত্নী থেকে দূরে রাখবার নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু শ্রীঠাকুর নিজের কর্তব্যসাধনে অটল। তাতে

ব্রাহ্মণী মনে মনে আহতা হলেন। শ্রীঠাকুর যখন অদ্বৈত সাধনায় প্রবৃত্ত হন তখনো ব্রাহ্মণী তাঁকে ঐ সাধনা করতে নিষেধ করেছিলেন। দেবাদিষ্ট শ্রীঠাকুর ব্রাহ্মণীর সে আদেশ রক্ষা করতে পারেন নি। ভৈরবীর ধারণা— শ্রীঠাকুরের মধ্যে যা কিছু দিব্য-চেতনা তা তাঁরই শক্তিতে, তাঁর কৃপায়। বলতেন প্রকাশ্যে— তার চক্ষুদান তো আমিই করেছি। শ্রীঠাকুর শুনতেন সব, মৃদু মৃদু হাসতেন, আর নিজ পত্নীকে ব্রাহ্মণীর সেবাদি আরো বেশী করে করতে বলতেন। নিজেও তাঁকে খুশী করবার চেষ্টা করতেন নানাভাবে।

ব্রাহ্মণীর দৃপ্ত ব্যবহারে বাড়ির স্ত্রীলোকেরা ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। প্রতিবেশীরা ভৈরবীকে এড়িয়ে চলত। তাঁর ক্রোধ ও অহঙ্কার ক্রমে এত বেড়ে গেল যে, এক দিন অতি সামান্য ঘটনা থেকে হৃদয়ের সঙ্গে হল তাঁর তুমুল বিবাদ! সকলেই বিশেষ মর্মাহত হল। ক্রোধের উপশমে ব্রাহ্মণী নিজের অন্তর খুঁজে দেখতে লাগলেন। বুঝলেন নিজের মতিভ্রম। মনে মনে সাতিশয় অনুতপ্তা হয়ে শ্রীঠাকুরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চলে গেলেন কাশীধামে।

ব্রাহ্মণীই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিতর ঐশী শক্তির বিকাশ দেখে তাঁকে অবতার বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং পরে দীর্ঘ কয়েক বৎসর তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'গুরু-অভিমান' তাঁর নির্মল দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

* * *

কামারপুকুরের স্বাস্থ্যকর জলহাওয়ায় ও নির্মল পল্লী-আবেষ্টনীতে কয়েক মাস বাস করার পরেই শ্রীঠাকুর অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন।

তাঁর অঙ্গে দেখা দিল স্বাস্থ্যের লালিমা। পল্লীবাসীরা ভিড় করে বসে তাঁর মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনত। তাঁর ঐশী ভাবাবেশ দেখে ভয় হয়ে যেত তাদের ; ভাবত— লোকটা বুঝিবা মরে গেল! বাল্য-বয়স্যদের সঙ্গে তিনি কখনো রঙ্গরসিকতা করেন। এমন সব কথা বলেন যে, হাসতে হাসতে মেয়েপুরুষদের পেটে খিল ধরে যায়। তখন দেখে মনে হত— অতি সহজ মানুষ।

বর্ষাকাল। বৃষ্টি হয়ে গেছে। শ্রীঠাকুর শৌচে গেছেন ভূতির খালের দিকে। ফিরবার সময় দেখেন— পথে জলকাদার উপর একটা মস্ত মাগুর মাছ। দেখে তাঁর দয়া হল— আহা! কারো চোখে পড়লে এক্ষুণই তো মেরে ফেলবে। পায়ে করে ঠেলে এনে মাছটাকে পুকুরে ছেড়ে দিলেন।··· হৃদয় শুনে বড্ড আপসোস করতে লাগলেন।

হৃদয়ের বিশেষ সাধ হল— মামাকে কয়েক দিনের জন্য তাঁদের গ্রাম শিহড়ে নিয়ে যান। শ্রীঠাকুর পাল্কী করে হৃদয়ের সঙ্গে শিহড়ে গেলেন। ওখানে বহুদূরব্যাপী বিস্তীর্ণ মাঠে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর মনে বিরাটচৈতন্যের স্ফূর্তি হত। বর্ষার জলসিক্ত মাঠ দেখে তিনি ভাবস্থ হয়ে যেতেন। তিনি বলেছিলেন— "বর্ষায় যেমন পৃথিবী জুড়ে থাকে, তেমনি জীব জগৎ সব কিছু এই চৈতন্যেতে জুড়ে রয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনের স্বাভাবিক গতি ঊর্ধ্ব দিকে। সেজন্য এটা খাব, ওটা খাব এইভাবে পাঁচরকম করে ভুলিয়ে ভালিয়ে মনকে নামিয়ে রাখতে হত সহজ অবস্থাতে। তাই কামারপুকুরে এসে ভোরে ভোরেই ফরমাস করতেন— "আজ এই এই সব রেঁধো।"

এক দিন ঘরে পাচফোঁড়ন ছিল না, লক্ষ্মীর মা (রামেশ্বরের স্ত্রী) বললেন— "নেই তো আর কি হবে? পাঁচফোড়ন ছাড়াই চলবে।" শ্রীঠাকুর শুনতে পেয়ে বলছেন— "সে কি গো, নেই তো আনিয়ে নাও না এক পয়সার পাঁচফোড়ন। যাতে যা লাগে তা বাদ দিলে চলবে কেন? তোমাদের এই ফোঁড়নের গন্ধের বেন্নন খেতে দক্ষিণেশ্বর থেকে এলাম— তা-ই তোমরা বাদ দিতে চাও!" লক্ষ্মীর মা তো লজ্জায় মরে যান! তাড়াতাড়ি পাঁচফোড়ন আনিয়ে নিলেন।

প্রায় সাত মাস নানাভাবে কামারপুকুরে অতিবাহিত করে শ্রীঠাকুর ফিরে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে।

*　　　*　　　*

এদিকে মথুরবাবু সস্ত্রীক মধ্যভারতের পুণ্যতীর্থযাত্রার আয়োজন করছিলেন। শ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে আসতেই সস্ত্রীক মথুরবাবু তাঁকে তীর্থযাত্রার জন্য বিশেষ অনুরোধ করতে লাগলেন। তিনিও রাজী হলেন। স্থির হল হৃদয়ও সঙ্গে যাবে।

অনন্তর শুভদিনে ১৮৬৮ খৃঃ, ২৭শে জানুয়ারী (১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ) শতাধিক লোকজন সহ শ্রীঠাকুরকে নিয়ে মথুরবাবু তীর্থযাত্রায় রওনা হলেন। যাত্রিদলের প্রথম গন্তব্যস্থান দেওঘর।... এক গ্রামের পথে সকলে চলেছে। গরীব গ্রামবাসীদের দুর্দশা দেখে শ্রীঠাকুরের হৃদয় করুণায় আর্দ্র হয়ে গেল। তিনি মথুরকে বললেন— "তুমি তো মা'র দেওয়ান। এদের একমাথা তেল ও একখানা করে কাপড় দাও। আর পেটভরে এক দিন

খাইয়ে দাও।" প্রথমটা মথুরবাবু একটু আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—"বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, দেখছি অনেক লোক— এদের খাওয়াতে পরাতে গেলে টাকার অনটন পড়তে পারে।"

দরিদ্র-নারায়ণদের দুঃখে শ্রীঠাকুরের চোখে জল এল। তাঁর প্রাণে অপূর্ব করুণার আবেশ এসেছে, তিনি বললেন—"দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না, আমি এদের কাছেই থাকব। এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে আমি যাব না।"—এই বলে মথুরকে ছেড়ে তিনি গিয়ে বসলেন গরিবদের সঙ্গে। অগত্যা মথুরকে তাঁর ইচ্ছাস্বরূপ সব ব্যবস্থা করতে হল। বুভুক্ষুদের মুখে হাসি দেখে তবে তিনি নড়লেন।

৺কাশীতে পৌছে ভাবাবেশে শ্রীঠাকুর দেখলেন—স্বর্ণমণ্ডিত জ্যোতির্ময় কাশী। যুগযুগান্তর ধরে সাধুভক্তগণের হৃদয়ের ভাব-ভক্তি ঘনীভূত হয়ে দিব্য হেমময়-ভাব-প্রবাহরূপে শিবপুরীর সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে যেন পরিব্যাপ্ত। শ্রীঠাকুরের মনে এই ভাব এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, শৌচাদি করে ঐ স্থানকে অপবিত্র করতে তাঁর প্রবৃত্তি হত না। সেজন্য তিনি পাল্কী করে 'অসী'র পারে শৌচাদি সেরে আসতেন।

মথুরবাবু কেদারঘাটের কাছে পাশাপাশি দু'খানি বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন। পূজা দানাদিতে মথুর মুক্তহস্ত। তিনি বাইরে বেরোলে মাথায় রুপার ছাতা ধরে ও আসাসোঁটা নিয়ে আগেপাছে সুসজ্জিত দারোয়ান থাকত। যেন ছোট খাট রাজা।

৺কাশীতে থাকাকালীন শ্রীরামকৃষ্ণদেব পাল্কী করে প্রায় রোজ

বিশ্বনাথদর্শনে যেতেন। যেতে যেতেই তিনি ভাবস্থ হয়ে পড়তেন —বিশ্বনাথের জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখতেন ভিতরেই। কেদারের মন্দিরে তাঁর আরো বাড়াবাড়ি ভাব হত।

কাশীর প্রসঙ্গে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন—"মণিকর্ণিকার ঘাটের কাছ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। হঠাৎ শিবদর্শন হল। নৌকার ধারে এসে সমাধিস্থ হলাম। মাঝিরা হৃদয়কে বলতে লাগল—'ধর! ধর!'—পাছে পড়ে যাই। দেখলাম, যেন জগতের সব গাম্ভির্য নিয়ে সেই ঘাটে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে দেখলাম দূরে দাঁড়িয়ে, তারপর কাছে আসতে দেখলাম। তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন।" কাশীতে তাঁর অন্য দর্শনের বিবরণ 'লীলাপ্রসঙ্গে' পাওয়া যায়—"দেখলাম পিঙ্গলবর্ণ জটাজূটধারী, দীর্ঘ সেই শ্বেতকায় পুরুষ গম্ভীর পাদবিক্ষেপে শ্মশানের প্রত্যেক চিতার পার্শ্বে গমন করছেন এবং প্রত্যেক দেহীকে সযত্নে তুলে তার কর্ণে তারকব্রহ্মমন্ত্র প্রদান করছেন; এবং সর্বশক্তিময়ী জগদম্বাও স্বয়ং মহাকালীরূপে জীবের অপর পার্শ্বে সেই চিতার উপর বসে তার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ সকল প্রকার সংস্কারবন্ধন খুলে দিচ্ছেন এবং নির্বাণের দ্বার উন্মুক্ত করে স্বহস্তে তাকে অখণ্ডের ঘরে প্রেরণ করছেন।..."

কাশীতে হঠাৎ ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সঙ্গে শ্রীঠাকুরের দেখা হয়। চৌষট্টি-যোগিনীতে মোক্ষদা নাম্নী এক ভক্তিমতী রমণীর কাছে

* 'কাশীখণ্ডে' লেখা আছে—৺কাশীতে মৃত্যু হলে ৺বিশ্বনাথ জীবকে নির্বাণ-মুক্তি দিয়ে থাকেন। কিন্তু কিভাবে তা দেন, তার কোন বিস্তারিত উল্লেখ নেই। শ্রীঠাকুরের দর্শন তার পূর্ণতা সম্পাদন করেছে।

তিনি থাকতেন। শ্রীঠাকুর তাঁর বাড়িতে কয়েকবার গিয়েছিলেন। পরে তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মণীও গেলেন বৃন্দাবনে।

শ্রীঠাকুর ত্রৈলঙ্গস্বামীকে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন, বলেছিলেন—"সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। তাঁর থাকায় কাশী উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। উঁচু জ্ঞানের অবস্থা।" শ্রীঠাকুর পায়েস রেঁধে নিয়ে গিয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামীকে খাইয়েছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে হৃদয়কে বলেছিলেন—"একেই ঠিক ঠিক পরমহংস-অবস্থা বলে।"

পাঁচ-সাত দিন কাশীতে বাস করে মথুরের সঙ্গে শ্রীঠাকুর প্রয়াগে গেলেন। প্রয়াগে তাঁর বিশেষ দর্শনাদির কোন উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। পুনরায় কাশীতে এক পক্ষকাল বাস করে সকলে যান শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে। তথায় দর্শনাদি সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর বলেন—"মথুরায় ধ্রুবঘাটে যেতেই অমনি দপ্ করে দর্শন হল—বসুদেব কৃষ্ণকে কোলে লয়ে যমুনা পার হয়ে যাচ্ছেন।···শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের পথে যাচ্ছি, গোবর্ধন দেখতে নামলাম। গোবর্ধন দেখামাত্রই একেবারে বিহ্বল হয়ে গেলাম। দৌড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে।··· বঙ্কুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল, আমি তাঁকে ধরতে গিয়েছিলাম। ···বৃন্দাবনে ভেক নিয়েছিলাম, পনের দিন রেখেছিলাম।··· কালীয়দমনঘাট দেখবামাত্র উদ্দীপন হত—বিহ্বল হয়ে যেতাম···।"

হৃদয়রামের মুখে শ্রীঠাকুরের ৺বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান দর্শনের বিবরণ যেমনটি শুনেছিলেন তাই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ আলমবাজার মঠ থেকে ২৬।১২।৯৫ তারিখে এক চিঠিতে বাবুরাম

মহারাজকে জানিয়েছিলেন— "...শ্রীশ্রীগুরুদেব প্রথমতঃ মথুরায় নামিয়া ধ্রুবঘাট প্রভৃতি দর্শন করেন। পরে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর মন্দিরের নিকটবর্তী একটি বাড়িতে থাকেন। সঙ্গে মথুর হৃদয় প্রভৃতি ছিলেন। বৃন্দাবনে তিনি সর্বদাই ভাবাবেশে থাকিতেন, এক পাও হাঁটিতে পারিতেন না। তাঁহাকে পাল্কীতে করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। পাল্কীর দ্বার খোলা থাকিত। তিনি দর্শন করিতে করিতে যাইতেন। যখন ভাবে অধীর হইয়া পাল্কী হইতে লাফাইয়া পড়িতে চাহিতেন, তখন হৃদয় নিবারণ করিত। হৃদয় পাল্কীর বাড় ধরিয়া যাইত। তিনি ঐরূপে হৃদয়ের সহিত শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড-দর্শনে যান। মথুরবাবু সঙ্গে যান নাই।... মথুর প্রায় ১৫০৲ টাকার সিকি ও দুয়ানি বিতরণের জন্য হৃদয়ের হস্তে দিয়াছিলেন। তিনি সাধু বৈষ্ণব দেখিলেই হৃদয়কে কিছু কিছু দিতে বলিতেন। পরে গোবর্ধনদর্শনে যান। তথায় উলঙ্গ হইয়া একেবারে গিরিরাজের উপর উঠিয়া পড়েন। পাণ্ডারা ধরিয়া নামাইয়া আনে।

গঙ্গামাতা তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিনিতে পারেন। তিনি (ঠাকুর) তাঁহার নিকট প্রায় ৬।৭ দিন ছিলেন।... হৃদয় তদনুসারে (মথুরের অনুরোধক্রমে) গঙ্গামাতার একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে নিধুবন হইতে লইয়া আসেন।... তিনি বৃন্দাবনে ভেক গ্রহণ করেন। তদ্বিষয়ে পরে লিখিব।"*

* পরবর্তী এক চিঠিতে শশী মহারাজ স্বামী প্রেমানন্দকে লিখেন,—"ভাই বাবুরাম, শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ রাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী চতুরাপাণ্ডা নামে একজনের নিকট ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনদর্শনের সময় তাঁহার হাতে সর্বদাই একটি কাঁচা কঞ্চির

বৃন্দাবনে শ্রীঠাকুর ও গঙ্গামাঈর মিলন এক অপূর্ব মিলন। নিধুবনে থাকতেন গঙ্গামাঈ। উচ্চাঙ্গের সাধিকা—ভাবাবেশ হত। তাঁর ভাব দেখবার জন্য লোকের ভিড় লেগে যেত। শ্রীঠাকুরকে দেখেই তিনি ভাবাবেশে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি বলতেন—"ইনি সাক্ষাৎ রাধা, দেহধারণ করে এসেছেন।" তাঁকে দুলালী বলে ডাকতেন। একজন অপরিচিত বয়স্ক লোককে দুলালী বলে ডাকা! গঙ্গামাতা দেখেছিলেন ভাবনেত্রে। মধুরভাবে সাধনকালে শ্রীমতী শ্রীঠাকুরের অঙ্গে সঙ্গতা হয়েছিলেন এবং তখন থেকেই বাস করছিলেন শ্রীঠাকুরের ভিতর। তাই গঙ্গামাতা দেখেছিলেন শ্রীঠাকুরকে শ্রীরাধারূপে। শ্রীঠাকুরও গঙ্গামাঈকে পেয়ে সর্বক্ষণ ভাবাবেশে থাকেন। বেশ আনন্দে আছেন—দক্ষিণেশ্বর ভুল হয়ে গেছে। এদিকে মথুরবাবুর কাশী ফিরে আসবার সময় হল। গঙ্গামাঈ কিছুতেই তাঁর দুলালীকে ছাড়বেন না—যেতে দেবেন না। হৃদয় শ্রীঠাকুরের এক হাত ধরে টানে, আর গঙ্গামাঈ টানছেন আর এক হাত ধরে। এমন সময় শ্রীঠাকুরের মনে হল—মা একলা সেই দক্ষিণেশ্বরে নবতে আছেন। তাই তাঁর আর শ্রীবৃন্দাবনে থাকা হল না।

এক পক্ষকাল বৃন্দাবনে বাস করে সকলে এলেন কাশীতে ফিরে। শ্রীঠাকুরের নির্দেশে মথুর কাশীতে 'কল্পতরু' হলেন। ব্রাহ্মণ ও

ছড়ি থাকিত। তাহা যদি হৃদয় কখন কখন কাড়িয়া লইত তিনি তাহাতে অতিশয় কাতর হইতেন এবং যতক্ষণ না ফিরিয়া পাইতেন ততক্ষণ স্থির হইতেন না। বৃন্দাবনে তিনি এক পাও হাঁটিতে পারিতেন না। এমন কি, পাল্কীর ভিতর বসিয়া যমুনায় স্নান করিতেন।

গরিব-দুঃখীদের প্রচুর দান করলেন মুক্তহস্তে; যে যা চেয়েছিল কেউই বিমুখ হয় নি। বাবাকে কিছু চাইতে অনুরোধ করায় তিনি বললেন—"নেহাৎ দেবে তো একটা কমণ্ডলু দাও।"... মথুরের চোখে জল এল।

'একমেবাদ্বিতীয়ং'-এ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবার তীর্থে যাওয়া কেন? তিনি নিজেই তো সর্বতীর্থস্বরূপ হয়ে রয়েছেন! সকল দেবদেবী তাঁতেই তো সঙ্গত হয়েছেন। "তীর্থী কুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।"—এই শাস্ত্রবাক্যের যাথার্থ্য-প্রমাণের জন্য কি?... শ্রীরামকৃষ্ণজীবনদৃষ্টে তীর্থের বাস্তব মাহাত্ম্য বুঝতে আর কোন প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয় না।

শ্রীঠাকুর গয়াধামে যেতে রাজী হলেন না বলে, মথুরবাবুও গয়াদর্শন না করে ফিরে এলেন কলিকাতায়। চার মাসকাল তীর্থভ্রমণ করে ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে, শ্রীঠাকুর পঞ্চবটীর চারদিকে ছড়ালেন শ্রীবৃন্দাবনের রজ। কিছুটা রজ প্রোথিত করলেন নিজ সাধনকুটীরের মধ্যে। "আজ হতে এস্থান শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হল।"— তিনি সানন্দে বললেন। এদিকে মথুরবাবু পঞ্চবটীতে অনেক বৈষ্ণবগোস্বামী ও ভক্তদের নিমন্ত্রণ করে করলেন বিরাট মহোৎসব। মোটা দক্ষিণা ও ভূরিভোজন পেয়ে মথুরবাবুকে তীর্থের সুফল দিয়ে আশীর্বাদ করতে করতে সকলে চলে গেলেন।

* * *

১২৭৫ সালে শ্রীঠাকুরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে শারদীয়া দুর্গোৎসব করার হৃদয়রামের খুব ইচ্ছা হল। এদিকে মথুরের

জানবাজারের বাড়িতেও দুর্গোৎসব। মথুরবাবু তাঁর 'বাবা'কে কিছুতেই ছাড়তে চাইলেন না। শ্রীঠাকুরকে নিয়ে যেতে না পেরে হৃদয়রাম প্রাণে খুবই আঘাত পেলেন। তাঁকে দুঃখিত দেখে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন—"তুই দুঃখ করছিস কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্মশরীরে তোর পূজা দেখতে যাব। অন্য কেউ আমায় দেখতে পাবে না, কিন্তু তুই দেখবি।" হয়েছিলও তা-ই। সপ্তমীবিহিতা-পূজা সাঙ্গ করে নীরাজনের সময় হৃদয় দেখতে পেলেন—শ্রীঠাকুর জ্যোতির্ময়দেহে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হৃদয়রাম পরে বলেছিলেন—"প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজাকালে দেবীপ্রতিমার পার্শ্বে মামাকে দিব্যদেহে দেখতে পেতাম।" হৃদয়রাম দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসে শ্রীঠাকুরকে নিত্য দর্শন পাবার কথা বলাতে তিনি বলেছিলেন—"আরতি ও সন্ধিপূজার সময় অনুভব করেছিলাম যে, দিব্যশরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়ে তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হয়েছি।"

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে দেবমানবত্বের অপূর্ব মিশ্রণ বাস্তবিকই অলৌকিক ও সর্বমাধুর্যময়। একদিকে যেমন অতি উচ্চ ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্মদৃষ্টি, আবার পাশাপাশি দেখতে পাই—সাধারণ মানবের মত সুখদুঃখে অভিভূত, অন্যের সুখদুঃখের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি যেন জড়িত। দু' অবস্থার মধ্যেই অতি সহজ আনাগোনা। মুহূর্তে জীবজগতের উর্ধ্বে পরাসত্বাতে অবস্থিতি, আবার পরক্ষণে পুত্রহারার জন্য সমবেদনা ও অশ্রুবিসর্জন।...

শ্রীঠাকুরের অগ্রজ রামকুমারের পুত্র সূতিকাগৃহে মাতৃহীন শিশু

—রামঅক্ষয় এখন বড় হয়ে দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুমন্দিরের পূজক হয়েছে। তার ভক্তি ও তন্ময়তা দেখে সকলেই মুগ্ধ। সেজন্য শ্রীঠাকুরও তাকে খুব ভালবাসেন। অক্ষয়কে তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলেন। এখন সে ক্ষুদিরামের বংশের গৌরবস্থল। তার নিষ্ঠা, ভাব, ভক্তি সবই অতুলনীয়। বিশ-একুশ বৎসরের যুবক। বিবাহের কিছুদিন পরেই শ্বশুরবাড়িতে কঠিন অসুখ হল। একটু সেরে পুনরায় এল দক্ষিণেশ্বরে। সুস্থ সবল হয়ে উঠেছে, এমন সময় রামঅক্ষয় পুনরায় জ্বরে পড়ল। ডাক্তার বললে— সামান্য জ্বর, সেরে যাবে। তিন-চার দিনেও জ্বর ছাড়ল না। শ্রীঠাকুর দেখে হৃদয়কে আলাদা ডেকে নিয়ে বললেন—"হৃদু, ডাক্তাররা বুঝতে পারছে না, অক্ষয়ের বিকার হয়েছে। ভাল চিকিৎসক আনিয়ে আশ মিটিয়ে চিকিৎসা কর, ছোঁড়া কিন্তু বাঁচবে না।"

হৃদয়রাম শুনে বললেন—"ছি ছি মামা, তোমার মুখ দিয়ে অমন কথাগুলো কেন বের হল ?"— "আমি কি ইচ্ছা করে অমন বলছি ? মা যেমন জানান বলান, ইচ্ছা না থাকলেও আমাকে তেমনি বলতে হয়। আমার কি ইচ্ছা যে অক্ষয় মারা পড়ে ?" বললেন শ্রীঠাকুর।

অক্ষয়ের অন্তিমকাল উপস্থিত। শ্রীঠাকুর তার শয্যাপার্শ্বে গিয়ে বললেন— "অক্ষয়, বল 'গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম'।" তিনবার ঐ মন্ত্র উচ্চারণ করেই রামঅক্ষয়ের আত্মা অক্ষয়ধামে চলে গেল। হৃদয় তো কেঁদে আকুল। শ্রীঠাকুর কিন্তু ভাবাবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছেন আর হাসছেন। দেখছেন—কি করে আত্মা বেরিয়ে যায়, কোথায় যায়। মৃত্যুটা তো অবস্থান্তরপ্রাপ্তি মাত্র !

পরদিন শ্রীঠাকুর নিজের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন চুপচাপ। হঠাৎ অক্ষয়ের জন্ম শোকাবেগ উথলে উঠল। বলেছিলেন —"গামছা যেমন নিংড়োয়, মনে হল বুকের ভিতরটা তেমনি করে নিংড়োচ্ছে।" পরক্ষণেই আবার ভাবস্থ হয়ে বলছেন— "মা, এখানে পরনের কাপড়ের ঠিক নেই— তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই যখন এরকম হচ্ছে, তখন সংসারীদের শোকে যে কী হয়—তা-ই দেখাচ্ছিস্ বটে!"

*　　　　*　　　　*

শ্রীঠাকুরকে মথুরবাবু দিনেরাতে যত বেশী বাজিয়ে দেখতে লাগলেন, ততই তাঁর শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে। এমন ত্যাগ সংযম জ্ঞান ভক্তি ঈশ্বরপূর্ণতা বিগলিত করুণা! অথচ এত অহংলেশশূন্য!

বাবাকে তিনি আর কাছছাড়া করতে পারেন না। আহার-বিহারে, এমন কি শয়নে পর্যন্ত, বাবাকে চাই। নানাভাবে সেবা করেও তৃপ্তি নেই; স্বর্ণপাত্রে খাইয়ে, হাজার টাকার শাল চড়িয়ে, তবু তাঁর আশ মিটে না। বাবা শাল পায়ে মাড়াচ্ছেন, স্বর্ণপাত্রকে থুথু করে ত্যাগ করছেন— 'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন' অবস্থা। শ্রীঠাকুর নির্বিকার, নির্লিপ্ত।

শ্রীঠাকুরের তৃপ্তির জন্য মথুরবাবু করেন অন্নমেরু যজ্ঞ। আবার যত বড় বড় সাধু পণ্ডিত সকলকে নিমন্ত্রণ করে আনেন। নামজাদা কীর্তনীয়াদের আনান বাবাকে গান শোনাবার জন্ম। গায়ক-গায়িকাদের গুণপনার পরিমাপক হল— 'বাবার' ভাব, সমাধি। যার কীর্তন শুনে তাঁর যত বেশী ভাব হবে, সে-ই তত

বড় কীর্তনীয়া। সে পাবে তত বেশী প্যালা। শ্রীঠাকুরকে নিয়ে চলেছে আনন্দমেলা।

ইদানীং মথুরবাবু জানবাজারের বাড়িতে ঘন ঘন বাবাকে নিয়ে যান। বাবার উপর মথুরবাবুর অসাধারণ টান দেখে, কালীঘাটের হালদার পুরুত অন্তরে জ্বলে পুড়ে মরছে।— "এ আপদ কোত্থেকে এসে জুটল? লোকটা বাবুকে কোন প্রকার গুণ-টুণ করেছে। নইলে এত বশ করল কি করে! এক নম্বরের ভণ্ড, এদিকে সরলতার ভান দেখায়। এর কাছ থেকে কোন রকমে বশীকরণের ক্রিয়াটা যদি বাগানো যেত!"— ভাবে হালদার পুরুত।

একদিন সন্ধ্যাবেলা জানবাজারের বাড়িতে শ্রীঠাকুর অর্ধবাহ্য-দশায় বসে আছেন। ক্রমে সহজ অবস্থা ফিরে আসছে। এমন সময় পুরুত এসে দেখল যে, শ্রীঠাকুর একা রয়েছেন। ভাবলেন— এই সময়। কাছে গিয়ে এদিক সেদিক দেখে শ্রীঠাকুরের গায়ে ধাক্কা মেরে বলছে— "ও বামুন, বল্ না— বাবুকে কি করে বাগালি, বল্ না? ঢং করে চুপ করে রইলি যে? বল্ না?" বার বার এ ভাবে জিজ্ঞাসা করেও যখন কোন প্রত্যুত্তর পেল না, তখন পুরুত রেগে গিয়ে "যা শালা বললি নে" বলে তাঁর গায়ে জুতা পায়ে জোরে লাথি মেরে চলে গেল। চিরক্ষমাশীল শ্রীঠাকুর! এমন ঘটনাও ঘুণাক্ষরে কারো নিকট তখন প্রকাশ করেন নি। তিনি জানতেন, মথুরের কানে গেলে পুরুতের কি অবস্থা হবে! কিছুকাল পরে অন্য বিশেষ কারণে ঐ পুরুত মথুরের বাড়ি হতে বিতাড়িত হল। পরে মথুরকে কথায় কথায় শ্রীঠাকুর ঐ ঘটনা বলেছিলেন। শুনে মথুর ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে আক্ষেপ

করে বলেন— "বাবা, একথা আমি তখন জানতে পারলে পুরুতের মাথাটা থাকত না।"

শেষের দিকে মথুর বলতেন— "বাবা, তোমার ভিতর আর কিছু নেই— সেই ঈশ্বরই আছেন। দেহটা একটা খোল মাত্র।" মথুরবাবু শ্রীঠাকুরকে দিনেরাতে সামনে দেখে তবে তাঁর পায়ে মাথা নত করেছিলেন।

এর কিছুদিন পরে মথুরবাবু বাবাকে সঙ্গে করে তাঁর জমিদারি-মহল দেখতে যান। রাণাঘাটের নিকট কলাইঘাটে যেতেই দারিদ্র্য-প্রপীড়িত বহু পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষের দুরবস্থা শ্রীঠাকুরের চোখে পড়ল। তাদের ছিন্নবাস, ক্লিষ্ট রুক্ষ চেহারা দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। মা আনন্দময়ীর রাজ্যে এত দুঃখ, এত কষ্ট! মথুরবাবুকে বললেন—"এদের পেট ভরে খাওয়াও, একখানি করে নূতন কাপড় ও একমাথা তেল দাও।" প্রথমটায় একটু আপত্তি জানালেও, শ্রীঠাকুরের রোক দেখে মথুর তাঁর ইচ্ছামত সকলকে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত করলেন। আর তাঁর আদেশে মথুরকে নিঃস্ব প্রজাদের বার্ষিক খাজানা মাফ করে দিতে হল।

নির্বিকল্প অবস্থায় ছ'মাস নিরন্তর অবস্থিতি, জন্ম থেকে ভগবানকে নিয়ে নাড়াচাড়া, ভগবানের সঙ্গে অখণ্ড বিলাস; তবু তিনি মানুষকে ভোলেন নি। ভুলবেন কি করে? মানুষ যে ভগবানেরই রূপ—ভগবানেরই অংশ। মানুষকে বাদ দিলে যে ভগবানকে পুরোপুরি পাওয়া হল না!···

মথুরের দৈবাদিষ্ট কর্ম শেষ হয়েছে। এবার মহাযাত্রার পালা। সাত-আট দিন জ্বরে ভুগে, তাঁর আত্মা দেবীলোকে গমন করল।

মথুরের ঐ শেষ অসুখ হতেই, শ্রীঠাকুর বুঝতে পেরেছিলেন যে, মা এবার মথুরকে নিয়ে যাবেন। রোজ হৃদয়কে খবর নিতে পাঠাতেন, কিন্তু নিজে একদিনও মথুরকে দেখতে যান নি। সন ১২৭৮ সালের ১লা শ্রাবণ, অপরাহ্ন। শ্রীঠাকুর গভীর ভাবস্থ। দিব্যশরীরে জ্যোতির্ময়বর্ত্মে সেবকের অন্তিম শয্যাপার্শ্বে তিনি উপস্থিত হলেন। পাঁচটার সময় ভাবভঙ্গ হলে হৃদয়কে কাছে ডেকে শ্রীঠাকুর বললেন—"জগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে তুলে নিলেন। তার তেজ দেবীলোকে গমন করল।" অনেক রাত্রে খবর এল, মথুরবাবু বিকাল পাঁচটায় মারা গেছেন।

অনেক কাল পরে মথুরের কি হল জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন—"কোথায় একটা রাজাটাজা হয়ে জন্মাবে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।"

* * *

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সন ১২৭৪ সালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবী কামারপুকুরে একসঙ্গে কয়েক মাস ছিলেন। ঐ সময়ে শ্রীঠাকুরের দিব্যসঙ্গে তিনি কী আনন্দে যে ছিলেন, তা শ্রীসারদাদেবীর নিজের কথায় জানা যায়।—"হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রয়েছে। ঐ কাল হতে সর্বদা এরূপ অনুভব করতাম। সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর যে কিরূপ পূর্ণ থাকত, তা বলে বুঝাবার নয়।···" তারপর আরো চারটি বৎসর তাঁর জয়রামবাটীতে কেটে গেল, ক্রমে শ্রীসারদাদেবী আঠার বৎসরে উপনীতা হলেন। দেবস্বামীর ধ্যান ও আনন্দস্মৃতিকে বুকে করে তিনি বেশ আছেন। কিন্তু এদিকে নানা কথা রটতে লাগল

জয়রামবাটীতে।— জামাই বদ্ধ পাগল হয়েছে! তিনিও গ্রামের মেয়েদের কাছে পাগলের স্ত্রী। স্বামিনিন্দাশ্রবণ এড়াবার জন্য তিনি বাড়ি থেকে বড় একটা বের হতেন না। কিন্তু তাতেই তো সবকিছুর সমাধান হল না! শঙ্কিতা হলেন শ্রীসারদাদেবী।— "পাঁচজনে যা বলছে তাই যদি হয়? আমার তো আর এখানে থাকা ঠিক হচ্ছে না।" তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এল। শ্রীসারদা-দেবীর কয়েকজন প্রতিবাসিনী যোগ-উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিল। এই তো শুভ সুযোগ—ভাবলেন তিনি। তাদের কাছে তিনি স্নানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সকলের মুখে খবর শুনে পিতা রামচন্দ্র বুঝলেন—সারদা কেন গঙ্গাস্নানে যেতে চাচ্ছে। তিনি নিজেই নিয়ে যেতে রাজী হলেন।

শুভদিনে সকলে যাত্রা করেছে। সুদীর্ঘ হাঁটাপথ। তবু শ্রীসারদাদেবী চলেছেন মনের উল্লাসে সকলের সাথে সাথে। রাত্রে সকলে চটিতে বিশ্রাম করে, দিনে চলে। কিন্তু দুদিন পরেই শ্রীসারদাদেবী একস্থানে ভীষণ জ্বরাক্রান্ত হয়ে পিতার বিশেষ চিন্তার কারণ হলেন। কিন্তু এক অভাবনীয় ঘটনা তাঁকে বিস্মিতা করেছিল। পরবর্তীকালে স্ত্রীভক্তদের কাছে তিনি বলেছিলেন— "জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছি, তখন দেখলাম একজন রমণী এসে পাশে বসল। মেয়েটির রং কালো কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনো দেখি নি! বসেই আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমন নরম ঠাণ্ডা হাত! গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে যেতে লাগল। জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি কোথা থেকে আসছ গা?' রমণী বললে—'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি।' শুনে অবাক হয়ে

বললাম—'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ওসব আর হল না।' রমণী বললে—'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বৈ কি! ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই তো তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।' জিজ্ঞাসা করলাম—'তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটি বললে—'আমি তোমার বোন হই।' আমি বললাম—'বটে? তাই তুমি এসেছ!' ওরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।"

পরদিন সকালে রামচন্দ্র দেখেন, কন্যার জ্বর ছেড়ে গিয়েছে। তাঁরা আবার ধীরে ধীরে রওনা হলেন। একটু দূর যেতেই অপ্রত্যাশিতভাবে একখানি পাল্কী পাওয়া গেল। ক্রমে পথেরও শেষ হল। রাত ন'টায় সকলে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হলেন।

পত্নী জ্বরগায়ে এসেছে শুনেই শ্রীঠাকুর বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে পৃথক শয্যা রচনা করে দিয়ে শুশ্রূষায় ব্রতী হলেন। আর ক্রমাগত দুঃখ করতে লাগলেন—"তুমি এতদিনে এলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরামোহন) আছে যে, তোমার যত্ন হবে?" নিজের ঘরে তিন চার দিন রেখে, ঔষধ পথ্যাদি খাইয়ে পত্নীকে সারিয়ে তুললেন; এবং পরে নবতে নিজ জননীর নিকট তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

শ্রীঠাকুরের এ ক'দিনের ভালবাসা ও অজস্র আন্তরিকতা শ্রীসারদাদেবীকে অভিভূতা করে ফেললে। তিনি বুঝলেন—পাঁচজনে যা বলছে, সব মিথ্যা। তিনি যেমন ছিলেন, তেমনই আছেন। তাঁর প্রতি শ্রীঠাকুরের টান কমে নি। তিনি নবতে

থেকে উল্লসিতপ্রাণে নিজ শ্বশ্রু ও স্বামীর সেবায় দেহ-প্রাণ-মন ঢেলে দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পত্নীকে ডেকে পাঠান নি। তিনি স্বেচ্ছায় এসেছেন। এসেছেন স্বামীর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতা হতে, স্বামীর সেবাযত্ন করতে। স্বতঃপ্রবৃত্তা হয়ে শ্রীসারদাদেবী যখন দক্ষিণেশ্বরে এলেন, শ্রীঠাকুর বুঝলেন জগন্মাতার ইঙ্গিত। ভাবলেন —দূরে সরিয়ে রাখার সম্বন্ধ তো ওর সঙ্গে আমার নয়! ওকে বাদ দিয়ে আমার জীবনের পরিপূর্ণতা তো হবে না! ঠিক করে ফেললেন নিজের কর্তব্য। তাঁর জীবনের আর একটা দিব্যভাব এখন হতে ক্রমে ফুটে উঠল।

আমরা উল্লেখ করেছি—বিবাহের পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবেশে নিজেই পাত্রীর সন্ধান বলে দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন—সব জেনেই। ঐ পাত্রী কে এবং পাত্রীর সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ, তাঁর বিবাহের প্রয়োজন কি, সব কিছু জেনেই তিনি বিবাহ করেছিলেন। আর বিবাহের পরেই কি সব ভুলে গেলেন? তা বোধ হয় নয়। আমাদের মনে হয়, তিনি জগন্মাতার নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন।

ইতঃপূর্বেই শ্রীঠাকুর তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে সকল নারীই যে জগজ্জননীর রূপ এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।…তারপরে তাঁর বেদান্তসাধনায় সিদ্ধি। নির্বিকল্প অবস্থায় ছ'মাস নিরবচ্ছিন্ন স্থিতি। সর্বভূতে ব্রহ্মোপলব্ধি—ব্রহ্মদর্শন। এর পরেও কি তাঁর ভয়, যাতে তিনি স্ত্রীকে দূরে রেখে দেবেন?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কায়মনোবাক্যে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা

লোকৈষণারূপ সর্বৈষণা ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁর ত্যাগোজ্জ্বল জীবন নিরুপম। কোন ধাতব দ্রব্যের স্পর্শে তাঁর শরীর সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট হয়ে যেত।—"মথুর ও লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী বিষয় লেখাপড়া করে দেবে শুনে, মাথায় যেন করাত বসিয়ে দিয়েছিল। এমন যন্ত্রণা হয়েছিল।"—তাঁরই মুখের কথা।

হাবভাবসম্পন্না সুন্দরীদের মধ্যেও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। আরও কত ঘটনা— যা তাঁর জীবনে ত্যাগের আদর্শকে মহামহিমমণ্ডিত করে রেখেছে।

* * *

তিনি তো শুধু বিভিন্ন ধর্মের সাধককুল বা সন্ন্যাসীদের জন্যই আসেন নি। তিনি এসেছিলেন সকল দেশের, সকল স্তরের মানবের জন্য—বিশ্বমানবের জন্য। তাঁর জীবনটিতে সকলেই পাবে পরিপূর্ণতা। সংসারে কোটি কোটি নরনারী গার্হস্থ্যজীবন যাপন করছে; তাদের জন্য নূতন আদর্শ দেখতে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে। সেই আদর্শকে উপস্থাপিত করবেন বলেই তাঁর বিবাহ। ঐ আদর্শের পূর্ণতাসম্পাদন করবার জন্যই শ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন।...

উপনিষদ বলেছেন—"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"—ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্বলাভ হয়ে থাকে। এ শ্রুতিবাক্য মানবমাত্রের জন্যই। তাতে সন্ন্যাসী ও গৃহীর প্রশ্ন নেই। সেই অমৃতত্বলাভের অন্য পথ। ধর্মভূমি ভারতে এককালে গার্হস্থ্য-আশ্রমও ত্যাগের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালপ্রভাবে সমাজ সে আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে। গৃহস্থ-আশ্রমও যে ভূমানন্দ-

লাভের একটি সোপান—একটা পথ, তা আজ যেন সুদূর অতীতের একটা অস্ফুট প্রতিধ্বনি! অমৃতত্বলাভের সত্যপথে গৃহস্থ-আশ্রমীদের প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ গার্হস্থ্য-জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ নিজের জীবনে দেখিয়ে গেলেন।... "স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।" রামকৃষ্ণজীবন-সমীক্ষণের দ্বারা এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে— আত্মানন্দে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে দৈহিক আনন্দের উর্ধ্বে যেতে হবে। জৈব আনন্দের মোড় ঘুরিয়ে না দিলে ভূমানন্দে পৌঁছান সম্ভব নয়।

অনেকের মনে প্রশ্ন উঠে শ্রীঠাকুরের বিবাহিত জীবন পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল কি? শ্রীরামকৃষ্ণজীবন একাধারে সন্ন্যাসী ও গৃহীর আদর্শ। সেজন্য স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোন জৈব সম্বন্ধ ছিল না।... অখণ্ড ব্রহ্মচর্যই সন্ন্যাসজীবনের একমাত্র ভিত্তি। আর পুরুষ ও নারীর মধ্যে দেহসম্বন্ধনিরপেক্ষ শুধু আত্মার মিলনেও যে গভীর প্রেম সম্ভব, তাও দেখল জগৎ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে। ঐ প্রেমই পরিপূর্ণ প্রেম— বিরজ, বিশুদ্ধ প্রেম। সে প্রেমে উচ্ছলতা নেই, অবসাদ নেই, নেই অতৃপ্তি। ঐ প্রেমই মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে দেবত্বে— দেবীত্বে, পূর্ণানন্দে—আত্মানন্দে।

* * *

দেহস্পর্শটি নেই, শুধু দুটি শুদ্ধ আত্মার মিলন! অথচ তাঁদের পরস্পরের মধ্যে কী গভীর ভালবাসাই না ছিল! সে নিবিড়তা জগতের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক-প্রেমিকার প্রাণেও ঈর্ষার সঞ্চার করে। শ্রীসারদাদেবী পরবর্তী কালে স্ত্রীভক্তদের নিকট গল্প করেছিলেন— "আহা! তিনি আমার সঙ্গে কি ব্যবহারই করতেন! একদিনও

মনে ব্যথা পাবার মত কিছু বলেন নি। কখনো ফুলটি দিয়েও ঘা দেন নি। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমি তাঁর ঘরে খাবার রাখতে গেছি। লক্ষ্মী রেখে যাচ্ছে মনে করে তিনি বললেন—'দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস্।' আমি বল্লুম—'আচ্ছা।' আমার গলার স্বর শুনে তিনি চম্‌কে উঠে বললেন—'কে, তুমি ? তুমি এসেছ বুঝতে পারি নি। আমি মনে করেছিলুম লক্ষ্মী ; কিছু মনে করো নি।' আমি বল্লুম—'তা বললেই বা।' কখনো আমাকে তুমি ছাড়া 'তুই' বলেন নি। কিসে ভাল থাকবো তাই করেছেন।"

শ্রীঠাকুর বলতেন— "ও সারদা। সরস্বতী।... ও সাজতে ভালবাসে।" তিনি নিজে কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারেন না। কিন্তু স্ত্রীর জন্য কত যত্ন করে সোনার গহনা গড়িয়ে দিলেন। ডায়মন-কাটা বালা, তাবিজ, প্রকাণ্ড নথ, আরো কত গহনা—তখনকার দিনে যেমন চলন। আবার পছন্দসই শাড়ী ; কোন কিছুর কমতি নেই—নেই যত্নের এতটুকু ত্রুটী। কত সতর্ক দৃষ্টি ! কোনদিন স্ত্রীর একটু মাথা ধরেছে তো, তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ যে বিবাহিত জীবন যাপন করেছেন, তা দেবতাদের পক্ষেও বিস্ময়কর। মানবেতিহাসের আদি থেকে এমন আর একটি জীবনও খুঁজে পাওয়া যায় না। শুকদেব, আচার্য শঙ্কর, যীশু প্রভৃতির জীবন স্বতন্ত্র। কিন্তু বিবাহিত জীবনে ? তিনিও জানতেন—'রামকৃষ্ণ' একজনই হয়। তাই গৃহীদের জন্য ত্যাগকে আদর্শ রেখে 'মধ্যপন্থা'র বিধান দিয়েছেন— "দুটি-একটি সন্তান হবার পরে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ নিয়ে দু'জনে ভাইবোনের মত থাকবে।" এই তাঁর নির্দেশ, গৃহস্থাশ্রমীদের জন্য।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর স্ত্রীকে পূজা করেছিলেন। এ পূজা পাশ্চাত্ত্য-প্রচলিত নারীর প্রতি সম্মান দেখান নয়। এ পূজা—আত্মার পূজা—মাতৃত্ব ও দেবীত্বের পূজা; নারীকে দিব্য সিংহাসনে বসান, 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত করা।...

এই জ্বলন্তশিখা-প্রাকারবেষ্টিত সাধনপথ স্নিগ্ধ শরীরে ও অক্ষত মনে অতিক্রম করে সিদ্ধির অমৃত-সরোবরে পৌঁছে তিনি হলেন 'রামকৃষ্ণ পরমহংস'। হলেন জগতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ মানব—আধ্যাত্মিক ইতিহাসে মহামানব।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীসারদাদেবীকে নবতে পাঠালেন বটে, কিন্তু রাত্রে তাঁর সঙ্গে শোবার ব্যবস্থা করেছিলেন। একদিন নয়, দু'দিন নয়—আটমাস কাল তাঁরা দিনে রাত্রে একসঙ্গে ছিলেন। সুস্থ সবল পূর্ণযুবা শ্রীঠাকুর। আর নবযৌবনসম্পন্না শ্রীসারদাদেবী। অথচ তাঁদের মেলামেশা চলেছে অতি ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ ভাবে।... তিনি কখনো স্ত্রীর সঙ্গে এমন রসিকতা করতেন যে শ্রীসারদাদেবী হেসে গড়াগড়ি যেতেন।... দিবারাত্র সমভাবে কেটে যাচ্ছে পরমানন্দে। স্বামীর যাবতীয় সেবা শ্রীসারদাদেবী সানন্দে করেন। বিছানা-ঘর পরিষ্কার রাখা, তাঁকে তেল মাখিয়ে নাওয়ান, রান্না করে খাওয়ান, পদসেবা করা—সকলই চলছে সহজ স্বাভাবিক গতিতে। বেশীর ভাগই লোকচক্ষুর অন্তরালে।...

প্রথমদিকে একরাত্রে শ্রীঠাকুর নিজ পত্নীকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিগো, তুমি কি আমায় সংসারপথে টেনে নিতে এসেছ?" —"না, তোমাকে সংসারপথে কেন টানতে যাব?

তোমাকে ইষ্টপথেই সাহায্য করতে এসেছি।”—স্বচ্ছন্দ সরল কণ্ঠে বললেন শ্রীসারদাদেবী।

শ্রীঠাকুরের গার্হস্থ্যজীবন অতি মধুর। দু'জনে কত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে তন্ময় হয়ে যান। কখনো শ্রীঠাকুর নানাভাবে ঘরকন্নার কাজ শেখান, সংসারে পাঁচজনের সঙ্গে কিভাবে চলতে হয়, ব্যবহার করতে হয়, সব কিছু খুঁটিনাটি বলে দেন। কিন্তু রাত হলে তিনি আর আপনাতে আপনি নেই। যত রাত বাড়ে, তত বাড়ে তাঁর ভাব ও সমাধির গভীরতা। কখনো তিনি সারারাত সমাধিস্থ হয়ে থাকেন।

প্রথম প্রথম শ্রীসারদাদেবী ভয়ে আড়ষ্টা হয়ে থাকতেন। পরবর্তী কালে স্ত্রীভক্তদের তিনি বলেছিলেন—“সে যে কী অপূর্ব দিব্যভাবে থাকতেন তা বলে বোঝাবার নয়! কখনো ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখনো হাসি, কখনো কান্না, কখনো একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া! এই রকম সমস্ত রাত! সে কী এক আবির্ভাব-আবেশ! দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপত, আর ভাবতাম—কখন রাতটা পোহাবে! ভাব-সমাধির কথা তখনও তো কিছুই বুঝি নে! এক একদিন তাঁর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেঁদে হৃদয়কে ডেকে পাঠাতাম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হত! তারপর এইরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে, তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন—এইরকম ভাব দেখলে এই নাম শোনাবে, এইরকম ভাব দেখলে এই বীজ শোনাবে। তখন আর তত ভয় হত না, ঐসব শোনালেই তাঁর আবার হুঁশ হত। তারপর অনেক দিন এইভাবে গেলেও, কখন তাঁর কি ভাব হবে

বলে সারারাত্তির জেগে থাকি ও ঘুমুতে পারি নে, একথা একদিন জানতে পেরে, নবতে আলাদা শুতে বললেন।"—এইভাবে চলেছিল তাঁদের দিব্য গার্হস্থ্যজীবনের অপূর্ব মিলন। অচঞ্চল প্রশান্ত প্রেম!...

বৈষ্ণবগ্রন্থে সহজ অটুট অবস্থার বর্ণনায় আছে—"সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি, সাপ না গিলিবে তায়।" ঐপথে সাধন-সংগ্রাম করে যারা সিদ্ধ হয় তাদের অবস্থার বর্ণনা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের দিকে তাকালে এ অবস্থাও অতি সাধারণ কথা বলে মনে হয়। স্ত্রীর প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টি। সকল স্ত্রীতে তাঁর মাতৃবুদ্ধি, জগন্মাতার দর্শন।...তিনি বলেছিলেন—"দুজনেই মায়ের সখী। তা না হলে পরিবারকে নিয়ে আট মাস এক সঙ্গে ছিলাম কেমন করে?" দু'জনেই যুগধর্মসংস্থাপনে পরস্পরের পরিপোষক। এবং একত্র বাসের ভিতর দিয়ে তাঁদের এই পরিচয়টি যেন আরো নিবিড় হয়েছিল।

এক রাত্রে স্ত্রী পাশেই শুয়ে আছে। অকাতরে ঘুমুচ্ছে। শ্রীঠাকুর নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করলেন—"মন, এরই নাম স্ত্রী-শরীর। লোকে একে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলে জানে এবং ভোগ করবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত। কিন্তু একে গ্রহণ করলে দেহেই আবদ্ধ থাকতে হয়; সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না।·· সত্য বল—একে গ্রহণ করতে চাও, না ভগবানকে চাও? যদি স্ত্রীশরীরকে চাও তো এই তোমারই সামনে রয়েছে। গ্রহণ কর।"—এরূপ বিচার করে তিনি স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করতে যেই হাত বাড়ালেন, অমনি তাঁর মন সমাধিপথে বিলীন হয়ে গেল সচ্চিদানন্দ-

সাগরে। সে রাত্রে তাঁর সমাধিভঙ্গ হল না। পরদিন বহু যত্নে তাঁর মন নেমে এসেছিল জাগতিক সত্তায়।

এইভাবে নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে আত্মিক মিলনে, দিব্য দাম্পত্যজীবনের ভিতর দিয়ে দু'জনেই এক সঙ্গে থাকেন। পরস্পরের উপর শান্ত-সমর্পণ। একে অন্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে সদা তৎপর। জীবনের যা কিছু ভাল, সব দিয়েও যেন তৃপ্তি নেই। একে অন্যের অন্তরে বাহিরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছেন। দু'জন আর নেই ; যেন হয়ে গেছেন—এক।

এ সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রাণে স্ত্রীকে পূর্ণ উপচারে ষোড়শী বা ত্রিপুরাসুন্দরীরূপে পূজা করবার ইচ্ছা হল। অবশ্য এর পশ্চাতে তাঁর কোন দিব্যদর্শন বা দৈব ইঙ্গিত ছিল কিনা তার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না।··· ষোড়শাক্ষরমন্ত্রে জগদম্বার পূজা করতে হয় বলে, এ পূজাকে ষোড়শীপূজা বলা হয়।

সন ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের ফলহারিণী-পূজার দিন শ্রীঠাকুর উক্ত ষোড়শীপূজা করেছিলেন। ঐ রাত্রে তাঁর নির্দেশে দেবী-পূজার সম্পূর্ণ আয়োজন গুপ্তভাবে তাঁর ঘরেই করা হয়। অবশ্য কালীমন্দিরে বিশেষ পূজাদি যেমন হবার, তাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্রীঠাকুর পূর্ব্ব হতেই শ্রীসারদাদেবীকে পূজাকালে তাঁর ঘরে উপস্থিত থাকার জন্য বলে রেখেছিলেন। যথাসময়ে তিনি শ্রীঠাকুরের ঘরে সমাগতা হলেন। রাত ন'টার পরে শ্রীঠাকুর বসলেন পূজায়। শ্রীসারদাদেবী শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে বসলেন দেবীর আসনে—আলপনাভূষিত পীঠে। পূজা আরম্ভ হল। শ্রীঠাকুর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁকে ষোড়শোপচারে পূজাকালে শ্রীসারদাদেবী

গভীর সমাধিমগ্না হলেন। অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে শ্রীঠাকুরের মনও লীন হল সমাধির অতল তলে। 'সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সঙ্গে আত্মস্বরূপে মিলিত একীভূত হলেন।'

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত। এমন সময় শ্রীঠাকুরের মন ক্রমে নেমে এল অর্ধবাহ্যদশায়। তিনি দেবীর চরণে আত্মনিবেদন করলেন। জপমালাসহ সকল সাধনার ফল দেবীপাদপদ্মে অর্পণ করে তিনি প্রণত হলেন।

পূজা শেষ হল। শ্রীসারদাদেবী স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা হলেন। হলেন তিনি জগজ্জননী। তাঁর ভিতর প্রকটিত হল—বিশ্বমাতৃত্বের অকুণ্ঠ চেতনা।

ষোড়শীপূজার পরেও শ্রীমা প্রায় এক বৎসর শ্রীপরমহংসদেবের কাছে ছিলেন। তিনি আপ্রাণ সেবা করে যেতেন শ্রীঠাকুরের ও শ্রীঠাকুরের মায়ের। সেবাতেই তাঁর পরম তৃপ্তি। তিনি যে 'মা'!

১৪

সাধারণতঃ প্রচার বলতে যা বুঝা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে জাতীয় কোন প্রচার কখনো করেন নি। তাঁর কাজ ছিল ভাবরাজ্যে। তিনি স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তিবলে জীবকল্যাণসাধন করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—"আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান; আবার বৈষ্ণব, বেদান্ত—এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম, সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলে আসছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।" তাঁর সাধন ও সিদ্ধি সবই নূতন আদর্শস্থাপনের জন্য।

আদ্যাশক্তি কর্তৃক 'ভাবমুখে' অবস্থান করে জীব-জগতের কল্যাণে ব্রতী হবার জন্য আদিষ্ট হয়ে তাঁকে প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলিত হতে প্রথম দেখা যায়। গীতাতে আছে—'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ' ইত্যাদি। সেজন্য তিনি বিভিন্ন বিভূতিমান ও উর্জিত সাধককুলের ভিতর শক্তিসঞ্চার করে তাঁর উদার ভাব তাঁদের দিতে আরম্ভ করেন। এভাবে কত শত সাধক যে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসঙ্গে আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করেছিল, তার ইয়ত্তা নেই। তিনি ভাববন্যায় ধীরে ধীরে সব পরিপ্লাবিত করে দিলেন। জগতে যে বিশেষ ভাবধারা দেবার জন্য 'শ্রীরামকৃষ্ণ'রূপে তাঁর দেহধারণ, আরম্ভ হল তারই অপ্রতিহত অগ্রগতি।

এ সম্পর্কে তৎকালীন ব্রাহ্মধর্মাচার্য কেশবচন্দ্র সেন ও ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। সন ১২৮১ সালে (১৮৭৫ খ্রীঃ) কেশবচন্দ্রের সঙ্গে বেলঘরের বাগানে প্রথম সাক্ষাতের জন্য যাবার পূর্বে শ্রীঠাকুর ভাবাবস্থায় সদলবলে কেশবকে দেখেছিলেন।

জগদম্বার ইঙ্গিতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে যান। ঐ সময় হতে শ্রীঠাকুরের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উদারভাব কেশবের জীবনে স্নিগ্ধ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি ঐ দেবমানবের সঙ্গলাভ করে এতই মুগ্ধ হলেন যে, প্রথম মিলনের দিন হতেই 'রামকৃষ্ণ-জীবনকে' তিনি যতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, তা মুক্তকণ্ঠে উপাসনাকালে, বক্তৃতায় এবং তৎচালিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে সর্বসমক্ষে প্রচার করতে লাগলেন। ঐ প্রচারের ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাংলার ও ভারতের ইংরেজীশিক্ষিত সমাজ এবং ক্রমে দেশবিদেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ' প্রচারিত হতে লাগল।

১৮৭৫ সালের ১৫ই মার্চ শ্রীঠাকুর একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে বেলঘরের বাগানে কেশবের সঙ্গে দেখা করতে যান। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। তাঁর অতি সাধারণ পোশাক; পরিধানে কাপড় মাত্র, খালি-গা। কোঁচার খুঁটটি কাঁধে ফেলা। শরীর শীর্ণ। রুক্ষ চেহারা। কেশব সঙ্গীদের নিয়ে তখন বাগানের পুকুরের ঘাটে স্নানের উদ্যোগ করছিলেন। সকলেই শ্রীঠাকুরকে দেখে প্রথমটা সাধারণ লোক মনে করেন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁদের সে ধারণা অপার বিস্ময়ে পরিণত হল। ··· নানা ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গের

পর— "কে জানে মন কালী কেমন, ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন"— ইত্যাদি গানটি গাইতে গাইতে শ্রীঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। তাঁর ভাবাবস্থাকে প্রথম সকলেই নিছক ভান মনে করেন। কিন্তু অর্ধবাহ্যাবস্থায় এসে শ্রীঠাকুর যখন মত্ত হয়ে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অতি সরল ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, তখন সকলেই এত মুগ্ধ হল যে ভুলে গেল স্নান-আহারাদির কথা। তাঁর অমৃতময়ী বাণী তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে ক্রমে সান্ধ্য উপাসনার সময় উপস্থিত দেখে সকলের হুঁশ হয়।

ঐ প্রথম মিলনের পর হতে ১৮৮৪ সালের জানুয়ারীর প্রথম-ভাগে কেশবের শরীরত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় সুদীর্ঘ দশ বৎসরকাল কেশবচন্দ্র বহুবার শিষ্যবর্গসহ দক্ষিণেশ্বরে শ্রীপরমহংসদেবের কাছে এসেছিলেন এবং কতবার যে তাঁকে বেলঘরে, কমলকুটীরে ও ব্রাহ্মসমাজে নিয়ে গিয়েছিলেন তার ইয়ত্তা নেই। সংখ্যার দিক দিয়ে ঐ মিলন যেমন বহুবার হয়েছিল, অন্তরঙ্গতা ও প্রভাবের দিক থেকেও ঐ মিলন হয়েছিল তেমনি অতি নিবিড় ও সুগভীর।

শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুষ্ঠিত উদার ধর্মভাবের প্রভাব ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়ে সমগ্র কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থানের বিভিন্ন ধর্মের উপাসকদের জীবনে অভিনব বিপর্যয়ের সৃষ্টি করল। সকলেই দেখতে পেল নূতন আলোক শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে— আর দেখল ত্যাগের দীপ্তি। বুঝতে পারল— ভগবানলাভ করতে হলে কত পবিত্রতা, কত ত্যাগ, উদারতা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন নূতন ধর্ম প্রচার করতে বা নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে জগতে আসেন নি। তিনি এসেছিলেন নবশক্তি সঞ্চার

করে সকল ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবার জন্য। সমন্বয়মূর্তি তাঁর জীবনটি ছিল সকল ধর্মের মিলনভূমি। সেজন্য সকল ধর্মাবলম্বীরাই তাঁর চরণতলে বসে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত এবং তাঁর ভিতর পেত নিজ নিজ ভাবের অভাবনীয় পূর্ণতা।

কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থানের বিভিন্ন সাধকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সংকীর্ণতার আগড় ভেঙ্গে দিয়ে সকলের প্রাণে উদারভাব উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তার একটি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় তৎকালীন কেশব-পরিচালিত 'নিউ ডিস্‌পেন্সেশন' কাগজে। এখানে তার বঙ্গানুবাদ সন্নিবেশিত হল।— 'নববিধান' ৮ই জানুয়ারী, ১৮৮২। আশার আলো:— কলিকাতার নাগরিক জীবন ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা সম্বন্ধে বর্তমানে যাঁরাই লক্ষ্য করেছেন— তাঁরাই দেখে বিস্মিত হবেন যে, দক্ষিণেশ্বরের ভক্তিভাজন পরমহংস হিন্দু এবং নববিধানের ব্রাহ্মদের মধ্যে কী এক অপূর্ব সংযোগ স্থাপন করে চলেছেন! সম্প্রতি অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুগৃহে কতিপয় ধর্মসভার আয়োজন হয়েছিল। সেখানে দেখতে পাই— উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ একপ্রাণ হয়ে সম্মিলিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও প্রেমভক্তির ঐক্যভাব দেখে আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হয়েছি। সাধারণতঃ ঐসকল সভার প্রধান অঙ্গ— ঈশ্বরের স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা, পরমহংসদেবের ধর্মালোচনা এবং উন্মাদনাপূর্ণ প্রাণমাতান সংকীর্তন।··· ঐসকল ধর্মসভায় তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, শিক্ষিত যুবক, গোঁড়া বৈষ্ণব এবং যোগিগণ সমবেত হন দলে দলে। ···ঐসকল স্থানে আমরা স্বতঃই পেয়েছি জীবন্ত প্রেম-ভক্তির

উদ্দীপনা। স্বর্গীয় আনন্দের বিশাল তরঙ্গে সকল নরনারীকে যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে! (সে এক অভিনব দৃশ্য!)

"অতি আশ্চর্যজনক এর প্রভাব। বিভিন্ন ধর্মের মতবিরোধ প্রেমভক্তির খরস্রোতপ্রবাহে কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়ে গেছে! ধর্মের এই একত্ব এবং প্রেমের অপূর্ব মিলন শেষে কতদূর গিয়ে পৌঁছবে তা কে বলতে পারে? ভগবানের কার্যধারা অচিন্তনীয়।"

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন মথুরবাবুকে বলেছিলেন—"মা সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখানকার ঢের সব অন্তরঙ্গ আছে; তারা সব আসবে। এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে, প্রেমভক্তি লাভ করবে। (নিজের শরীর দেখিয়ে) এ শরীরটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবেন। জগতের অনেক কল্যাণ করবেন। তাই এ খোলটা এখনো ভেঙ্গে দেন নি।..."—সে অনেক দিন পূর্বের কথা। ইতোমধ্যে নরলীলাসম্বরণের সময়ও বোধ হয় তিনি জানতে পেরেছিলেন। (সে সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব।) অথচ তাঁর অন্তরঙ্গ ও বার্তাবহগণ তখনো এল না দেখে তিনি ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়লেন।

সে সময়কার অবস্থার কথা তিনি পরে বালক-ভক্তদের বলেছেন —"তোদের সব দেখবার জন্য প্রাণের ভিতরটা তখন কেমন করে উঠত! এমনভাবে মোচড় দিত যে, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়তাম, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হত। লোকের সামনে, কি মনে করবে ভেবে, কাঁদতে পারতুম না। কোনও রকমে সামলে থাকতাম!

আর যখন দিন গিয়ে রাত আসত, মা'র ঘরে, বিষ্ণুঘরে আরত্তির বাজনা বেজে উঠত, তখন আর একটা দিন গেল— তোরা এখনো এলি নি ভেবে আর সাম্‌লাতে পারতুম না; কুঠির ছাদে উঠে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্, আয়রে'— বলে চেঁচিয়ে ডাকতুম ও ডাকছেড়ে কাঁদতুম। মনে হত— পাগল হয়ে যাব! তারপর কিছুদিন পরে তোরা যখন সব একে একে আসতে আরম্ভ করলি, তখন ঠাণ্ডা হই। আর আগে দেখেছিলাম বলে, তোরা যেমন যেমন আসতে লাগলি অমনি চিনতে পারলাম।"

বিচিত্র দর্শন— অদ্ভুত তার সফলতা! ঐ স্বর্গীয় যাদুকর কুঠির ছাদে আধ্যাত্মিক বায়ুমণ্ডলে এমন আশ্চর্য স্পন্দনের সৃষ্টি করেছিলেন যে, তা সমসুরে বাঁধা কয়েকটি মাত্র আত্মাতে স্পন্দিত হল। তারাও অনুভব করল এক অব্যক্ত আকর্ষণ। অথচ তখনো জানে না, কে ডাকছে— কোথা থেকে আসছে সে ডাক!

এসব ১৮৭৫ বা ৭৬-এর ঘটনা। তিনি অন্তরঙ্গদের আহ্বান করেই ক্ষান্ত হন নি। যাতে চিহ্নিত ভক্তগণ তাঁর অবস্থিতি জানতে পারে, সেজন্য জগন্মাতার ইঙ্গিতে ব্রাহ্মসমাজ ও অন্যান্য ধর্মপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাঁর দিব্যভাব প্রকটিত করতে লাগলেন।

তাঁর ভিতর এসেছিল দিব্য প্রেরণা— ধর্মচেতনা জাগিয়ে দেবার দুর্বার উন্মুখতা। যেখানেই ভগবানের নামগুণগান হয়, সেখানেই তিনি অযাচিতভাবে উপস্থিত হচ্ছেন। যেকোন লোক ঈশ্বরের নাম করছে, ধ্যান করছে, তিনি যাচ্ছেন তারই কাছে— সকলধর্মাবলম্বী সাধকদের জীবনেই পুষ্টিবিধানের জন্য।

যুগাবতারের ভাবপ্রচারের অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টিও হয়েছিল দৈব ইচ্ছায়। শ্রীঠাকুর এক সময়ে বলেছিলেন—"এই যে সব দেখছ, এত হরিসভা-টভা এসব জানবে (নিজ শরীর দেখিয়ে) এরই জন্য। এসব কি ছিল? কেমন এক রকম সব হয়ে গিয়েছিল। এইটে আসার পর হতে এসব এত হয়েছে। ভিতরে ভিতরে একটা ধর্মের স্রোত বয়ে যাচ্ছে।..."

শ্রীঠাকুরের দৈব আহ্বান ব্যর্থ হয় নি। সন ১৮৭৫ সাল হতে তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ একে একে দক্ষিণেশ্বরে আসতে আরম্ভ করেন * এবং তাঁর দিব্যসঙ্গ লাভ করে অল্পদিনের মধ্যেই নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবনে নবচেতনা অনুভব করে ধন্য হলেন। শ্রীঠাকুরও প্রথম দিন হতেই তাঁদের চিরপরিচিতের ন্যায় গ্রহণ করেছিলেন এবং সকলের প্রাণে আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চার করে খুলে দিলেন পরমানন্দপ্রাপ্তির দ্বার। অবাক্ ও মুগ্ধ হয়ে গেলেন তাঁরা। এত ভালবাসা, এমন অযাচিত দয়া! অমন অপার্থিব প্রেম, এত অভয়, এত আনন্দ! অকিঞ্চনের প্রতি অহৈতুকী কৃপানিধি কে ইনি?

* দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্তদের আগমনের সন ও ক্রম 'কথামৃত' প্রথম ভাগে পাওয়া যায়:—বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ঐ সময় (১৮৭৫ খ্রীঃ) আসিতে থাকেন। সিঁথির গোপাল (অদ্বৈতানন্দ) ও মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এই সময়ে পরে পরে শ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়াছিলেন।... রাম ও মনোমোহন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আসিয়া মিলিত হইলেন। কেদার, সুরেন্দ্র তার পরে আসিলেন। চুনী, লাটু (অদ্ভুতানন্দ), নৃত্যগোপাল, তারকও (শিবানন্দ) পরে আসিলেন। ১৮৮১-র শেষভাগ ও ১৮৮২-র প্রারম্ভ—এই সময়ের মধ্যে নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ), রাখাল (ব্রহ্মানন্দ), ভবনাথ, বাবুরাম (প্রেমানন্দ),

—তাঁরা ভাবলেন অবাক বিস্ময়ে। বলতে লাগলেন পরিচিতদের অপরিচিতদের—'চিনির পাহাড়ের' সন্ধান। আত্মীয়-পরিজনবর্গকে ক্রমে নিয়ে আসতে লাগলেন দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর সুশীতল স্নিগ্ধ ছায়ায়।

শাস্ত্রে আধিকারিক পুরুষদের জাতিস্মর বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি অবতারপুরুষদের জীবনে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও জানতেন—যিনি রামরূপে, কৃষ্ণরূপে এবং অন্যান্য অবতাররূপে দেহধারণ করেছিলেন, তিনিই এসেছেন 'রামকৃষ্ণদেহে'। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে যেমন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যাবতীয় আধ্যাত্মিক ভাবরাশির সম্মিলন দেখা যায়, তেমনি তাঁর বার্তাবহদের মধ্যেও দেখতে পাই পূর্ব পূর্ব অবতারদের পার্ষদকুলের সমাবেশ। কেউ অখণ্ডের ঘরের, কারোর জন্ম রাম বা বিষ্ণুর অংশে, কেউ ব্রজের রাখাল, কেউ জন্মেছেন কৃষ্ণসখা

বলরাম, নিরঞ্জন (নিরঞ্জনানন্দ), মাষ্টার, যোগীন (যোগানন্দ) আসিয়া পড়িলেন। ১৮৮৩-৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিশোরী, অধর, নিতাই, ছোট গোপাল, বেলঘরের তারক, শরৎ (সারদানন্দ), শশী (রামকৃষ্ণানন্দ)। ১৮৮৪ সালের মধ্যে সান্ন্যাল, গঙ্গাধর (অখণ্ডানন্দ), কালী (অভেদানন্দ), গিরিশ, সারদা (ত্রিগুণাতীতানন্দ), কালীপদ, উপেন্দ্র, দ্বিজ ও হরি (তুরীয়ানন্দ)। ১৮৮৫-র মধ্যে সুবোধ (সুবোধানন্দ), ছোট নরেন, পল্টু, পূর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ আসিলেন। এইরূপে হরমোহন, নবাইচৈতন্য, হরিপ্রসন্ন (বিজ্ঞানানন্দ) ক্রমে আসিয়া পড়িলেন।

'লীলাপ্রসঙ্গ', 'পুঁথি' ও 'ভক্তমালিকা' গ্রন্থাদিতে ভক্তগণের দক্ষিণেশ্বরে আগমন-সময় এবং 'কথামৃতে' উল্লিখিত সময়ের মধ্যে অল্প-বিস্তর ব্যতিক্রম দেখা যায়।

অর্জুনের বা শ্রীরাধার অংশে, কেউ যীশুর বার্তাবহ, বুদ্ধের সাঙ্গোপাঙ্গ, চৈতন্যের পার্ষদ, আবার কেউ বা অদ্বৈতজ্ঞানী। ব্রহ্মশক্তি এবং অতীতের বিভিন্ন অবতারগণ যেমন বর্তমান লীলা-পুষ্টির জন্য ভাবজ্যোতিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেহে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন, তেমনি সেই সেই অবতারগণ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণকল্পে সর্বভাবরূপ 'যত মত, তত পথ'—এই সত্যধর্মপ্রচারের জন্য নিজেদের লোকসবও পাঠিয়েছিলেন।

শ্রীঠাকুর একদিন বলেছিলেন—"এর ভিতর যিনি আছেন আগে থাকতে জানিয়ে দেন, কোন্ থাকের ভক্ত আসবে। যেই দেখি গৌরাঙ্গরূপ সামনে এসেছে অমনি বুঝতে পারি, গৌরভক্ত আসছে। যদি শাক্ত আসে, তা হলে শক্তিরূপ, কালীরূপ দর্শন হয়।..."

আবার পার্ষদদের প্রত্যেকের আগমনের পূর্বে তিনি ভাবাবেশে তাদের স্বরূপ সম্বন্ধেও জানতে পারতেন। সে এক অতি আশ্চর্য ব্যাপার! স্থানাভাবে সকল পার্ষদের স্বরূপসম্বন্ধে শ্রীঠাকুর যা যা বলেছিলেন তা এ গ্রন্থে আলোচনা করা সম্ভব হবে না। দুই-এক জন পার্ষদ সম্বন্ধে আংশিক উল্লেখ করেই আমাদের তৃপ্ত থাকতে হবে।

রাখালের আগমনের পূর্বে শ্রীঠাকুরের যে দর্শন হয়েছিল সে সম্বন্ধে তিনি বলেন,— "রাখাল আসবার কয়েকদিন পূর্বে দেখেছি, মা একটি বালককে এনে সহসা আমার কোলে বসিয়ে দিয়ে বললেন—'এটি তোর ছেলে!' শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠে বললাম —'সে কি! আমার আবার ছেলে কি?' তিনি তাতে হাসতে হাসতে বুঝিয়ে দিলেন—'সাধারণ সাংসারিকভাবের ছেলে নয়,

ত্যাগী মানসপুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল এসে উপস্থিত হল। বুঝলাম এই সেই বালক।"

তিনি বলেছিলেন—রাখাল ব্রজের রাখাল।... নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যখনই জানতে পারবে তখনই শরীর ছেড়ে দেবে।

নরেন্দ্রনাথের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বেও তাঁর এক অলৌকিক দর্শন হয়। তিনি দেখেছিলেন—সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক ঋষি যুগধর্ম-প্রচারের সাহায্যের জন্য দেহধারণ করে আসছেন। তিনি বলেছিলেন, "নরেন্দ্রকে দেখামাত্র বুঝেছিলাম—এই সেই ঋষি।"

আশ্চর্য অবতার, অভিনব পার্ষদ, অভাবনীয় মিলন ও অপূর্ব সফলতা!

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের শেষের ছ'টি বৎসর যেন পুরোপুরি ছ'টি যুগ। যে মহাশক্তির ইঙ্গিতে তিনি অত্যুগ্র সাধনা করে ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সে শক্তির ইচ্ছায়ই এখন অমৃতের সরোবর থেকে নিঃশেষে উজাড় করে বিতরণ করতে লাগলেন সেই ভূমানন্দ। 'চিনির পাহাড়'কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ছড়িয়ে দিলেন আপামর সাধারণে। আনন্দের লুট পড়ে গেল। যে যত পারল লুটে নিল। যারা অক্ষম, অসমর্থ, আসতে পারল না, কৃপামূর্তি রামকৃষ্ণ দ্বারে দ্বারে জনে জনে পৌঁছে দিয়ে এলেন সেই অমৃতরস।

জননী যেমন সন্তানকে স্তন্যপান করাবার জন্য ব্যাকুলা হন, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুল হলেন সেই ব্রহ্মকৃপা-বারিতে সকলকে অভিষিক্ত করতে। তিনি অবিচারে অভিসিঞ্চিত করে যাচ্ছেন! তিনি বলেছিলেন—"মলয়ের হাওয়া বইলে যেমন সব কাঠ (ঘাস ও বাঁশ ছাড়া) চন্দন হয়ে যায়, তেমনি (এবারও)…।"

শ্রীঠাকুর একদিন ভাবাবেশে বললেন— "এখন মাকে বলছিলাম, আর বকতে পারি নে। আর বলছিলাম—মা, যেন একবার ছুঁয়ে দিলে লোকের চৈতন্য হয়! যোগমায়ার এমনি মহিমা—তিনি ভেলকি লাগিয়ে দিতে পারেন। …যোগমায়া—যিনি আদ্যাশক্তি, তাঁর একটি আকর্ষণী শক্তি আছে। আমি ঐ শক্তির আরোপ করেছিলাম।"

কী এক অজ্ঞাত আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতে লাগল

রাজামহারাজা, দুঃখী-কাঙ্গাল, পণ্ডিত-মূর্খ, ভক্ত-জ্ঞানী, হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম-খ্রীষ্টান, সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, দোকানদার, ব্রাহ্মণ-মেথর, পতিত-পতিতা, বৃদ্ধ-বনিতা! কে তাদের আকর্ষণ করে আনত? কেন আসত সকলে ঐ পূজারী ব্রাহ্মণের কাছে?

সকলের জন্য অবারিত দ্বার—প্রসারিত কর। শ্রীরামকৃষ্ণের বীরভক্ত গিরীশ শেষজীবনে বলেছিলেন—পাপ রাখবার এতবড় স্থান আছে জানলে আরও অনেক পাপ করে নিতুম…। সে আশ্চর্য যাদুকর প্রত্যেক জীবনটিকে নিয়ে ভেলকি খেলতেন। নিরক্ষর মেষপালকের নিরক্ষর পুত্র, তাঁর স্পর্শমাত্র সে হয়ে গেল মহাজ্ঞানী—সর্ববেদজ্ঞ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিকে নির্বিকল্প-সমাধি থেকে টেনে এনে নিয়োজিত করলেন নরনারায়ণ-সেবায়, আর বিশ্বধর্মপ্রচারে! ধর্মহীনকে তিনি ধর্ম দিলেন, নাস্তিককে আস্তিক করলেন; শুষ্ক প্রাণে আনলেন প্রেমের বন্যা।

তিনি অন্তর দেখে কে কি ভাবের লোক তা জেনে ভক্তদের সে-সে ভাবের সাধন দিতেন, সেই ভাবে চালিত করতেন সিদ্ধির মন্দিরের দিকে। তিনি কারো ভাব নষ্ট করতেন না, সকলকেই নিয়ে যেতেন নিজ নিজ পথে—সেই আনন্দধামে। তিনি বলতেন—"লোকে কাঁচের আলমারীর ভিতরকার সব জিনিস যেমন পরিষ্কার দেখতে পায়, তেমনি আমিও কোন লোক এলে তার ভিতরটা সব দেখতে পাই।"

তিনি তাঁর কৃপাহস্ত বুলিয়ে প্রত্যেকের হৃদয় থেকে সযত্নে মুছে দিতেন পাপ-তাপ, গ্লানি ও মলিনতার চিহ্ন। সস্নেহে বলতেন—"যে নিজেকে পাপী পাপী ভাবে, সে পাপীই হয়ে যায়।

চাই জলন্ত বিশ্বাস। কি! আমি ভগবানের নাম নিয়েছি, আমার আবার পাপ কি?"—তাঁর সত্যবাণী মন্ত্রশক্তির মত কাজ করত। তাঁর স্পর্শ পেয়ে সকলেই নিজেকে সহজ সুন্দর অনুভব করত।

তিনি ছিলেন করুণার সাগর। সকলের প্রতি সমান করুণা, সমান দয়া। তাতে সমর্থ-অসমর্থের বিচার নেই। তিনি সকলেরই ত্রাণকর্তা কাণ্ডারী। 'সব মায়া হ্যায়'—যারা বলে, তাদের দলের তিনি নন। জীবের দুঃখে তিনি কাঁদতেন, প্রাণে বেদনা অনুভব করতেন শোকাতুরের জন্য।

কিন্তু যে-সব বালকভক্তকে ত্যাগের পথে চালিত করে তাঁর ভাবী বার্তাবহরূপে গড়ে তুলবেন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা সাধনা সবই স্বতন্ত্র। তাদের জীবনটি হবে অনাঘ্রাত ফুলের মত পবিত্র। বলতেন —"ওরে, কাকে-ঠোকরান ফল দেবসেবায় লাগে না। তোদের জীবন স্বতন্ত্র—দেবকার্যে উৎসৃষ্ট জীবন।" তাদের উপদেশ দিতেন—"মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব।...মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী, কোন ভোগের গন্ধ নেই।...সন্ন্যাসীর নির্জলা একাদশী...।"

শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পার্ষদগণ সাধারণ জীবের মত প্রারব্ধের বশে জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁরা এসেছেন দেবকার্যে, জীবকল্যাণ-ব্রতসাধনে। তাঁদের অন্তরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে তিনি কখনও বলতেন—"...এ-সব ছোকরারা নিত্যসিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে।...অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারো বা শেষ জন্ম।...নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক। একটু সাধন করলেই নিত্যসিদ্ধ ভগবানকে লাভ করে; আবার সাধন না করলেও পায়।"

তাঁর শিক্ষার ধারা ছিল সম্পূর্ণ অভিনব।—"মানুষ-গুরু মন্ত্র দেয় কানে, আর জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।" তিনিও ভক্তদিগের প্রাণে তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি সংক্রামিত করে তাদের কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগ্রতা করে দিতেন। অধিকারিভেদে তিনি তাদের বক্ষ, জিহ্বা বা শরীরের অন্য কোন স্থান ভাবাবেশে স্পর্শ করতেন। ঐ শক্তিপূর্ণ স্পর্শে তাদের মন সংহৃত ও অন্তর্মুখ হয়ে যেত, এবং সঞ্চিত সুপ্ত ঐশী ভাব জাগ্রত হয়ে উঠত। ফলে কারো হত দিব্যজ্যোতিঃ অথবা দেবদেবীর জ্যোতির্ময় রূপ-দর্শন। কারো হত গভীর ধ্যান ও অভূতপূর্ব আনন্দের অনুভূতি। কেউবা ঈশ্বর-লাভের জন্য দুঃসহ ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে পড়ত। আবার কারো জীবনে উপস্থিত হত দিব্য ভাবাবেশ বা সমাধির তন্ময়তা।

রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্য প্রভৃতি দেবমানবদের জীবনেতিহাসে উল্লেখ দেখা যায় যে তাঁরা ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্র বহু অসমর্থকে সমর্থ করেছিলেন। চক্ষুহীনকে দিয়েছিলেন চক্ষু, জ্ঞানহীনকে আত্মজ্ঞান। ভক্তিহীনকে ভগবদ্‌ভক্তি। পাপীকে করেছিলেন নিষ্পাপ। বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তিসংক্রামণের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তা যেন অতীতের সব ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে।

শ্রীঠাকুরের শক্তিসঞ্চারের ফলে ভক্তদের অলৌকিক দর্শন, ভাবাবেশ ও গভীর ধ্যান হতে লাগল। তাঁর কাছে যে আসে, সেই আনন্দে ভরপুর হয়ে যায়। ভক্তদের ভাবভক্তি যেন উদ্বেলিত হয়ে পড়ছে। 'উর্জিতা ভক্তি' লাভ করল অনেকে—ভাবে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়।

ঐ মহাশক্তির আকর্ষণে, এখন আর শুধু কলিকাতা বা পার্শ্ববর্তী স্থান নয়—বহু দূর দূর স্থান হতে ভক্ত, অনুরাগী ও মুক্তিকামীর দল দক্ষিণেশ্বরে সমবেত হতে লাগল। তিনি একদিন ভাবাবেশে বলেছিলেন—"যারা আন্তরিক ধ্যানজপ করেছে, তাদের এখানে আসতেই হবে।"

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যে-সকল ভক্ত সমবেত হয়েছিল, তাঁদের সাধারণভাবে দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই মুক্তিকামী, আর ছিল অন্তরঙ্গ। পূর্বোক্ত ভক্তের সংখ্যাই অধিক। অন্তরঙ্গ পার্ষদ কয়েকজন মাত্র।

ঐ মুক্তিকামীদের মধ্যে ছিল নানাভাবের সাধক। ঐ সকল সাধক-ভক্তকে মুক্তির অমৃতধামে পৌঁছাবার জন্য তিনি কতই না কষ্ট স্বীকার করেছেন! তাঁকে শত শত জীবের পাপভার নিতে হয়েছিল! কেউ কেউ স্পর্শ করলে তিনি বেদনায় চিৎকার করে উঠতেন। বলতেন—"সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।" এত কষ্ট সত্ত্বেও তিনি জীবোদ্ধার করে যাচ্ছেন! জীবকল্যাণের জন্যই যে তাঁর দেহধারণ। কিন্তু এক-এক সময় যেন আর পেরে উঠেন না। তাই জগন্মাতার উপর অভিমান করে বলতেন—"জলো দুধ অনেক জ্বাল দিতে হয়, অনেক কাঠ পুড়ে যায়। আর যে পারিনে, মা! এক সের দুধে চার সের জল। ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে চোখ যে জ্বলে গেল!"

আর যাঁরা অন্তরঙ্গ পার্ষদ—তাঁর যুগধর্মপ্রচারের সহায়করূপে এসেছেন, তাঁরা মুক্তিকামী নন। তাঁদের সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর ভাবাবস্থায় একদিন বলেছিলেন—"(যারা) অন্তরঙ্গ তাদের দু'টি জিনিস

জানলেই হল; প্রথম আমি (নিজের দিকে দেখিয়ে) কে? তারপর তারা কে, আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি?" আরো বলেছিলেন,—"ছোক্‌রাদের অনেকেই নিত্যসিদ্ধ। জন্ম থেকেই ঈশ্বরের দিকে টান।··· ওদের কেমন জান? ফল আগে, তারপর ফুল। আগে দর্শন—তার পর গুণমহিমা-শ্রবণ, তারপর মিলন। তবে নিত্যসিদ্ধ ভগবানলাভ করার পর সাধন করে। ···যারা অন্তরঙ্গ তাদের মুক্তি হবে না।···"

শ্রীঠাকুরের ভিতর ঐশী শক্তির এমন আতিশয্য ও বিকাশ দেখা দিয়েছিল, যেন তাঁকে কেন্দ্র করে ডেকেছিল আনন্দের বান। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঐ ছোট্ট ঘরটি যেন ঐশী ভাবের 'শক্তিকেন্দ্র'! সেখান হতে দিবারাত্র সমভাবে বিকীর্ণ হত আধ্যাত্মিক আলোক। যে একবার আসত, সেই মুগ্ধ হয়ে যেত।

তিনি কখনো হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম করছেন, কখনো ভাবাবেশে কথা বলেন—জগন্মাতার সঙ্গে। কখনো করেন মধুর কণ্ঠে মায়ের গান—আবার ভক্তসঙ্গে মত্ত হয়ে সংকীর্তন। খোল-করতাল বাজে। তাঁর কি মনোহর ভাবময় নৃত্য! কখনো হুঙ্কার ছেড়ে উন্মত্তের মত নৃত্য করতে করতে গভীর সমাধিমগ্ন হন। সব স্থির। তাঁর মুখমণ্ডল থেকে আনন্দ যেন বিচ্ছুরিত হয়। ভক্তেরা অবাক হয়ে দেখে সেই সমাধি-চিত্র। ভক্তদেরও ভাবাবেশ হয়, কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ জড়বৎ স্তব্ধ, নিস্পন্দ। আবার কেউ আনন্দভরে নৃত্য করে। শ্রীঠাকুর ভাবাবেশে কাউকে স্পর্শ করলেন। ফলে তিনি গভীর সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন। আনন্দের মলয়হিল্লোলে সকলের প্রাণ-মন যেন দুলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ কোন দেশ বিশেষ, জাতি বিশেষ বা ধর্ম বিশেষের জন্য আসেন নি। তিনি এসেছিলেন বিশ্বমানবের জন্য, বিশ্বধর্মের জন্য। 'যত মত, তত পথ'—বিশ্বধর্মের এই নবরূপ।

সকল ধর্মই সত্য। সকল ধর্মই মানবাত্মার অতীন্দ্রিয় সত্তাতে পৌঁছবার এক-একটি সত্যপথ। এই 'যত মত, তত পথ'-রূপ ধর্মের পতাকাতলে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান এবং মানবজাতি ও মানবসভ্যতার প্রগতির সঙ্গে ভবিষ্যতে যত ধর্মের উদ্ভব হবে, সকল ধর্ম-ধর্মীই পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে। এবং তাদের আদর্শ হবে—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা: "যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং (নিজের শরীর দেখিয়ে) এই শরীরে এসেছেন।"—যে শক্তি যুগে যুগে আবির্ভূত হচ্ছেন রামরূপে, কৃষ্ণরূপে, সে শক্তিই মূর্ত হয়েছেন 'রামকৃষ্ণরূপে'।

৺চণ্ডীতে আছে যে, অসুরবধের প্রস্তুতির জন্য দেবগণ দেবীকে নিজ নিজ আয়ুধে সজ্জিতা করেছিলেন। রামকৃষ্ণ-অবতারেও দেখতে পাওয়া যায়,—ব্রহ্মজ্যোতিঃ হতে আরম্ভ করে শিব-কালী, রাম-কৃষ্ণ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য এবং আরও অনেক দিব্যদেহধারী শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর জ্যোতির্ময় দেহে লীন হয়ে গিয়েছেন।

অবতারগণ প্রত্যেকেই বিশেষ শক্তির আধার, এবং সকলেই বিভিন্ন ভাবপ্রতীক ও সত্যের মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর

সকলে সঙ্গত হওয়ার ফলে, 'রামকৃষ্ণ' রূপান্তরিত হলেন—সর্ব ভাবের মূর্তবিগ্রহ ও আধ্যাত্মিক শক্তিকেন্দ্ররূপে। সমগ্র বিশ্বকে নূতন আধ্যাত্মিক আলোকে উদ্ভাসিত করবার জন্যই এত বিভিন্ন জ্যোতিষ্মানদের সম্মিলন 'রামকৃষ্ণের' ভিতর। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, ত্যাগমূর্তি শিব, বর ও অভয়রূপা কালী, সত্যমূর্তি রামচন্দ্র, পরম-কল্যাণরূপ কৃষ্ণ, ক্ষমা-ধৃতি-বিগ্রহ যীশু, বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঋষি মহম্মদ এবং আচণ্ডালে প্রেমদাতা শ্রীচৈতন্য—এঁদের সকলকার ভাবজ্যোতি একীভূত হয়ে এক মহাশক্তিশালী আলোক-নিকেতনরূপে 'রামকৃষ্ণের' বিকাশ। সমগ্র বিশ্বে নব আধ্যাত্মিক আলোক-বিকিরণকারী মহাতেজঃপূর্ণ সন্ধানী আলোই—'রামকৃষ্ণ-রূপ'। পূর্বগ সকল অবতার ও সিদ্ধ মহাপুরুষের ভাবরাশিকে পুনরুদ্দীপিত করে সময়োপযোগী নূতন ছাঁচে ঢালার প্রয়োজন ছিল বলেই, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অভিনব সাধনা ও অপূর্ব সিদ্ধি। 'রামকৃষ্ণ' ব্যক্তিবিশেষ নন—ভাবময় বিগ্রহ।

*　　*　　*

শ্রীঠাকুর একদিন বলেছিলেন—"ওরে, নবাবী আমলের টাকা বাদশাই আমলে চলে না।" টাকার উপাদান যদিও এক, তবু গঠন ও ছাপ বদলায়। তাই শ্রীঠাকুর হয়েছিলেন সর্বধর্ম-স্বরূপ 'যত মত তত পথ'—নূতন ছাপ।...তাঁর দিব্যবাণী—"যে এখানে আসবে (রামকৃষ্ণের ভাব নেবে), তার চৈতন্য হবে।..."

তিনি আরও বলেছিলেন—"এবার ছদ্মবেশে আসা, যেমন জমিদার গোপনে কখনো জমিদারি দেখতে যায়, সেরূপ।" সেজন্য এবার পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব। রূপ, বিদ্যা, সর্ব-

প্রকার ঐশ্বর্য ও বিভূতির কোন প্রকাশ নেই। শুধু পরাবিদ্যা, পরাভক্তি, পরমজ্ঞান। অপূর্ব ত্যাগ, জ্বলন্ত বৈরাগ্য, উদ্বেল ঈশ্বর-পরায়ণতা, বিশ্বপ্লাবী প্রেম—রামকৃষ্ণ-অবতারের ভাবৈশ্বর্য। যারা ভাগ্যবান তারাই চিনেছিল—ছদ্মবেশীকে। যাদের শেষ জন্ম তারাই ধরতে পারবে এই সর্বভাবময়কে।

*　　　　*　　　　*

শ্রীঠাকুরের শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। আর যেন বইছে না। অহোরাত্র চলেছে ধর্মদান, শান্তিদান, মুক্তিদান। দূর দূর স্থান হতে আসছে লোক, দলে দলে। সংসার-দাবানলে জ্বলে-পুড়ে আসছে। কত কিছু করে—নানা যন্ত্রণা ভুগে আসছে। চাইছে মুক্তি। তিনিও অম্লানবদনে দিয়ে যাচ্ছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন ভাবাবস্থায় বলেছিলেন— "...এখানে আর কেউ নেই ; তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি—শেষ বুঝেছি তিনি পূর্ণ, আমি তাঁর অংশ। তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস। আবার এক-একবার ভাবি—তিনিই আমি, আমিই তিনি।"

শ্রীঠাকুর অন্য একদিন জগন্মাতার কাছে ভাবাবেশে প্রার্থনা করছেন—"মা, এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে, তারা যেন সিদ্ধ হয়।" আর তিনি যে জীবত্রাণের জন্যই এসেছেন তাও ইঙ্গিতে বলছেন— "অবতারকে দেখা, আর ঈশ্বরকে দেখা একই।"

তাঁর নরলীলাসম্বরণের সময়ও তিনি জানতেন। এক সময়ে শ্রীমা সারদাদেবীকে বলেছিলেন—"যখন দেখবে কলিকাতায় (রাত্রে) বাস করতে আরম্ভ করেছি, যার-তার হাতে খাচ্ছি,

বা নিজের খাবার পূর্বেই অগ্রভাগ অন্যকে দিচ্ছি—তখন জানবে যে, দেহটা আর বেশী দিন নয়।”

ভক্তদেরও বলেছিলেন—“বহু লোক যখন ঈশ্বরজ্ঞানে শ্রদ্ধা-ভক্তি করবে, তখনই এর (শরীরের) অন্তর্ধান হবে।” শরীরত্যাগের সময়ের আরো অনেক ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। এবার ছদ্মবেশে আসা। বেশী জানাজানি হলেই সরে পড়বেন।

* * *

১৮৮৫ সালের এপ্রিলের শেষে শ্রীঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত হয়।* তিনি কিন্তু মোটেই তা গ্রাহ্য করতেন না। ধর্মোপদেশ, শক্তিসঞ্চার ও জীবোদ্ধার দিনের দিন বেড়েই চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছিল গলার অসুখও। গলার ভিতরে ফুলে ক্রমে ঘা হয়েছে, কথা বলতেও খুবই কষ্ট হয়। তবুও তিনি অবিরাম ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন। ধর্মপিপাসু এলে গলার বেদনা একদিকে পড়ে থাকত। তার উপর চলেছে মুহুর্মুহুঃ ভাব ও সমাধি। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হলেই দপ্‌ করে উদ্দীপন হত! তিনি একেবারে সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। সেবকদের নিষেধ মানতেন না।

নানা চিকিৎসা সত্বেও অসুখ বেড়েই চলেছে দেখে ভক্তগণ শঙ্কিত হলেন। চিকিৎসা ও সেবাদির সুবিধার জন্য ডাক্তারগণ শ্রীঠাকুরকে কলিকাতায় আনার পরামর্শ দিলেন। শ্যামপুকুরে একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। সপ্তাহকাল বলরামবাবুর বাড়িতে

* ‘কথামৃত’ ২য় ভাগে দেখতে পাওয়া যায়—২৪শে এপ্রিল, ১৮৮৫ খ্রীঃ, বলরামের বৈঠকখানায় শ্রীঠাকুর বলছেন—“…কে জানে বাপু, আমার গলায় বিচি হয়েছে। শেষরাত্রে বড় কষ্ট হয়। কিসে ভাল হয়, বাপু?…”

কাটিয়ে, ১৮৮৫ সালের অক্টোবরের প্রারম্ভে তিনি শ্যামপুকুরে এলেন এবং রইলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসাধীনে। এর কয়েক দিন পরে তাঁর সেবার জন্য শ্রীমাতাঠাকুরাণীও দক্ষিণেশ্বর থেকে এলেন শ্যামপুকুরের বাড়িতে।...

পরমহংস অসুস্থ হয়ে কলিকাতায় এসেছেন—এ সংবাদ প্রচারিত হতেই বহু লোক তাঁকে দর্শন করবার জন্য আসতে লাগল। শ্যামপুকুরের ক্ষুদ্র বাড়িটি যাত্রিসমাগমে পরিণত হল জনবহুল তীর্থে। অনেকে আসত মুক্তিকামী হয়ে। যে বিশ্রাম তাঁর সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন, সে বিশ্রাম তাঁকে দেওয়া সম্ভব হল না। তাঁর মুখে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শুনে লোকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত। ডাক্তার সরকার শ্রীঠাকুরকে কথা না বলার কড়া নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই ছ'সাত ঘণ্টা করে তাঁর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করতেন। তবু যেন তাঁর তৃপ্তি হয় না। বলতেন—"আর কারো সঙ্গে কথা কওয়া হবে না। কেবল আমার সঙ্গে কথা কইবে।"

শ্রীঠাকুর যে শুধু যারা তাঁর কাছে আসত তাদেরই কৃপা করতেন তা নয়। তিনি সূক্ষ্ম ভাগবতী তনুতে দূরদূরান্তরে গমন করে, বহু লোককে কৃপা করতে লাগলেন। শ্রীঠাকুর শ্যামপুকুরে আছেন, বিজয় গোস্বামী ঢাকা হতে এসে বললেন যে তিনি একদিন ঢাকায় নিজের ঘরে দরজায় খিল দিয়ে বসে ঈশ্বরচিন্তা করছেন, এমন সময় শ্রীঠাকুর সশরীরে তথায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। তিনি উহা নিজের মাথার খেয়াল কিনা জানবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বহস্তে টিপে টিপে দেখেন। বিজয়ের মুখে সব শুনে, তিনি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।...

নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যুবক-ভক্তেরা আজকাল পালা করে রাতদিন শ্যামপুকুরের বাড়িতে শ্রীঠাকুরের সেবার জন্ত থাকেন। গৃহী ভক্তেরা দিনে আসেন—চিকিৎসা ও সেবাদির ব্যয়ভার বহন করেন সানন্দে। অসুস্থ শ্রীঠাকুর ও ভক্ত-জননীকে কেন্দ্র করে শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘের সূচনা হল।

শ্রীঠাকুরের মন ক্রমেই অসীমের দিকে ছুটে চলেছে। একটু ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গেই তিনি গভীর সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। শ্রীঠাকুরের ঐ প্রকার সমাধি-অবস্থা একদিন ডাঃ সরকার তাঁর একজন ডাক্তার-বন্ধুসহ ভালভাবে পরীক্ষা করে স্তম্ভিত হয়ে যান। ডাঃ সরকার যন্ত্রসাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হৃদয়ের স্পন্দন পরীক্ষা করে দেখেন যে হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ। অন্য ডাক্তার শ্রীঠাকুরের উন্মীলিত চোখের ভিতর আঙুল দিয়ে দেখতেও ক্রটি করেন নি। তাঁদের স্বীকার করতে হয়েছিল যে, বাইরে সম্পূর্ণ মৃতবৎ প্রতীয়মান শ্রীঠাকুরের এই সমাধি-অবস্থা সম্বন্ধে সায়েন্স (বিজ্ঞান) কিছুই বলতে পারে না।

যুক্তিবাদীরা একে মূর্ছা আর পাশ্চাত্ত্য-দর্শন বড়জোর ঐ অবস্থাকে জড়ত্ব বলে নির্দেশ করে। অথচ ঐ সমাধি-অবস্থায় শ্রীঠাকুরের যে-সকল দর্শন ও উপলব্ধি হত তা বর্ণে বর্ণে সত্য। বহুলোক তা পরীক্ষা করে দেখেছে এবং ভাল করে মিলিয়ে পেয়েছে। ঐ সমাধি পরমজ্ঞানে ও ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত করে।

* * *

এদিকে শ্রীঠাকুরের অসুখ দ্রুত বেড়ে চলেছে। কোন ঔষধেই ফল হচ্ছে না দেখে ডাঃ সরকার বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাঁর পরামর্শে শ্রীঠাকুরকে কলিকাতার বাইরে, কোন ফাঁকা জায়গায়

বায়ুপরিবর্তনের জন্ত নিয়ে যাওয়া স্থির হল। সামনেই পৌষ মাস। পৌষ মাসে স্থানপরিবর্তনে তাঁর আপত্তি থাকতে পারে ভেবে ভক্তগণ তাড়াতাড়ি উপযুক্ত বাড়ির সন্ধান করতে লাগলেন। কাশীপুরে ৺গোপালচন্দ্র ঘোষের উদ্যানবাটী মাসিক আশি টাকা ভাড়ায় ঠিক হল। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির একদিন পূর্বে (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর) এক শুভ অপরাহ্ণে তিনি কাশীপুরে এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর নরলীলার শেষ আট মাস এখানেই অতিবাহিত করেছিলেন।

প্রাকৃতিকশোভাসমৃদ্ধ উন্মুক্ত স্থানে এসে শ্রীঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে ভক্তগণের প্রাণ আনন্দে মাতোয়ারা হল। শ্রীঠাকুরের ভাবী সন্ন্যাসী শিষ্যগণ সকলেই তাঁর শয্যাপার্শ্বে সমবেত হয়ে তাঁর সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁদের প্রাণে তখন তীব্র বৈরাগ্য; শাশ্বতী শান্তি পাবার জন্ত সকলেই ব্যাকুল।

*　　　*　　　*

২৩শে ডিসেম্বর। শ্রীঠাকুরের হঠাৎ ভাবান্তর হয়েছে। কৃপার ছড়াছড়ি। ভাবস্থ হয়ে কালীপদর বক্ষ স্পর্শ করে বলছেন—"চৈতন্ত হোক"—আর সস্নেহে চিবুক ধরে আদর করেছেন। পরে ভাবাবেশে তিনি বলছেন—"যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ডেকেছে, বা সন্ধ্যা-আহ্নিক করেছে, তার এখানে আসতেই হবে।"

সকালে দু'জন স্ত্রীভক্ত তাঁর কৃপা পেয়েছেন। তিনি সমাধিস্থ হয়ে চরণদ্বারা তাঁদের স্পর্শ করেন। তাঁরা আনন্দে অশ্রুবিসর্জন করছেন। একজন কাঁদতে কাঁদতে বলছেন—"আপনার এত

দয়া!" ...তাঁর অযাচিত কৃপা। সিঁথির গোপালকে কৃপা করবেন। বললেন—"গোপালকে ডেকে আন।"

*　　　*　　　*

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। নিরাকারের দিকে ছুটে চলেছে তাঁর মন। বিদ্যার 'আমি' পর্যন্ত যেন মুছে যাচ্ছে! তিনি বলছেন— "·· হাঁ, লোকশিক্ষা বন্ধ হচ্ছে। ...আর বলতে পারি নি। সব রামময় দেখছি।...এক একবার মনে হয়—কাকে আর বলব! দেখলাম, সাকার থেকে সব নিরাকারে যাচ্ছে। আর আর বলতে ইচ্ছা যাচ্ছে, কিন্তু পারছি নে।... এখনও দেখছি—নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—এই রকম করে রয়েছে।..." (কথামৃত')।

অসুখকে অবলম্বন করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর 'ভক্তসঙ্ঘ'টিকে গড়ে তুলেছিলেন। যাঁরা তাঁর অন্তরঙ্গ তাঁরাই নানা প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করে শ্রীগুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। একদিন ভাবাবস্থায় তিনি বলেন—"এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ, বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন, মশাই?' জিজ্ঞাসা করে যায়, তারা বহিরঙ্গ।

১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারী। শরীর অনেকটা সুস্থ বোধ করায় শ্রীঠাকুর অপরাহ্নে আজ প্রথম নীচে একটু বেড়াতে নেমেছেন। গৃহী ভক্তেরা অনেকে চলেছেন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। বাগানের ফটকের দিকে অগ্রসর হতেই সামনে গিরিশকে দেখতে

পেয়ে তাঁর ভাবান্তর হল। শ্রীঠাকুরের পদতলে পড়ে গিরিশ স্তব করতে লাগলেন। সহসা শ্রীঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তিনি ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায়ই সমাধিস্থ হলেন।

ভক্তগণ উল্লাসে কেউ করছেন আনন্দধ্বনি, কেউ তাঁর পদধূলি মাথায় তুলে নিচ্ছেন। কেউ পুষ্প আহরণ করে তাঁর পাদপূজা করছেন। সকলেই উন্মাদনায় উত্তাল। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! ইতোমধ্যে শ্রীঠাকুর অর্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত হয়ে আনন্দবদনে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন—"তোমাদের কি আর বলব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।" এইমাত্র বলেই তিনি বক্ষস্থল স্পর্শ করে একে একে সকলকার 'চৈতন্য' সম্পাদন করলেন। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে মাত্র দু'জনকে তিনি 'এখন নয়' বলে তখন স্পর্শ করেন নি।*

শ্রীঠাকুরের এই শক্তিপূর্ণ স্পর্শ ভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন এনে ক্রমে তাঁদের ঐশী আনন্দে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

* * *

খুব সম্ভব ১৮৮৬ সালের ফেব্রুয়ারীর ঘটনা: শ্রীঠাকুরের অন্যতম অন্তরঙ্গ পার্ষদ গোপাল (তাঁর অপেক্ষাও কয়েক বৎসরের বড় ছিলেন বলে শ্রীঠাকুর তাঁকে 'বুড়ো গোপাল' বলে ডাকতেন) তীর্থভ্রমণ করে এসেছেন। সাধুদের গেরুয়া বস্ত্রাদি দান করার তাঁর ইচ্ছা হয়েছে। তখন গঙ্গাসাগর-যাত্রা উপলক্ষে কলিকাতায়

---

* ঐ দু'জনকেও ঠাকুর পরে একদিন ভাবাবেশে স্পর্শ করে চৈতন্য সম্পাদন করেছিলেন।

বহু সাধু সমবেত। ঐ সাধুদের বস্ত্রাদি-দানের ইচ্ছা প্রকাশ করাতে শ্রীঠাকুর বললেন—"এখানে ত্যাগী ভক্তেরা যারা সব রয়েছে, এদের চাইতে বড় সাধু আর কোথায় পাবে! এরা এক-একজন হাজারী-সাধু। এদের দিলেই হবে।" শ্রীঠাকুরের নির্দেশ মত বুড়ো গোপাল দ্বাদশখানি গেরুয়া-বস্ত্র ও সমসংখ্যক রুদ্রাক্ষমালা-চন্দনাদি তাঁর কাছে নিয়ে এলেন। ঐ গৈরিক-বস্ত্র ও মালাদি তিনি স্বহস্তে নরেন্দ্রাদি এগার জন ভক্তকে দিয়েছিলেন।* এবং উদ্বৃত্ত গেরুয়া-বস্ত্রখানি পরে গিরিশচন্দ্রকে দেওয়া হয়েছিল।

এই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানটি জগতের ইতিহাসে এক মহাগুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ ঐ দিন হইতেই 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ত্যাগি-সঙ্ঘের' সৃষ্টি হল। এই অনুষ্ঠানের ভিতরই নিহিত ছিল—'ত্যাগি-সঙ্ঘের' অমোঘ শক্তির বীজ। যুগাবতার নিজেই এই অভিষেক-কার্য সম্পন্ন করে, যুগধর্মপ্রচারের জন্য এ 'সঙ্ঘকে' শত শত বৎসরের স্থায়িত্ব দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

ক্রমে মার্চ মাস আগত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসছে। তিনি কিছু খেতে পারেন না; গলায় এমনই ব্যথা যে, সামান্য জলীয় পদার্থও গলাধঃকরণ হয় না। জগন্মাতা তাঁকে দেখিয়ে দিলেন—"তুই তো এতগুলি মুখ দিয়ে খাচ্ছিস্!"—তাঁর কষ্ট দেখলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।

---

* নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, বুড়ো-গোপাল, কালী ও লাটু—এই ক'জনকে শ্রীঠাকুর গেরুয়া-বস্ত্র দেন। দেহত্যাগের পূর্বে এই একাদশ ত্যাগী শিষ্যকে অন্যভাবেও তিনি সন্ন্যাস দিয়েছিলেন এবং দ্বারে দ্বারে মাধুকরী-ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন।

*১৪ই মার্চ্চ (১৮৮৬)। গভীর রাত্রি, শ্রীঠাকুর আস্তে আস্তে অতি কষ্টে বলছেন—"তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করছি। সব্বাই যদি বল যে এত কষ্ট, তবে দেহ যাক— তা হলে দেহ যায়···।" ভক্তগণ নীরবে অশ্রুবিসর্জন করছেন।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে তাঁর অসুখ আরো বাড়ল। কলিকাতায় লোক পাঠান হল ডাক্তারের জন্য। ক্রমে একটু সুস্থ বোধ করে তিনি অস্ফুট স্বরে বলছেন— "অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি! তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্তি) দেখছি!"

পরের দিন সকালে ভক্তদের সঙ্গে ইশারা করে, কখনো আস্তে আস্তে কথা বলছেন—"শরীরটা যদি কিছুদিন থাকতো, লোকেদের চৈতন্য হতো।"··· খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পুনরায় বললেন— "তা রাখবে না।···তা রাখবে না; সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে !! একে কলিতে ধ্যানজপ নেই।" রাখাল স্নেহপূর্ণ স্বরে বললেন— "আপনি বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে।" শ্রীঠাকুর বললেন শুধু— "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

খানিক মৌন থেকে তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে আবার বলছেন— "এর ভিতর দু'টি আছেন। একটি তিনি।... আর একটি ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙ্গেছিল, তারই অসুখ করেছে। বুঝেছ? ···কাকেই বা বলবো, কেই বা বুঝবে।··· তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়।···" তাঁর দেববাণী শুনে সকলে স্তম্ভিত ও বিস্ময়মুগ্ধ। ('কথামৃত')

---

* 'কথামৃত', তৃতীয় ভাগ, ১৮১ পৃষ্ঠা

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃত্যুশয্যায় পরে নরেন্দ্রকে বলছেন— "ত্যাগ দরকার।" পুনরায়— "...দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছু।"

ঐ সময়ে একদিন শ্রীঠাকুরের এক অলৌকিক দর্শন হল। তিনি দেখলেন, তাঁর সূক্ষ্ম শরীরটি স্থূল শরীর হতে বেরিয়ে এসে বেড়াচ্ছে। পরে বলেছিলেন— "দেখলুম তার পিঠময় ঘা হয়েছে। ভাবছি কেন এমন হল? আর মা দেখিয়ে দিচ্ছেন— যা-তা করে এসে যত লোক ছোঁয়, আর তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়— সেগুলো (দুষ্কর্মের ফল) নিতে হয়! সে-সব নিয়ে নিয়ে ঐরূপ হয়েছে। সেজন্যই তো (নিজের গলা দেখিয়ে) এই হয়েছে। নইলে এ শরীর কখনও কিছু অন্যায় করে নি—এতে রোগভোগ কেন?" জীবের পাপভার নিয়েই তাঁর দেহের এ কঠিন অসুখ! তাঁর মুখে ঐ দর্শনের কথা শুনে অনেকেই মর্মন্তুদ বেদনা অনুভব করলেন।

* * *

এত তো মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি, গভীর তত্ত্বকথা, অসহ্য কষ্ট কিন্তু তার মধ্যেও রঙ্গ-রসিকতার অন্ত নেই। 'স ঈশ অনির্বচনীয়ঃ প্রেমস্বরূপঃ'— আনন্দই তাঁর স্বরূপ, তাঁর রূপ। তাইতো শ্রীঠাকুর সদানন্দময়।

কাশীপুর-বাগানে শ্রীমাতাঠাকুরাণী আড়াই সের দুধের বাটি নিয়ে সিঁড়ি উঠতে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। পায়ের গোড়ালির হাড় সরে গিয়েছে। তাঁকে তুলে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হল। দারুণ যন্ত্রণা। শ্রীঠাকুর শুনে বালক-ভক্ত বাবুরামকে বলছেন— "তাইতো, বাবুরাম, এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে?

কে আমায় খাওয়াবে ?" তখন মণ্ড খেতেন। শ্রীমা-ই মণ্ড তৈরী করে খাইয়ে আসতেন। শ্রীমার নাকে তখন বড় নথ ছিল। তাই নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে তিনি বাবুরামকে বললেন —"ও বাবুরাম, ঐযে ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস ?" তাঁর রঙ্গপূর্ণ কথা শুনে বালক-ভক্তরা তো হেসে গড়াগড়ি যায় !

১৭

অন্তরঙ্গ ত্যাগী পার্ষদদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর-উদ্যানে ভাবী 'ধর্মসঙ্ঘের' সূচনা করলেন। তাদের প্রথম দীক্ষা ত্যাগমন্ত্রে—কামিনীকাঞ্চনত্যাগ। সর্ব-এষণাত্যাগ; এমন কি মুক্তির বাসনাও। শ্রীঠাকুর তাঁদের নানাভাবে দিক্ষা দিচ্ছেন, নানা সাধন করাচ্ছেন, সকল তত্ত্ব শেখাচ্ছেন।

তিনি বলেছিলেন— "নরেন লোকশিক্ষা দেবে।" শুধু যে নরেন তা নয়। নরেনের নেতৃত্বে প্রত্যেকটি জীবনকেই জীবকল্যাণ-সাধনের জন্য আদর্শ আচার্যরূপে তিনি গড়ে তুলছেন। ভাবী আচার্য-শিষ্যদের জীবনগুলি তিনি করছেন নানা সাত্ত্বিক-ঐশ্বর্য-মণ্ডিত। সে শিক্ষা গোপনে। সাধারণ ভক্তমজলিসে নয়। শ্রীঠাকুর ত্যাগীদের যে গুহ্যশিক্ষা ও সাধন দিয়েছিলেন, তা 'কথামৃতে' প্রকাশিত হয় নি। তাঁর যে-সকল উপদেশ ও বাণী 'কথামৃতে' প্রকাশ পেয়েছে, তা সর্বসাধারণের জন্য—সমগ্র জগতের নরনারীর জন্য। কিন্তু 'ত্যাগীদের' তিনি যে গুহ্যসাধন ও তত্ত্ব শিখিয়েছিলেন এবং তাঁদের ভিতর যে যে বিশেষ শক্তিসঞ্চার করেছিলেন, সবই 'অলিখিত-বেদ'। শুধু পার্ষদদের 'জীবন'-পাঠে সে-সব জানা যায়।

পার্ষদগণ সকলেই তৃপ্ত, পরিপূর্ণতায় উদ্বেল, স্ফীত। যে যা প্রার্থনা করছেন—ভাব, সমাধি, দেবদেবী-দর্শন, জ্যোতির্দর্শন, শান্তি— শ্রীঠাকুর সবই দিচ্ছেন। কিন্তু একমাত্র নরেন্দ্রের তৃপ্তি

নেই। তিনি চিরশান্তিময় পরানন্দময় নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে থাকতে চান। তিনি বলেন—"আমি চাই শান্তি। আমি ঈশ্বর পর্যন্ত চাই নে।" শ্রীঠাকুর জানতেন, নরেন্দ্রের মন স্বরূপে লীন হয়ে অসীমের ঘরে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল। তিনি তো তা হতে দিতে পারেন না! নরেনকে দিয়ে তিনি যুগধর্মের প্রচার করবেন!

অস্থিরপ্রাণে এক দিন নরেন্দ্র শ্রীঠাকুরকে ধরে বসেছেন। "তুই কি চাস্ বলতো?"—স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন শ্রীঠাকুর। ছল্‌ছল্ চোখে নরেন্দ্রনাথ বলেন—"আমার ইচ্ছা হয় শুকদেবের মত একেবারে সমাধিতে ডুবে থাকি। শুধু দেহরক্ষার জন্য খানিকটা নীচে নেমে এসে আবার সমাধিতে চলে যাই।" শুনে শ্রীঠাকুর গম্ভীর হয়ে গেলেন। ধিক্কারের সুরে বললেন—"ছিঃ, ছিঃ! তুই এত বড় আধার—তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলুম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটবৃক্ষের মত হবি—তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে কিনা তুই শুধু নিজের মুক্তি চাস্?" শুনে অধোবদনে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগলেন নরেন্দ্রনাথ। ভাবলেন—আহা! তাঁর হৃদয় কত বিশাল!

এর কয়েক দিন পরেই নরেন্দ্র সন্ধ্যাবেলায় ধ্যান করতে বসেছেন। ক্রমে তাঁর মন নির্বিকল্প-সমাধিতে মগ্ন হয়ে গেল। শরীর স্থাবর-স্থির, বাহ্যতঃ মৃতবৎ। গোপাল-দা ঐ অবস্থা দেখে শঙ্কিত হয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে শ্রীঠাকুরকে বললেন—"নরেন মরে গেছে।" তিনি সবই জানতেন, ধীর স্বরে বললেন—"বেশ হয়েছে। এখন থাক্ কিছুক্ষণ ঐভাবে। এরই জন্য বড় জ্বালাতন করছিল।"

অধিক রাত্রে নরেন্দ্রের বাহ্যজ্ঞান ক্রমে ফিরে এল। কিন্তু তখনো দেহে মন আসছে না। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—"আমার শরীর কই?" নিকটস্থ ভক্তগণ তাঁর শরীর টিপে টিপে বলতে লাগলেন—"এই যে তোমার শরীর।" সহজাবস্থা প্রাপ্ত হয়ে নরেন্দ্র গেলেন শ্রীঠাকুরের কাছে। সমাধির শান্তিতে স্নাত তাঁর মন। তাঁকে দেখেই শ্রীঠাকুর বললেন—"কিরে, এবার তো মা তোকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন! যা দেখেছিস্ সে-সব এখন বন্ধ থাকবে। চাবিকাটি আমার হাতে রইল। এখন তোকে মা'র কাজ করতে হবে। মা'র কাজ শেষ হলে আবার এ অবস্থা ফিরে পাবি।" নরেন্দ্রনাথের মন তখন অক্ষয়-প্রশান্তিময়। তিনি নীরবে অধোবদনে রইলেন।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমেই মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাঁর যুগধর্ম-প্রচারকল্পে ত্যাগী অন্তরঙ্গদের জীবন সে-ভাবে গড়ে তুলেছেন। তিনি জানতেন নরেন্দ্রনাথই তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী এবং এই বিশেষ কার্যের জন্যই নরেনের আগমন। তিনি একদিন নরেনকে ডেকে বললেন—"এই ছেলেদের সব তোর হাতে সঁপে দিলুম। তুই এদের দেখাশুনা করবি।" অতঃপর সঙ্ঘ-জীবনযাপন সম্বন্ধে তিনি নরেনকে অনেক উপদেশ দিলেন।

মহাপ্রস্থানের কয়েক দিন পূর্ব হতেই শ্রীঠাকুর প্রত্যহ সন্ধ্যায় নরেন্দ্রকে নিজের কাছে ডেকে এনে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে নানা গুহ্য উপদেশ দিতেন। লীলাসম্বরণের আট-নয় দিন পূর্বে একদিন তিনি যোগীনকে পঞ্জিকাখানি আনতে ইঙ্গিত করলেন,

এবং ২৫শে শ্রাবণ হতে প্রতিদিনের তিথি-নক্ষত্রাদি সব পড়ে যেতে বললেন। যোগীন পড়ে যাচ্ছেন, আর শ্রীঠাকুর চোখ বুজে শুনছেন। শ্রাবণ-সংক্রান্তি পর্যন্ত পড়া হলে তিনি ইঙ্গিত করে যোগীনকে পাঁজি বন্ধ করতে বললেন। তখন কেউই বুঝতে পারে নি যে তিনি দেহত্যাগের দিন স্থির করছেন।

দেহত্যাগের তিন-চার দিন পূর্বে শ্রীঠাকুর নরেনকে তাঁর শয্যাপার্শ্বে ডেকে এনেছেন। ঘরটি নিস্তব্ধতায় ভারাক্রান্ত। ঘরে আর কেউ ছিল না। নরেনকে সামনে বসতে ইঙ্গিত করে শ্রীঠাকুর সস্নেহে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকে ক্রমে গভীরসমাধিমগ্ন হলেন। তখন নরেন্দ্রনাথ অনুভব করলেন—শ্রীঠাকুরের দেহ থেকে একটা সূক্ষ্ম তেজঃরশ্মি তাঁর ভিতর প্রবেশ করছে। ক্রমে বাহ্য-চেতনা বিলুপ্ত হয়ে তিনিও সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে সহজাবস্থায় ফিরে এসে তিনি দেখেন—শ্রীঠাকুর নীরবে অশ্রুবিসর্জন করছেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে শ্রীঠাকুর বললেন—"আজ তোকে যথাসর্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম। তুই এই শক্তিবলে জগতের প্রভূত কল্যাণ করবি। কাজ শেষ হলে ফিরে যাবি।"… ঐ মুহূর্ত হতে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি নরেন্দ্রনাথের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হল। শ্রীঠাকুর ও নরেন হয়ে গেলেন যেন এক আত্মা।

দেহত্যাগের দু'দিন মাত্র বাকী। শ্রীঠাকুর অসহ্য রোগযন্ত্রণায় কাতর। নরেন্দ্র তাঁর শয্যাপার্শ্বে অধোবদনে বসে আছেন। এমন সময় তাঁর হঠাৎ মনে হল—এই নিদারুণ শারীরিক কষ্টের সময় যদি তিনি বলতে পারেন 'আমি ভগবান', তবেই বিশ্বাস করব। আশ্চর্য! নরেনের মনে এই চিন্তার উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঠাকুর

তাঁর দিকে মুখ ঘুরিয়ে সুস্পষ্টকণ্ঠে বললেন—"যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই (এই শরীরে) রামকৃষ্ণরূপে। তবে তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।" নরেন্দ্র অপরাধীর ন্যায় মাথা নীচু করে রইলেন। হৃদয় মথিত করে অশ্রুর ধারা নেমে এল তাঁর চোখে।

১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার।* নরলীলার শেষ দিন। বিচ্ছেদের করুণধ্বনিতে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমীরণ যেন মর্মরিত। ভক্তদের ভারাক্রান্ত প্রাণে 'রামকৃষ্ণ' আজ নূতন রূপে এলেন।… নিদারুণ যাতনায় তিনি ছট্‌ফট্‌ করছেন। নাড়ী অসম্বদ্ধ ও ক্ষীণ। এরি মধ্যে বলছেন ভক্তদের সঙ্গে কত গভীর তত্ত্বকথা। কাউকে

* পঞ্জিকা অনুসারে বাংলা এই দিনের ইংরেজী সম-সন-তারিখ ১৮৮৬ সাল, ১৫ই আগষ্ট, রবিবার। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ৩১শে শ্রাবণ রাত্রি ১টার পরে গভীরসমাধিস্থ হন। অনেকে উহাই তাঁর দেহত্যাগ মনে করেন। প্রতীচ্য জ্যোতিষগণনায় ঐ সময় ১৬ই আগষ্ট এবং সোমবার। পূর্বপ্রকাশিত কোন কোন জীবনী-গ্রন্থাদিতে শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের তারিখ ও দিন ১৬ই আগষ্ট, রবিবার উল্লিখিত আছে। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষগণনামতে ১৬ই আগষ্টকে তাঁর দেহত্যাগের তারিখরূপে গ্রহণ করলে তা সোমবার হওয়াই সমীচীন মনে হয়।

শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগপ্রসঙ্গে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী একস্থানে বলেছেন (ভগ্নী দেবমাতাকৃত 'Ramakrishna and His disciples', পৃষ্ঠা ১৬১-১৬৩)—"…আমরা পরদিন (অর্থাৎ সোমবার) বেলা একটা-দু'টা পর্যন্ত তাঁর সমাধি হতে ব্যুত্থানের অপেক্ষা করলুম। তখনও ঠাকুরের শরীরে, বিশেষতঃ পৃষ্ঠদেশে একটু উত্তাপ ছিল।…"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে পাওয়া যায় (৬২২ পৃঃ)—ডাক্তার সরকার ১৬ই আগষ্ট, সোমবার, বেলা প্রায় ১টার সময় এসে শ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করেন এবং বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে বড়জোর আধঘণ্টা পূর্বে তাঁর দেহত্যাগ হয়েছে।

সস্নেহে মুখে হাত বুলিয়ে আদর করলেন। ...সন্ধ্যার পূর্ব হতে তাঁর অতিশয় শ্বাসকষ্ট হল। ভক্তগণ অশ্রুবিসর্জন করছেন! সকলেই শ্রীঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে তাঁকে ঘিরে নীরবে দাঁড়িয়ে।

সন্ধ্যার পরে তাঁর একটু ক্ষুধার উদ্রেক হয়। সেবকগণ সামান্য পথ্য খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গলাধঃকরণ হল না। একটু পরেই তিনি গভীরসমাধিমগ্ন হলেন। শরীর নিস্পন্দ—স্থির।

মধ্যরাত্রে তিনি সহজাবস্থা প্রাপ্ত হন, এবং কিছু খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অনেকগুলি বালিশে ঠেসান দিয়ে তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হল। তিনি সামান্য পাতলা সুজি অক্লেশে খেলেন এবং বল্লেন যে বেশ স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁকে একটু ঘুমুবার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ সময় শ্রীঠাকুর বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে সজোরে তিনবার 'কালী' নাম উচ্চারণ করে শুয়ে পড়লেন।

ঝিল্লীরবাবৃত নীরব নিশি। রাত্রি ১টা ২ মিনিটের (মতান্তরে ১টা ৬ মিঃ) সময় হঠাৎ তাঁর সর্বাঙ্গে মুহুর্মুহুঃ পুলক ও রোমাঞ্চ হতে লাগল। দৃষ্টি নাসাগ্রনিবদ্ধ। সমগ্র মুখমণ্ডলে দিব্যানন্দের দীপ্তি। তিনি সমাধিস্থ হলেন। এই সমাধিই পর্যবসিত হল মহাসমাধিতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বরূপে লীন হলেন। অংশ ও পূর্ণ এক হয়ে গেল।

শ্রীমাতাঠাকুরাণী কেঁদে উঠলেন—"আমার মা-কালী, আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে গো?"

শ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ নরদেহ ত্যাগ করেছেন। তাঁর ভাবরাশি চলেছে দিগ্‌দিগন্তে পক্ষ বিস্তার করে—উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে, দেশ দেশান্তরে, দূর দূরান্তরে। চলেছে বিশ্বমানবের শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে—নানা ছন্দে, বহু ভঙ্গিমায় বিচিত্র প্রাণশক্তি সঞ্চার করে, অভিনব চেতনা উদ্বুদ্ধ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গিনী শ্রীসারদাদেবী, যাঁকে তিনি অর্ধাঙ্গিনী-রূপে গ্রহণ করেছিলেন—রইলেন নরদেহে। সহধর্মিণী সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন—"ও সারদা, সরস্বতী। ...জ্ঞান দিতে এসেছে।"

শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর শ্রীসারদাদেবীও দেহ ছেড়ে চলে যাবেন স্থির করেছিলেন, কিন্তু শ্রীঠাকুর তা হতে দিলেন না। বললেন—"তোমার এখন যাওয়া হবে না। অনেক কাজ আছে।" যুগাবতার মানবদেহ ত্যাগ করলেন। রেখে গেলেন তাঁর 'শক্তি'কে 'যুগধর্ম'প্রচারের জন্য।—সারদাদেবীকে নরদেহে থাকতে হল।

আমরা এখন শ্রীসারদাদেবীর জীবনকথা অতি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করব। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসঙ্ঘে তিনি 'শ্রীমাতাঠাকুরাণী' নামে ও রূপে পরিচিতা।

*　　　*　　　*

বাঁকুড়া জিলার জয়রামবাটী গ্রামে ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে শ্রীসারদাদেবী জন্মগ্রহণ করেন

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্যামাসুন্দরী দেবীর প্রথম সন্তানরূপে।* ব্রাহ্মণ-প্রধান ক্ষুদ্র গ্রামটির উত্তর-পূর্বদিকের সীমানির্দেশ করে স্বল্পপরিসর আমোদরনদ লতায়িত ভঙ্গীতে প্রবাহিত হয়ে গ্রামটিকে উর্বর ও সমৃদ্ধ করেছে।

তাঁর জন্মসম্বন্ধে সারদাদেবী বলেছিলেন—"...আমার জন্মও ঐ রকমের (ঠাকুরের মত)। মা শিহড়ে ঠাকুর-দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় জয়রামবাটীর পশ্চিম সীমানায় এসে হঠাৎ শৌচে যাবার ইচ্ছা হওয়ায়, দেবালয়ের কাছে এক গাছতলায় যান। শৌচের কিছুই হল না। কিন্তু বোধ করলেন, একটা বায়ু যেন তাঁর উদরমধ্যে প্রবেশ করায় উদর ভয়ানক ভারী হয়ে উঠল। বসেই আছেন। তখন মা দেখেন যে, লাল-চেলীপরা পাঁচ-ছ' বছরের একটি সুন্দরী মেয়ে গাছ থেকে নেমে, তাঁর কাছে এসে কোমল বাহু দু'টি দিয়ে পিঠের দিক থেকে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলল—'আমি তোমার ঘরে এলাম, মা।'

"তখন মা অচৈতন্য হয়ে পড়েন। সকলে গিয়ে তাঁকে ধরাধরি করে নিয়ে এল। সেই মেয়েই মায়ের উদরে প্রবেশ করে, তা থেকেই আমার জন্ম। বাড়িতে ফিরে এসে মা এ ঘটনাটি বলেছিলেন।"

রামভক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কলিকাতা হতে ফিরে এসে স্ত্রীর মুখে সব শুনে বুঝলেন—ভগবতী আসছেন তাঁর ঘরে। স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই ভক্তিপূত চিত্তে ও সংযত মনে দেবীর আগমন প্রতীক্ষা করে রইলেন।

* রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দু' কন্যা ও পাঁচ পুত্র ছিল—সারদা, কাদম্বিনী, প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসন্ন ও অভয়চরণ।

দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করে কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেই অতিবাহিত হয়েছিল সারদাদেবীর বাল্যকাল। তাঁর চরিত্রের সেবাভাবটি প্রথম জীবনেই বিকশিত হয়ে উঠেছিল। অতি শৈশবেই তিনি গর্ভধারিণীকে গৃহকর্মে সাহায্য করতেন নানা ভাবে। ছোট ভাইদের দেখাশুনা তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ ছিল। তিনি বলেছিলেন— "ভাইদের নিয়ে গঙ্গায় নাইতে যেতুম। আমোদর নদই ছিল আমাদের গঙ্গা। গঙ্গাস্নান করে সেখানে বসে মুড়ি খেয়ে আবার ওদের নিয়ে বাড়ি আসতুম। আমার বরাবরই একটু গঙ্গা-বাই ছিল।"

একটু বড় হয়ে পিতাকেও তিনি নানা কাজে সাহায্য করতে যেতেন। মাঠে 'মুনিষদের' মুড়ি দিয়ে আসা, গরুর জন্য গলা-জলে নেমে দল-ঘাস কাটা—আরো কত কাজ*। রামচন্দ্র কিন্তু কন্যাকে দেবীজ্ঞানে খুব শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন। আর তিনি ছিলেন সারদাগতপ্রাণ।

এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দম্পতির মহাপ্রাণতা সম্বন্ধে সারদাদেবীর কথায় জানা যায়— "আমার মা-বাবা বড় ভাল ছিলেন। বাবা বড় রামভক্ত ছিলেন। পরোপকারী ও নৈষ্ঠিক।···মা'র কত দয়া ছিল!

* পরবর্তী কালে শ্রীসারদাদেবী বলেছিলেন যে, দল-ঘাস কাটবার সময় তাঁরই অনুরূপ একটি মেয়ে তাঁর সঙ্গে জলে নেমে দল-ঘাস কাটত। আবার কারো কাছে তিনি এও প্রকাশ করেছেন—"ছেলেবেলায় দেখতুম, আমারই মত একটি মেয়ে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমার সকল কাজে সহায়তা করত, আমার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করত। অন্য কেউ এলে তাকে আর দেখতে পেতুম না। দশ-এগার বছর বয়স পর্যন্ত এ রকম হত।"

লোকদের কত থাওয়াতেন, যত্ন করতেন! কত সরল! তাই তো এ ঘরে জন্মেছি।"

সারদাদেবীর বাল্যজীবনের বিশেষ কোন ঘটনা জানা যায় না। অন্যান্য পল্লী-বালিকার ন্যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে পিতামাতার স্নেহনিবিড় কোলে তিনি লালিতা-পালিতা হয়েছিলেন। পিতামাতা তাঁকে আদর করে 'সারু' বলে ডাকতেন। বাল্যকালে সারদাদেবীর লেখাপড়া শিখবার কোন সুযোগ হয় নি; পরে নিজের চেষ্টাতে তিনি পড়তে শিখেছিলেন। শৈশব হতেই তিনি খুব শান্ত ও সাদাসিধে ছিলেন। আর যেন মূর্তিমতী সরলতা। খেলার সাথীদের সঙ্গে কখনো তাঁর ঝগড়া হত না। পরস্পরে ঝগড়া হলে তিনি তা মিটিয়ে দিতেন। দেবদেবীর মূর্তি গড়ে ফুল-বিল্বপত্র দিয়ে পূজা করতে তিনি খুব ভালবাসতেন।

ছ'বৎসরে পদার্পণ করার পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সারদাদেবীর বিবাহ হয়। এই বিবাহের একটি ইতিহাস আছে, যার মর্ম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শোনা যায়, হৃদয়ের বাড়ি শিহরে গান ও কথকতার আয়োজন হয়েছিল। ঐ উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব শিহড়ে আসেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বহু নরনারীর সঙ্গে শ্যামাসুন্দরীও 'সারু'কে নিয়ে তাঁর পিত্রালয় শিহড়ে এসেছেন গান শুনতে। গানের আসর ভেঙ্গে যাবার পর জনৈক প্রতিবেশিনী সারদাকে কোলে নিয়ে রঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করে—"এত লোকের মধ্যে তুই কাকে বে করবি?" তখন শিশু-সারদা একগাল হেসে নিকটে উপবিষ্ট শ্রীঠাকুরকে দু'হাত দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এতটুকু বালিকার পক্ষে তাঁর ভাবী স্বামীকে দেখিয়ে দেওয়া এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষেও পূর্ব হতেই ভাবী

পত্নী-সম্বন্ধে "কুটোবাঁধা আছে" বলে দেওয়া—এ দু'টি ঘটনাই পরস্পরের পরিপোষক এবং অতীব বিস্ময়কর।

সারদাদেবীর পিত্রালয়ের জীবন জাগতিক দৃষ্টিতে খুবই কষ্টকর। তাঁকে সংসারের অনেক কাজ করতে হত। এত অল্প বয়সে তাঁকে রান্নাদি করতে হয়েছিল যে, তখনো তিনি ভাতের হাঁড়ি নামাতে পারতেন না, তাঁর পিতা তা নামিয়ে দিতেন। তিনি সব কাজই করতেন আনন্দে।

জয়রামবাটী-অঞ্চলে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। ঐ সময়ে ধর্মপ্রাণ রামচন্দ্রের মহৎ উদার হৃদয়ের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীসারদাদেবী পরে ভক্তদের বলেছিলেন—"একবার (১২৭১ সনে) ওদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হল। কত লোকই যে না খেতে পেয়ে আমাদের বাড়ি আসত! আমাদের আগের বছরের ধান মরাই-বাঁধা ছিল। বাবা সেই ধান চাল করিয়ে কলাইয়ের ডাল দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধিয়ে রাখতেন। বলতেন—'এ-ই বাড়ির সবাই খাবে, আর যে যে আসবে তাকেও দেবে। আমার সারদার জন্য খালি ভাল চালের দু'টি ভাত করবে। সে আমার তাই খাবে।' এক-একদিন এমন হত, এত লোক এসে পড়ত যে, খিচুড়িতে কুলাত না। তখন আবার চড়ান হত। আর সেই গরম গরম খিচুড়ি যেই ঢেলে দিত, শীঘ্র জুড়াবে বলে আমি পাখা দিয়ে দু'হাতে বাতাস করতুম। আহা! ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্য বসে আছে! ..."

সারদাদেবীর বালিকামূর্তির অন্তরালে যে দয়া, বিগলিত করুণা ও পরদুঃখকাতরতা মুকুলিত দেখতে পাওয়া যায়, তা-ই

পরবর্তী জীবনে তাঁর মাতৃত্বের ভিতর দিয়ে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়ে দিব্যসৌরভে সহস্র সহস্র প্রাণ আমোদিত করেছিল। আর অদূর ভবিষ্যতে অগণিত প্রাণে এনে দেবে দিব্য প্রেরণা।

১২৭৪ সালে শ্রীঠাকুর প্রায় সাত বৎসর পরে কামারপুকুরে এসেছেন, জয়রামবাটী হতে সারদাকেও কামারপুকুরে আনা হল।* তখন তিনি চৌদ্দ বৎসরে পড়েছেন। ঐ সময়ে চার-পাঁচ মাস একত্র বাসের ভিতর দিয়ে শ্রীঠাকুরের কাছ থেকে তিনি লৌকিক ও আধ্যাত্মিক অনেক শিক্ষাই পেয়েছিলেন।

অনেকরাত পর্যন্ত পাড়ার স্ত্রী-পুরুষদের কাছে শ্রীঠাকুর ভাবাবেশে কত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করতেন! সারদাদেবী শুনতে শুনতে অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তা দেখে মেয়েরা তাঁকে তুলতে যেত—এমন সুন্দর সুন্দর কথাগুলো শুনলে নি—ঘুমিয়ে পড়লে? শ্রীঠাকুর তুলতে বারণ করে বলতেন—"না গো, ওকে তুলো নি।

* এর পূর্বে ১২৭৩ সালেও শ্রীসারদাদেবী দু'বার কামারপুকুরে এসেছিলেন। তখন নূতন বৌ, নূতন জায়গা। হালদারপুকুরে একা একা স্নানে যেতে তাঁর ভয় হত। অথচ উপায় নেই। ভয়ে ভয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখতেন, তাঁরই বয়সী আটটি মেয়ে পথে দাঁড়িয়ে আছে। তারাও যাবে নাইতে। সকলে একসঙ্গে গল্প করতে করতে যেত। চারজন তাঁর সামনে—চারজন পিছনে। স্নান করে বাড়ির কাছ পর্যন্ত সকলে আসত একসঙ্গে। রোজই আটটি মেয়ে তাঁর স্নানের সময় অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকত।...অনেক পরে সারদাদেবী জেনেছিলেন, তারা ঐ গ্রামের মেয়ে নয়।... ৺দেবীর অষ্টসখী—অষ্টনায়িকা ৺দেবীকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকতেন অলক্ষ্যে।

ও কি সাধে ঘুমিয়েছে? এসব কথা শুনলে ও এখানে থাকবে নি, চোঁচা দৌড় মারবে।" —নিজের স্বরূপতত্ত্ব শুনলে শ্রীসারদাদেবী একেবারে স্বরূপে লীন হয়ে যাবেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসেছেন। সারদাদেবীও গেলেন জয়রামবাটীতে। তারপর সুদীর্ঘ চারিটি বৎসর—দীর্ঘ বিস্মৃতির অবগুণ্ঠনে অবলুপ্ত।—তিনি কোন খোঁজ নেন না, আসেনও না—ডাকেনও না। তবে কি তিনি ভুলে গেলেন? তাঁর চরণ-ছায়াতেই যে আমার একমাত্র বিশ্রান্তি! সারদাদেবীর বিরহ-বিধুর প্রাণে বাজে এ ক্রন্দনধ্বনি। ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে নানা কথা রটে গেল গ্রামময়।—তিনি নাকি উলঙ্গ হয়ে লম্বালাঠি ঘাড়ে করে বেড়ান!. কাঙ্গালীদের এঁটো খান, মেথরের মত পায়খানা সাফ্ করেন—আরো কত কথা! সারদাদেবীর অন্তরের অব্যক্ত বেদনা কে বুঝবে? আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি তপ্তনিঃশ্বাস ফেলেন।

—লোকে যা বলে তা-ই যদি হয়? আমার তো আর দূরে থাকা ঠিক হচ্ছে না!—ভাবলেন সারদাদেবী। দক্ষিণেশ্বরে যাওয়াই তিনি স্থির করলেন। সারদার মনের ভাব জানতে পেরে পিতাই তাঁকে নিয়ে চললেন দক্ষিণেশ্বরে।

রাত প্রায় ন'টায় দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে শ্রীসারদা সোজা চলে গেলেন শ্রীঠাকুরের ঘরে। অবগুণ্ঠিতা পত্নীকে দেখেই তিনি আনন্দে বললেন—"তুমি এসেছ? বেশ করেছ। মাদুর পেতে দে রে।..." এ দু'টি মাত্র কথাতেই শ্রীসারদার প্রাণ আনন্দে ভরে গেল। চোখ ঝাপসা হয়ে এল প্রাণের আবেগে।

স্ত্রী জ্বরগায়ে এসেছে শুনে মহাব্যস্ত হয়ে পড়লেন শ্রীঠাকুর। স্ত্রীকে রাখলেন নিজের ঘরে এবং অজস্র আন্তরিকতায় ভরিয়ে দিলেন। শ্রীঠাকুরের সেবাযত্ন ও চিকিৎসাদিতে তিন-চার দিনেই সেরে উঠলেন সারদাদেবী। —আহা! তাঁর কত স্নেহ-মমতা, কত টান, কত গভীর আন্তরিকতা! সারদার প্রাণ একেবারে গলে গেল; ভীষণ রাগ হতে লাগল তাঁর নিজের উপরই—কেন এতদিন আসি নি! তিনি বুঝলেন—পাঁচজনে যা রটিয়েছে তা কত নিছক-মিথ্যা। আহা! তিনি যে আরো প্রেমময় হয়ে গেছেন, যেন প্রেমরূপী ভগবান!—ভাবেন সারদাদেবী। শ্রীঠাকুরও দিনে দিনে মমতার আবেষ্টনে স্ত্রীকে আরো কাছে টেনে নিলেন। আর তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে তুলে দিলেন সারদার হাতে।

শ্রীসারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে প্রায় দু'মাস থাকার পরেই শ্রীঠাকুর ষোড়শীজ্ঞানে তাঁর পূজা করলেন*। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সত্যদৃষ্টির সামনে সারদাদেবীর বাস্তব স্বরূপ যেন প্রকটিত হয়েছিল। পূজাকালে

* ষোড়শী-পূজার সময় সম্বন্ধে 'লীলাপ্রসঙ্গে' উল্লেখ আছে যে, ১২৮০ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীঠাকুর ষোড়শীপূজা করেন। অর্থাৎ শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে আসার চৌদ্দ-পনর মাস পরে। শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১২৮ পৃষ্ঠায় দেখতে পাওয়া যায়—"...দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকার পরেই ষোড়শীপূজা করলেন।...এর পরে দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এক বৎসর ছিলাম।...শেষটায় অসুখ হতে দেশে যাই। ইত্যাদি।" শ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র জীবনের অনেক ঘটনার পৌর্বাপর্য ও সামঞ্জস্যের দিক দিয়ে দেখলে, শ্রীমায়ের নিজের কথাই আমাদের বেশী সমীচীন বলে মনে হয়। আর ষোড়শীজ্ঞানে পূজা করার পরেই ঠাকুর পত্নীকে আট মাস রাত্রে নিজের কাছে রেখেছিলেন, এরূপ হবারই বেশী সম্ভাবনা।

দেবীর আসনে বসেই সারদাদেবী ভাবস্থা হয়ে পড়েন। শ্রীঠাকুর তাঁর পায়ে আলতা পড়িয়ে দিলেন, সিন্দূর দিলেন কপালে; তাঁকে কাপড় পরালেন, পানমিষ্টি খাওয়ালেন। সারদাদেবী পরে শ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণির কাছে ঐ পূজা সম্বন্ধে গল্প করেন। তখন লক্ষ্মীমণি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি তো অত লজ্জা কর—কাপড় কি করে পরালেন গো!" তিনি বললেন—"আমি তখন কি রকম যেন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলুম!..." পরে সারদাদেবী ও ঠাকুর দু'জনেই গভীর সমাধিমগ্ন হলেন। পূজক ও দেবী এক হয়ে গেলেন আত্মস্বরূপে। তাঁদের দাম্পত্য জীবনের এইটিই পরিপূর্ণ রূপ—সম্পূর্ণ পরিচয়। তবু লীলাময়ীর স্ত্রীরূপে লীলা পূর্ণমাধুর্যময়। স্বামিসেবা ও সাহচর্যে কত আনন্দ! সেবারূপে, ক্ষমা লজ্জা তুষ্টি ও শান্তিরূপে তিনি ত্যাগমূর্ত্তি শিব-স্বামীর সেবায় সদা তৎপরা।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে পূজা করেছিলেন। শ্রীঠাকুর তো মাটির শিব গড়েও পূজা করতেন। মৃন্ময় মূর্তিতে চিন্ময়ের প্রকাশ দেখতেন। রমণীমাত্রই পেয়েছে তাঁর পূজা। তাঁর এ ষোড়শীপূজা একটু স্বতন্ত্র ধরনের নয় কি?

২

শ্রীসারদাদেবী যখন দক্ষিণেশ্বরে আসেন তখন তিনি সবেমাত্র উনিশ বৎসরে পড়েছেন। ঐ সময় হতে তাঁর দাম্পত্য জীবন ও সাধনভজন চলেছিল পাশাপাশি। জাগতিক সম্বন্ধে শ্রীঠাকুর ও শ্রীমা— স্বামি-স্ত্রী। কিন্তু এইটুকুতেই তো তাঁদের সম্বন্ধের পূর্ণ পরিচয় হল না! এ যেন নেহাৎ বাহ্যিক সম্বন্ধ। ...শ্রীঠাকুরের প্রতি শ্রীমার ভক্তি ও টান দেখে হৃদয়রাম একটু মজা করবার জন্ম মামীকে বললেন—"সবাই তো মামাকে বাবা বলছে। তুমিও বাবা বলে ডাকতে পার? অতি সহজকণ্ঠে সারদাদেবী উত্তর দিলেন— "উনি বাবা কি বলছ, হৃদু? উনি আমার বাবা মা, সব কিছু।" অন্যসময়ে জনৈক ভক্তের প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন—"আমি তাঁকে সন্তানভাবে দেখি।" শ্রীঠাকুর এক সময়ে বলেছিলেন— "দু'জনেই মায়ের সখী।" ...শ্রীমা ঠাকুরকে ভাবতেন সকল সম্বন্ধের ঘনীভূত মূর্তিরূপে। উপরি উক্ত উদ্ধৃতি থেকে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে রহস্যময় গোপ্য সম্বন্ধ ছিল তার কথঞ্চিৎ আভাস যদিও পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে করে ঐ ঐশী সম্বন্ধের মর্মোদ্ঘাটন হয় না; বরং আরো জটিলতর হয় তাঁদের পারস্পরিক ঐ দিব্য সম্বন্ধটি।

শ্রীঠাকুরের সাধন-জীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস তবু কতকটা জানা যায়। কিন্তু শ্রীমা'র জীবনের বহু ঘটনার ন্যায় তাঁর সাধনার ইতিহাসও অশ্রুত, অজ্ঞাত। তাঁর অধিকাংশ সাধনই অনুষ্ঠিত হয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

মুমুক্ষু বা সাধারণ সাধক সাধনা করে নিজের মুক্তির জন্য। আর আধিকারিক পুরুষদের সাধনা—আদর্শ উপস্থাপিত করার জন্য এবং সমষ্টি-মুক্তির জন্য। সাধনা হিসাবে দু'শ্রেণীর মানবের সাধনাই বাহ্যতঃ এক, কিন্তু উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনরূপে সর্বৈব ভিন্ন।

বাল্যজীবনে শ্রীসারদাদেবীর বিশেষ কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা ভাব-সমাধি সম্বন্ধে কিছু শুনা যায় না। দক্ষিণেশ্বরে ষোড়শীপূজার রাত্রে তাঁকে আমরা প্রথম সমাধিস্থা দেখতে পাই। ঐ রাত্রেই যেন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম উন্মেষ হয়েছিল। তার পরে পরে তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত নিয়মিত ভজনসাধন করেছিলেন। অনেক দিন যাবৎ লক্ষ জপ সমাপন না করে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। মহামৌনের ধ্যানে জেগে থাকতেন রাত রাত। শ্রীমায়ের কথাতে তার একটু আভাস পাওয়া যায়—"সে সব কি দিনই গিয়েছে! জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের পানে তাকিয়ে জোড়হাতে বলেছি—'তোমার এ জ্যোৎস্নার মত আমায় নির্মল করে দাও।'" রাত্রে চাঁদ উঠেছে, তিনি কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছেন—"চাঁদেও কলঙ্ক আছে; হে ভগবান্, আমার মনে যেন কোন দাগ না থাকে।...আমার কথা কি বলবো, মা, আমি তখন দক্ষিণেশ্বরে রাত তিনটার সময় উঠে বসতুম। কোন হুঁশ থাকতো না। একদিন জ্যোৎস্না-রাতে নবতে সিঁড়ির পাশে বসে জপ করছি। চারদিক নিস্তব্ধ। ঠাকুর যে সেদিন কখন ঝাউতলায় শৌচে গেছেন, কিছুই জানতে পারি নি; অন্য দিন জুতার শব্দে টের পাই। খুব ধ্যান জমে গেছে। তখন আমার অন্যরকম চেহারা ছিল—গয়না

পরা, লালপেড়ে শাড়ী। গা থেকে আঁচল খসে বাতাসে উড়ে উড়ে পড়ছে। কোন হুঁশ নেই। ছেলে যোগেন সেদিন ঠাকুরের গাড়ু দিতে গিয়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখেছিল।··· দক্ষিণেশ্বরে রাতে কে বাঁশী বাজাত, শুনতে শুনতে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। মনে হত সাক্ষাৎ ভগবান বাঁশী বাজাচ্ছেন—অমনি সমাধি হয়ে যেত।···

এই যে অতি অল্পেতেই সমাধি, অথচ সে সমাধি-অবস্থার বাহ্যিক প্রকাশ খুবই কম দেখা যেত। শ্রীঠাকুরের অন্যতম ঈশ্বরকোটী-পার্ষদ স্বামী প্রেমানন্দ এক সময় বলেছিলেন—"তিনি (শ্রীমা) শক্তিরূপিণী কিনা, তাঁর চাপবার ক্ষমতা কত! ঠাকুর চেষ্টা করেও (চাপতে) পারতেন না, বাইরে বেরিয়ে পড়ত। মা-ঠাকরুণের ভাবসমাধি হচ্ছে, কিন্তু কাকেও জানতে দেন?" তাঁর অতি সহজে স্বরূপে স্থিতি। আবার নিত্যে ও লীলায় অতি সহজ আনাগোনা!

শেষের দিকে শ্রীমা যে রাত জেগে মালাজপ করতেন, তা আশ্রিত সন্তানদের মুক্তির জন্য। তিনি বলেছিলেন—"বাবা, আমার ছেলেরা কে কোথায় কি করছে না করছে, তাদের জন্য দু'টো করে রাখি।" অনেক ভক্তসন্তানের প্রশ্নে শ্রীমা বলেছেন—"তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করতে হয় আমি করব।" সন্তানের প্রশ্ন হল—"কিছুই করতে হবে না?" —"না, কিছুই না।" —"কিছুই করতে হবে না?"—"না, কিছুই না।"—ত্রিসত্য করে শ্রীমা বলেছেন। আরও বলেছেন কৃপাময়ী মা—"যেখানে যত সন্তান আছে, সকলের জন্যই আমার করতে হয়।" মাতৃরূপে তিনি করেছিলেন মুক্তির সহজ ব্যবস্থা।

শ্রীমা

শ্রীমা প্রথম দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের নিকট আসেন ১২৭৮ সালে (১৮৭২ খ্রীঃ, মার্চ)। ঐ সময় হতে ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ—শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগ পর্যন্ত, এই সুদীর্ঘ পনরটি বৎসরকে শ্রীমা'র সাধনকাল বলা যেতে পারে। ঐ সময়ে তাঁর সর্বাপেক্ষা তীব্রসাধনা—ঠাকুরের সেবা। ঐ সাধনা পরবর্তী কালে শ্রীবৃন্দাবন ও বেলুড়ের পঞ্চতপা প্রভৃতি সাধনাকেও যেন ম্লান করে দিয়েছিল। ঐ সাধনার কালে শ্রীমাকে, যিনি বিশ্বমাতৃত্ব-বিকাশের জন্য জগতে এসেছিলেন,* আমরা দেখতে পাই আদর্শ স্ত্রীরূপে। আর শ্রীরামকৃষ্ণ আদর্শ স্বামী।

শ্রীঠাকুরের সাধনা যেন পার্বত্য স্রোতস্বিনীর মত খরস্রোতা। আর শ্রীমার সাধনা যেন শান্ত-অন্তঃস্রোতা ফল্গু। ঠাকুর বহু সাধনার ভিতর দিয়ে একত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীমা একত্বে প্রতিষ্ঠিতা থেকে যেন বল্লরীর ন্যায় লতায়িতা হয়েছেন বহু সাধনার ভিতর দিয়ে। তাঁর ইষ্ট—সর্বদেবদেবীময়, সর্বভাবময়।

শ্রীসারদাদেবীর জন্ম পল্লীগ্রামের উন্মুক্ততার ভিতর, কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে তাঁকে থাকতে হত নবতের এইটুকু ছোট বদ্ধ ঘরে। ওর-ই মধ্যে রান্না, খাওয়া, থাকা—ঠাকুরের জন্য রান্না, ভক্তদের জন্য রান্না, বাসনপত্র, যাবতীয় জিনিস, তোলা উনুন, শিকের উপর শিকে, জলভরা মাছের হাড়িটি পর্যন্ত। ঐ ঘরটুকুতে শ্রীমা ঠাকুরের সেবা নিয়ে বৎসরের পর বৎসর কাটিয়েছিলেন। রাত তিনটায় শৌচাদি সেরে গঙ্গাস্নান করে তিনি ঐযে

* শ্রীসারদাদেবীর নিজের কথা—"মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"

ঘরটিতে ঢুকতেন, শৌচাদির বেগ হলেও আর বের হবার জো ছিল না।*

দক্ষিণেশ্বরে দেবী-দেউলের এক রুদ্ধ কক্ষে থাকা! সারাদিন যাত্রিসমাগম, সাধু-কাঙ্গালীদের মেলা, লোকজন সর্বত্র থৈথৈ করত সর্বক্ষণ। 'লজ্জারূপিণী' শ্রীসারদাদেবী নিজেকে এত বাঁচিয়ে চলতেন যে, কেউ তাঁর ছায়াটি পর্যন্ত দেখতে পেত না। কয়েক বৎসর পরে মন্দিরের খাজাঞ্চী বলেছিলেন—"তিনি আছেন শুনেছি, কিন্তু কখনো তো দেখি নি!"

লোকচক্ষুর অন্তরালে ঐ নিত্যসিদ্ধা করতেন শ্রীঠাকুরের অকুণ্ঠ সেবা। পরে ভক্তদের সেবাও তিনি সানন্দে করতেন। তিনসের সাড়ে-তিনসের আটার রুটিই তাঁকে করতে হত রোজ। অথচ সদানন্দময়ী। নিজের সম্বন্ধে তিনি এক সময় বলেছিলেন— "...আমার কি তা হলে সবই অলৌকিক! অশান্তি বলে তো কখনো কিছু দেখলুম না! আর ইষ্টদর্শন—সে তো হাতের মুঠোর ভিতর, একবার বসলেই দেখতে পাই! দক্ষিণেশ্বরে নবত দেখেছ? সেইখানেই থাকতুম। প্রথম প্রথম ঘরে ঢুকতে মাথা ঠুকে ঠুকে যেত। একদিন কেটেই গেল। শেষে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। দরজার সামনে গেলেই মাথা নুয়ে আসত। কলিকাতা থেকে সব মোটাসোটা মেয়েলোকেরা দেখতে যেত, আর দরজার দু'দিকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে বলত—'আহা! কি ঘরেই আমাদের সীতা-লক্ষ্মী আছেন গো—যেন বনবাস গো!'... বদ্ধস্থানে

* শ্রীমাকে বলতে শোনা গেছে—"তখন তখন এমনো হয়েছে যে, আজকের হাগা কাল হেগেছি।"

থেকে থেকে ঐ যে তাঁর পায়ে বাতের সূত্রপাত হল, তা তাঁকে সারাজীবন খুব কষ্ট দিয়েছে।

দেহটি বাস করত নবতে, কিন্তু তাঁর সমগ্র মনপ্রাণ—সকল ইন্দ্রিয় যেন ঘুরে বেড়াত ঠাকুরের কাছে কাছে। ঐ ঘরে বসেই অপলক দর্শন ও অবাধ শ্রবণ চলেছে! বালকভক্ত সারদাপ্রসন্নকে শ্রীঠাকুর নিজের ঘরে বসে বলছেন—"সেয়ারের গাড়ীভাড়ার জন্য নবত থেকে চারটি পয়সা চেয়ে নে।" সারদা এসে দেখেন—আগে থেকেই চারটি পয়সা সিঁড়ির গোড়ায় রাখা আছে। শ্রীমা পরে বলেছিলেন—"...আমি নবতে হাজার কাজ নিয়ে থাকলেও, আমার মন সর্বদা ঠাকুরের কাছে পড়ে থাকত। অত দূর থেকে খুব আস্তে আস্তে কথা বললেও আমি সব শুনতে পেতাম।" দিবারাত্র সর্বক্ষণ ঠাকুরের উপর সতর্ক দৃষ্টি, আর চলেছে আত্মবৎ সেবা—অভেদজ্ঞানে শ্রীঠাকুরের সেবা। এই সেবার ভিতর দিয়ে হয়েছিল দু'জনের নিত্যমিলন, আর ঐ সাধনার ভিতর দিয়ে অভেদজ্ঞান। শ্রীমা পরবর্তী কালে নিজের শরীর দেখিয়ে বলেছিলেন—"এর ভিতর তিনি সূক্ষ্মদেহে আছেন। শ্রীঠাকুর নিজমুখে বলেছেন—'আমি তোমার ভিতর সূক্ষ্মদেহে থাকব'।"

ক্রমে ভক্ত-সমাগম বাড়তে লাগল। আনন্দময়ী সেবারূপে ঠাকুরকে যেমন তৃপ্তি ও আনন্দ দিতেন, তেমনি অলক্ষ্যে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ছিল তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি ভক্তদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি। ক্রমে তিনি হলেন 'ভক্ত-জননী'। ভক্তরা আসত শ্রীঠাকুরের আকর্ষণে, তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক-চেতনা লাভ করতে।

সে সঙ্গে তারা নবত থেকেও এমন কিছু পেতে লাগল, যাতে করে 'নবতবাসিনী'কে বরণ করল দেবীমাতৃত্বে এবং তখন হতে দেখা যায় শ্রীসারদাদেবী যেন ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকটিতা করছেন। তিনিও শ্রীভগবানের পাশে এসে দাঁড়ালেন—ভগবতীরূপে।

দক্ষিণেশ্বরেই শ্রীমায়ের ঐশীশক্তি-বিকাশের প্রথম সূচনা দেখতে পাওয়া যায়। জনৈক স্ত্রীলোক পারিবারিক এক মহা অনর্থের প্রতিকার-আশায় কোন মন্ত্র বা ঔষধ দেবার জন্য শ্রীঠাকুরকে ধরে বসেছে। শ্রীঠাকুর নিজে কিছু না দিয়ে স্ত্রীলোকটিকে নবতঘর দেখিয়ে বললেন—

"পূরিবে বাসনা গিয়া জানাও তাঁহারে,
আমি কিবা জানি, তিনি আমার উপরে।" (পুঁথি)

শ্রীমা কিছু করে দিতে রাজী হচ্ছেন না—স্ত্রীলোকটিকে শ্রীঠাকুরের কাছেই পাঠাচ্ছেন; এদিকে শ্রীঠাকুরও ছাড়বেন না। অগত্যা তার প্রতিকার শ্রীমাকেই করতে হল।

"বিল্বপত্র দিয়া মাতা বলিলেন তারে।
বাসনা পূরিবে, এই লয়ে যাও ঘরে।" (পুঁথি)

* * *

ক্রমে ত্যাগি-ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ নিয়মিতভাবে দক্ষিণেশ্বরে বাস করতে লাগলেন। শ্রীঠাকুর তাঁদের চালিত করছেন ত্যাগের পথে অতি সন্তর্পণে। তাঁদের আহার-বিহার, ভজন-সাধন সকল দিকেই তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়ে তাঁদের তিনি নিয়ে চলেছেন আদর্শের দিকে। ছেলেরা কে ক'খানা রুটি খাবে, তা পর্যন্ত নবতে গিয়ে তিনি

বলে আসেন। বেশী খেলে ভজন-সাধনের ব্যাঘাত হবে, তাই এত সতর্কতা।

বাবুরামের বরাদ্দ চারখানা, আর রাখালের ছ'খানা রুটি। আর আর সকলেরও এমনি করে নির্দিষ্ট আছে। নবত থেকে খেয়ে আসার পরে শ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করতেন—কে ক'খানা রুটি খেয়েছে। একদিন রাখালকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন যে—সাতখানা খেয়েছেন। শ্রীঠাকুর শুনে গুম্ হয়ে গেলেন। কারণ ছ'খানা রুটি খাবার কথা। অন্যদিন খাবার পরে বাবুরামকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হাঁরে, ক'খানা রুটি খেলি?" বাবুরাম—"ছ'খানি।" শ্রীঠাকুর গম্ভীরভাবে বললেন—"এত বেশী খেলি কেন?" বাবুরাম—"মা দিলেন যে!" শুনে শ্রীঠাকুর বিচলিত হলেন। চটীজুতা পায়ে দিয়ে একেবারে নবতে গিয়ে হাজির এবং একটু অনুযোগের সুরে বললেন—"তুমি ছেলেগুলোকে মানুষ হতে দেবে না! ওরা যে সাধু হবে গো! এ বয়সে এত বেশী খেলে চল্‌বে কেন?"

ছেলেদের খাওয়া সম্বন্ধে কথা শুনে মায়ের প্রাণে আঘাত লাগল। বেদনাভরাকণ্ঠে শ্রীমা বললেন—"একদিন দু'খানি রুটি বেশী দিয়েছি বলে এত কথা!...তা আমিই ওদের দেখাশুনা করব। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে ছেলেদের তুমি কিছু বলো না।" শ্রীঠাকুর চুপ করে শুনে মৃদু হেসে চলে এলেন নিজের ঘরে। অন্য দিনের ঘটনা। শ্রীমা বলেছিলেন—"বাবুরামকে একসময় একটু মিছরির-পানা খেতে দিয়েছিলাম। বাবুরামের তখন পেটের অসুখ। ঠাকুর তা দেখতে পেয়েছিলেন। আমাকে একদিন বললেন—

'তুমি বাবুরামকে কি খেতে দিয়েছিলে ?' আমি বললুম—'মিছরির পানা।' ঐ কথা শুনে ঠাকুর বললেন—'ওদের যে সাধু হতে হবে। ওসব কি অভ্যাস করাচ্ছ !' "

এইভাবে চলেছিল ত্যাগীদের শিক্ষাদীক্ষা। একদিকে শ্রীঠাকুরের কঠোর ব্যবস্থা, অন্যদিকে শ্রীমা'র কোমল স্নেহ-আচ্ছাদন। যেন দু'টি শক্তিশালী চুম্বকের দু'দিক থেকে আকর্ষণে তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন যথাস্থানে সংহত হয়ে চলেছিল অগ্রগতির পথে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে অন্তরঙ্গ শিষ্যরা পেয়েছিলেন অনেক কিছু। ভাব, সমাধি, নির্বিকল্প স্থিতি—আরো অনেক কিছু। যাঁর যা প্রয়োজন তিনি তাই দিচ্ছিলেন অকৃপণ হস্তে। কিন্তু শ্রীমার কাছ থেকে তাঁরা এমন কি পেয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর কাছে এতটা আত্মসমর্পণ ? তাঁর ভিতর আকর্ষণের এমন কি ছিল ? শ্রীমা এবার 'রূপ ঢেকে এসেছিলেন'। তিনি লেখাপড়া জানতেন অতি সামান্য। দু'একটি ত্যাগি-সন্তান ছাড়া আর কারো সঙ্গে শ্রীমা সামনাসামনি কথাও বলতেন না। তবুও তাঁরা এমন কী দেখেছিলেন শ্রীমার মধ্যে, যার ফলে তাঁকে জগন্মাতার জীবন্তরূপ বলে মেনে নিয়েছিলেন ? শ্রীমা একটু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন তো তাঁরা নিজেদের মহাধন্য জ্ঞান করতেন !

ত্যাগি-শিষ্যগণ সকলেই শ্রীঠাকুরকে খুবই যাচিয়ে বাজিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমা'র চরণতলে কি তাঁরা নির্বিচারে মাথা নত করেছিলেন ?

শ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল। সেই রাখাল মহারাজ পরবর্তী

কালে শ্রীমার সামনে যেতে এমনই আবিষ্ট হয়ে যেতেন যে, সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-পুলক হত আর ভাবে সারা শরীর কাঁপত, দু'গণ্ড প্লাবিত করে নেমে আসত আনন্দাশ্রুধারা। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমায়ের কাছে যখন যেতেন, যেন একটি শিশু। পাশ্চাত্ত্য-বিজয়যাত্রার পূর্বে 'মায়ের' আশীর্বাদে বলীয়ান হয়ে তিনি সমুদ্রপাড়ে পাড়ি দিয়েছিলেন। শ্রীমা আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"বাবা, তুমি বিশ্ববিজয়ী হয়ে ফিরে এসো। তোমার মুখে সরস্বতী বসুক।"*

* * *

নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ শিষ্যদের ন্যায় শ্রীসারদাদেবী বিশেষ সাধনা বা আধ্যাত্মিক অনুভূতির জন্য শ্রীঠাকুরকে খুব ধরাধরি করেছিলেন বলে কিছু জানা যায় না। প্রথমদিকে একদিন তিনি যোগীন্দ্রমোহিনীকে বলেছিলেন—"ওঁকে বোলো, যাতে আমার একটু ভাবটাব হয়। লোকজনের জন্য ওঁকে একথা বলবার আমার সুযোগ হয়ে উঠছে না।"

পরদিবস সকালে যোগীন্দ্রমোহিনী প্রণাম করে শ্রীমার কথা শ্রীঠাকুরের কাছে নিবেদন করেন। তিনি সব শুনলেন, কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে গম্ভীর হয়ে রইলেন। এদিকে স্ত্রীভক্তটি নবতে ফিরে এসে দেখেন—শ্রীমা পূজা করছেন। ভাবাবেশে কখনো খুব

---

* ১৮৯৪ সালে স্বামীজী আমেরিকা থেকে জনৈক গুরুভ্রাতাকে লিখেছেন: "...দাদা, রাগ করো না, তোমরা এখনো কেউ মা'কে বোঝ নি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়েও লক্ষগুণ বড়।...ঐ মায়ের দিকে আমি একটু গোঁড়া।...দাদা, মায়ের কথা মনে পড়লে সময় সময় বলি—কো রামঃ। দাদা, ঐ যে বলছি, ওইখানটায় আমার গোঁড়ামি।..." ইত্যাদি।

হাসছেন, আবার একটু পরেই কাঁদছেন—দু'চোখে অশ্রুধারা বয়ে যাচ্ছে। ক্রমে শ্রীমা গভীরসমাধিস্থা হলেন। অনেকক্ষণ পরে সমাধিভঙ্গ হতে স্ত্রীভক্তটি জিজ্ঞাসা করলেন—"তবে মা, তোমার নাকি ভাব হয় না ?"—শ্রীমায়ের ব্রীড়াবনত মুখে ফুটে উঠল কোমল হাসি। শ্রীঠাকুরের দেবসঙ্গ ও দিব্যশক্তি শ্রীমাকে অতি সহজে দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিতা করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনটি জ্বলন্ত-অগ্নিপরীক্ষায় সমুজ্জ্বল। তাঁর জীবনের মুখ্য বাণী 'ত্যাগ'। ত্যাগের কষ্টিপাথরেই হয় ধর্মজীবনের পরীক্ষা। বার্তাবহদের তিনি ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন; করেছিলেন ত্যাগধর্মে অভিষিক্ত। ঐ শিক্ষা হতে তাঁর লীলাসঙ্গিনীও বাদ পড়েন নি। মাড়োয়ারী-ভক্ত লছমীনারায়ণ শ্রীঠাকুরের সেবার জন্য দশহাজার টাকা দিতে চাইলেন। তিনি অতি দৃঢ়তার সহিত ঐ টাকা প্রত্যাখ্যান করেন। তখন লছমীনারায়ণ শ্রীমা'র নামে ঐ টাকা দেবার প্রস্তাব করে। শ্রীঠাকুর সারদাদেবীকে নবত থেকে ডাকিয়ে এনে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করে বললেন—"ওগো, এ টাকা দিতে চাচ্ছে; তুমি ঐ টাকা নাও না কেন; কি বল ?" শুনেই শ্রীমা বললেন—"তা কেমন করে হবে ? টাকা নেওয়া হবে না। আমি নিলে ঐ টাকা তোমারই নেওয়া হবে। কারণ, আমি রাখলে তোমার সেবা ও অন্যান্য আবশ্যকে তা ব্যয় না করে থাকতে পারব না, সুতরাং ফলে তোমারই গ্রহণ করা হবে। তোমাকে লোকে শ্রদ্ধাভক্তি করে তোমার ত্যাগের জন্য। অতএব টাকা কিছুতেই নওয়া হবে না।" তাঁর কথা শুনে শ্রীঠাকুর নিশ্চিন্ত হলেন।

অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে সারদাদেবীর জন্ম। অন্নের

ধান ভেঙে, পৈতা কেটে অনেক সময় তাঁদের জীবিকা অর্জন করতে হয়েছিল। ঐ দারিদ্র্যের মধ্যে লালিতপালিতার পক্ষে এক কথায় দশহাজার টাকা প্রত্যাখ্যান করা বাস্তবিকই অসাধারণ। শ্রীঠাকুর ত্যাগের সাধনায় সিদ্ধ হয়ে মাটি ও টাকায় সমজ্ঞান লাভ করেছিলেন। আর শ্রীসারদাদেবী ঐ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন ঐ দেবমানবের জীবনপ্রভাবে।

শ্রীমা'র দক্ষিণেশ্বরের জীবনটি পূর্ণমাধুর্যময়। দিবারাত্র ঠাকুরের সেবা-সঙ্গ, ভজনসাধন সব চলেছে অবিচ্ছিন্ন ধারায়। এদিকে ঠাকুরের ঘরে ভক্ত-সমাগম, উদ্দীপনাময় ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, নৃত্যগীত, ভাবসমাধি—সব সময় যেন গম্‌গম্‌ করছে। কখনো উচ্চ-সংকীর্তন হচ্ছে—হরিনামের রোল, হুহুঙ্কার ছেড়ে তিনি নৃত্য করছেন—মাতামাতি কাণ্ড! কেউ হাসে, কেউ কাঁদে, কেউ নাচে-গায়—যেন বৈকুণ্ঠধাম। শ্রীমা নবতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাটাইয়ের বেড়ার ফাঁক দিয়ে অতৃপ্তনয়নে দর্শন করতেন সে প্রেমলীলা, মগ্না হয়ে যেতেন আনন্দে, উল্লসিতা হতেন। দিনরাত কেটে যাচ্ছে দিব্যতন্ময়তার ভিতর দিয়ে, যেন দেহাতীত সত্তায় বিরাজ করতেন সর্বক্ষণ।

শ্রীঠাকুরের পেটরোগা ধাত। সব রকম খাবার সহ্য হয় না। সারদাদেবী তাঁর পেটে যা সয় তেমনটি সযত্নে রান্না করে সামনে বসে ভুলিয়ে-ভালিয়ে, নানা গল্প করে তাঁকে খাওয়াতেন। শ্রীঠাকুরের মনের সহজগতিই ছিল ঊর্দ্ধদিকে। একটু ঈশ্বরীয়প্রসঙ্গ হল তো, তিনি একেবারে ভাবস্থ হয়ে যেতেন। তখন কোথায় পড়ে থাকত খাওয়া-দাওয়া! শ্রীমা যেন জোর করে তাঁর মনকে সাধারণ-ভূমিতে টেনে রাখতেন।

নবতে থাকতে স্ত্রীর কষ্ট হয় বুঝে, শ্রীঠাকুর শ্রীমাকে মাঝে মাঝে পাঠিয়ে দিতেন কামারপুকুর ও জয়রামবাটীতে। এইভাবে দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে—শ্রীমা ছ'সাতবার শ্বশুরালয়ে ও পিত্রালয়ে গিয়েছিলেন। এদিকে তিনি চলে গেলেই ঠাকুরের খাওয়াদাওয়ার কষ্ট হত। ঠাকুরও তখন ব্যস্ত হয়ে খবর পাঠাতেন—"তুমি শীঘ্র চলে এসো।"

নবতে ঐ বদ্ধস্থানটিতে থেকে থেকে শ্রীমার স্বাস্থ্য খুবই ভেঙ্গে পড়ল। তা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম রসদদার শম্ভুবাবু মন্দিরের বাইরে গ্রামের দিকে জমি কিনে, শ্রীমার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। ঐ বাড়ির জন্য কাঠ দিলেন অন্য ভক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায়। একখানা গুঁড়িকাঠ জোয়ারে ভেসে গেল। তাতে হৃদয়রাম শ্রীমাকে 'তোমার মন্দ ভাগ্য' ইত্যাদি বলে কটুকথা শুনিয়েছিলেন। শ্রীঠাকুর সব শুনে হৃদয়কে সাবধান করে দিলেন—"দেখ হৃদু, এখানে যা অপরাধ করিস্ তার মাফ্ আছে। কিন্তু ওর ভিতর যে আছে, সে যদি একবার ফোঁস্ করে তো ব্রহ্মাবিষ্ণুও তোকে রক্ষা করতে পারবে না।"

শ্রীমা'র খুবই দরাজ-হাত ছিল। তিনি বরাবরই লোকজনকে দিতেথুতে, খাওয়াতে, আদর-যত্ন করতে ভালবাসতেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে অনেক ফলমিষ্টি এসেছে। তিনি সবই বিলিয়ে দিলেন। শুনে ঠাকুর একটু অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন—"অত খরচ করলে চলবে কি করে?" ঐ কথা শুনে শ্রীমা কিছু না বলে একটু অভিমান-ভরে তাঁর সামনে থেকে চলে গেলেন। শ্রীমাকে মুখ-ঘুরিয়ে চলে যেতে দেখেই, ঠাকুর অতিশয় বিচলিত হয়ে রামলালকে

ডেকে বললেন—"ওরে রামলাল, তোর খুড়ীকে শীঘ্র গিয়ে শান্ত কর। ও বিরূপ হলে আর রক্ষা নেই।"

শ্রীঠাকুর ও শ্রীমা'র মধ্যে যে সম্বন্ধটি ছিল তা খুবই রহস্যময়। তাঁদের দু'টি প্রাণ যেন একই সুরে বাঁধা। একটিতে স্পর্শ করলেই অন্যটিতে বেজে উঠে তার ঝঙ্কার। প্রাণের গভীরে তাঁরা দু' নন, যেন এক। স্বরূপতঃ অভিন্ন বলেই তাঁরা একে অন্যের প্রিয়তম। কোন ভাগ্যবানকে সারদাদেবী পরে বলেছিলেন—"বাবা, ঠাকুর ও আমাকে অভেদ-ভাবে দেখবে। আমরা এক।" করুণাময়ী অন্য সময়ে জনৈক সন্তানের কাছে নিজের সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন—"দেখ মা, এ শরীর (নিজ শরীর দেখিয়ে) দেব-শরীর জেনো।··· আমি থাকতে কেউ আমায় জানতে পারবে না, পরে বুঝবে।···"

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন ছদ্মবেশে। শ্রীসারদাদেবী এসেছিলেন সঙ্গোপনে—স্বরূপ ঢেকে। শ্রীঠাকুরের জীবদ্দশায় এমনকি তাঁর বিশেষভক্তদের মধ্যে অনেকেও সারদাদেবীকে 'দেবীরূপে' গ্রহণ করতে পারেন নি। শ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তিনি তাঁদের গুরুপত্নী ছিলেন, এতটুকুই ছিল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। (স্থানাভাবে সেসকল ঘটনার অবতারণা অসম্ভব)। শ্রীঠাকুরের দেহাবসানের পরেও, যতদিন শ্রীসারদাদেবী তাঁর স্বরূপ অবগুণ্ঠিত রেখেছিলেন, ততদিন অনেক ভক্তের মনেই তাঁর সম্বন্ধে সাধারণ ধারণামাত্র ছিল।

শ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ স্ত্রীভক্ত যোগীন্দ্রমোহিনী। তিনি শ্রীমায়ের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁর ভাব সমাধি দেখেছেন, অজস্র স্নেহমমতাও পেয়েছিলেন শ্রীমা'র

কাছ থেকে। তিনি আদর করে স্ত্রীভক্তটিকে ডাকতেন—'মেয়ে যোগেন'। তবু ভক্তটির মনে সংশয়ের বীজ শিকড় গেড়ে ছিল। তিনি ভাবতেন—ঠাকুর অমন ত্যাগী ছিলেন, আর মাকে দেখছি যেন ঘোর-সংসারী! ভাই, ভাইপো, ভাইঝিদের জন্য অস্থির! যোগীন্দ্রমোহিনী একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে ধ্যান করছেন। শ্রীঠাকুর আবির্ভূত হয়ে বললেন—"দেখ, গঙ্গায় কি ভাসছে!" ভক্তটি দেখেন—নাড়িভুঁড়ি-জড়ান একটি সদ্যোজাত-শিশু গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছে। ঠাকুর তা দেখিয়ে বলছেন—"গঙ্গা কি এতে অপবিত্র হয়, না তাকে কিছু স্পর্শ করে? ওকে তেমনি জানবে। ওর উপর সন্দেহ এনো না। ওকে আর একে (নিজেকে দেখিয়ে) অভেদ জানবে।" গঙ্গা হতে ফিরে এসে স্ত্রীভক্তটি শ্রীমাকে প্রণাম করে বললেন—"মা, আমায় ক্ষমা কর।" "কেন যোগেন, কি হয়েছে?"—সস্নেহে জিজ্ঞাসা করেন শ্রীমা। তখন যোগীন্দ্রমোহিনী ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে বললেন—"তোমার উপর অবিশ্বাস এসেছিল। তা, ঠাকুর আজ আমাকে দেখিয়ে দিলেন।" শ্রীমা'র মুখে বালিকাসুলভ হাসি! সস্নেহে বললেন—"তার আর কি হয়েছে? অবিশ্বাস তো আসবেই। সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে। এই রকম করেই তো বিশ্বাস হয়। এই রকম হতে হতে বিশ্বাস পাকা হয়।" শ্রীঠাকুর নিজে জানিয়ে না দিলে, শ্রীমার সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানত না—বুঝত না।

* * *

ক্রমে শ্রীঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত হল। সঙ্গে সঙ্গে অবসান হল দক্ষিণেশ্বরের মধুময় দিনগুলির। দেবায়তন, দেবদেবী-বিগ্রহ,

যাত্রিসমাগম, বারমাসে তের পার্বণ—সবকিছুই যেমনকে তেমন আছে। তবু সবই যেন প্রাণহীন। সর্বত্রই শূন্যতার মর্মরধ্বনি।

শ্যামপুকুরে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতলবাড়ি ভাড়া করে ভক্তগণ অসুস্থ ঠাকুরকে তথায় নিয়ে এসেছেন। সুচিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু সুপথ্যের অভাবে চিকিৎসার আশানুরূপ ফল কিছুই দেখা গেল না। ভক্তগণ দক্ষিণেশ্বর থেকে শ্রীমাকে শ্যামপুকুরে আনার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু বাড়িতে তো অন্দরমহল নেই। চিরলজ্জাশীলা তিনি। কত অপরিচিত লোকজনের আনাগোনা! সর্বক্ষণ যাত্রি-সমাগম। এর মধ্যে তিনি থাকবেন কি করে? শ্রীমা'র কাছে প্রস্তাব উত্থাপন করতেই, তিনি সব অসুবিধা একদিকে ঠেলে ফেলে এলেন শ্যামপুকুরের বাড়িতে।

এখানে শ্রীমায়ের কৃচ্ছ্র সাধনার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। একমহল বাড়িতে সর্বসাধারণের স্নানের জন্য একটিমাত্র স্থান। রাত তিনটার পূর্বে শয্যাত্যাগ করে স্নানাদি সব সেরে, কখন যে ত্রিতলে ছাদের অপ্রশস্ত চাতালে চলে যেতেন, তা কেউ জানতে পারত না। সারাদিন ঐ সংকীর্ণ চাতালে থেকে তিনি ঠাকুরের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্যাদি প্রস্তুত করতেন, এবং যথাসময়ে লোকজন সরিয়ে দেওয়া হলে ঠাকুরকে পথ্যাদি খাইয়ে যেতেন। গভীর রাত্রে সকলে নিদ্রিত হলে, শ্রীমা নেমে যেতেন দ্বিতলে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ঘরে। বড়জোর তিনটি ঘণ্টা বিশ্রামের অবসর হত। ঐভাবে দীর্ঘদিন তিনি ঠাকুরের যাবতীয় সেবা ও ভজন-সাধনে নীরবে অতিবাহিত করেছিলেন।

তারপর কাশীপুরের বাগানবাটিতে শেষের ক'টি মাস শ্রীমা'র

কী উৎকণ্ঠার মধ্যেই না কেটেছে! ঠাকুরের কঠিন অসুখ, অসহ্য কষ্ট। দেখলে পাষাণহৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। জলটুকুও গিলতে পারছেন না! শ্রীমা বলেছিলেন—"এক-একদিন নাক দিয়ে, গলা দিয়ে, সুজি বেরিয়ে পড়ত—অসহ্য কষ্ট হত।..." অনন্যোপায় হয়ে শেষটায় শ্রীমা তারকেশ্বরে শিবের কাছে হত্যা দিতে গেলেন। নিরম্বু উপোস করে দু'দিন পড়ে রইলেন 'বাবার' মন্দিরে। কিন্তু কিছুই হল না। ফিরে আসতেই শ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—"কি গো, কিছু হল ? কিছু-ই না।"

ঐ নিদারুণ অসুখের মধ্যেও ঠাকুরের কত ভাবসমাধি, মহাভাব হচ্ছে! এদিকে চলেছে ভক্তদের তীব্র সাধন-ভজন-তপস্যা। শ্রীঠাকুর তাঁর অসুখকে অবলম্বন করে কাশীপুরে অনেককে কৃপা করলেন। তিনি একদিন কল্পতরু হয়ে বহু ভক্তের চৈতন্যসম্পাদন করেছিলেন। জগতে তাঁর উদারধর্মভাব-প্রচারের জন্য 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ত্যাগি-সঙ্ঘের' গঠনও হয়েছিল কাশীপুরে ঠাকুরের রোগশয্যা-পার্শ্বে। শ্রীমা পরে এক সময় বলেছিলেন—"কাশীপুর-বাগান তাঁর অন্ত্যলীলার স্থান। কত তপস্যা, ধ্যান-সমাধি হয়েছে! তাঁর মহাসমাধির স্থান। ওখানে ধ্যান করলে সিদ্ধ হয়।"

৩

শ্রীঠাকুর মহাসমাধিলাভ করলেন। শোকাকুলা শ্রীমা পরদিন ধারণ করলেন বিধবার বেশ। শ্রীঅঙ্গ হতে খুলে ফেললেন একে একে সকল আভরণ। যখন হাতের বালা খুলতে যাচ্ছেন, তখন ঠাকুর তাঁর দু'হাত চেপে ধরে বালা খুলতে দিলেন না। হাতের বালা খোলা হল না। শ্রীমা নিজের হাতে শাড়ীর পাড় ছিঁড়ে সরু করে নিলেন। এবং সে অবধি বরাবর তিনি সরু লালপেড়ে কাপড়ই পরতেন।

ঠাকুরের দেহাবসানের পর শ্রীমাও শরীর ছেড়ে দেবার সঙ্কল্প করেন। তখন ঠাকুর তাঁকে দেখা দিয়ে বললেন—"না, তুমি থাক। অনেক কাজ বাকী আছে।" কিন্তু শ্রীঠাকুর যে শূন্যতার সৃষ্টি করে চলে গিয়েছিলেন, তা শ্রীমা'র পক্ষে ক্রমেই অসহনীয় হয়ে উঠল। অথচ ঠাকুরের আদেশ—থাকতেই হল তাঁকে।

শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের সাত দিন পরে শ্রীমা কাশীপুর ছেড়ে বাগবাজারে ভক্ত বলরামবসুর বাড়িতে এলেন। তিনি যেন সব ধৃতি হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর প্রাণের অস্থিরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। সেজন্য ঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্তদের পরামর্শে শ্রীমা'র বৃন্দাবন-দর্শনে যাওয়া স্থির হল। বলরাম বাবুর বাড়িতে সাত দিন অতিবাহিত করে পনরই ভাদ্র শ্রীমা বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সঙ্গে ত্যাগি-সন্তান যোগেন, কালী ও লাটু। আর কয়েকজন স্ত্রীভক্ত। শ্রীমা পথে বৈদ্যনাথ, কাশী ও অযোধ্যা দর্শন

করেন। কাশীতে ৺বিশ্বনাথের আরাত্রিক-দর্শনকালে তিনি ভাবাবিষ্টা হয়েছিলেন। বৃন্দাবন-যাত্রা-প্রসঙ্গে শ্রীমা বলেছিলেন—"বৃন্দাবন যখন যাই, পথে যেতে যেতে দেখি কি ঠাকুর গাড়ীর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছেন—'কবচটি যে সঙ্গে রয়েছে, দেখো, যেন না হারায়।' তাঁর ইষ্ট-কবচটি আমার হাতে ছিল। আমি পূজা করতুম। পরে ও-টি মঠে দিলুম।"

বৃন্দাবনে তাঁরা ছিলেন বংশীবটে কালাবাবুর কুঞ্জে। ভগবানের লীলা-নিকেতন বৃন্দাবন। সব কিছুতে তাঁর লীলার স্পর্শ। ভাবময় পুণ্যভূমি কৃষ্ণময় বৃন্দাবনে এসে শ্রীমার শোকদগ্ধ-প্রাণ ক্রমে শীতল হয়। তিনি ডুবে গেলেন সাধন-ভজনের অতল-গভীরে; ভাব সমাধিতে বিভোর হয়ে থাকতেন সর্বক্ষণ। বিরহের অশ্রু ক্রমে রূপান্তরিত হল আনন্দ-প্লাবনে।

শ্রীঠাকুর একদিন শ্রীমাকে দেখা দিয়ে বলেন—"আমি যোগেনকে দীক্ষা দেই নি। তুমি ওকে মন্ত্র দাও।" এবং কি মন্ত্র দিতে হবে তাও বলে দিলেন। প্রথমটা শ্রীমা ততটা খেয়াল করেন নি, আর মনে মনে কেমন যেন লজ্জা বোধ করলেন, ভয়ও হল। দ্বিতীয় দিন ঠাকুর পুনরায় তাঁকে দর্শন দিয়ে দীক্ষা দেবার কথা বলেন। তখনো তিনি ততটা গা করলেন না। তৃতীয় দিন ঐ দর্শন পুনরায় উপস্থিত হলে তিনি ঠাকুরকে বলেন—"আমি তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কইনে, কি করে মন্ত্র দি-ই।" তাতে ঠাকুর বলেন—"তুমি মেয়ে-যোগেনকে বলো, সে থাকবে।" এদিকে ঠাকুর যোগেনকেও দেখা দিয়ে শ্রীমার কাছ থেকে মন্ত্র নেবার নির্দেশ দেন। কিন্তু যোগেন শ্রীমাকে তা বলতে সাহস করেন নি।

শ্রীমা স্ত্রী-ভক্তটির দ্বারা যোগেনকে (যোগানন্দ) জিজ্ঞাসা করে যখন জানলেন যে, ঠাকুর তাঁকে কোন ইষ্টমন্ত্র দেন নি, তখন তিনি দীক্ষা দিতে মনস্থ করলেন। শ্রীঠাকুরের ছবি ও দেহাবশেষ-রক্ষিত কৌটার পূজাকালে শ্রীমা যোগেনকে ডাকিয়ে কাছে বসতে বললেন। পূজা করতে করতে শ্রীমার গভীর ভাবাবেশ হল। সে ভাবাবস্থায়ই তিনি মন্ত্র দিয়েছিলেন। শ্রীমা এমন জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন যে পাশের ঘর হতেও তা শোনা যাচ্ছিল।

স্বর্গের অমৃতগঙ্গার পূতধারার ন্যায় শ্রীমায়ের এ কৃপাবারি পরে পরে কতশত প্রাণকে যে সঞ্জীবিত করেছিল, তা আমরা ক্রমে দেখতে পাব। তারিণী, তাপহারিণীরূপে বহু সন্তপ্ত নরনারীর পাপতাপ নিয়েছেন।

শ্রীঠাকুরের অদর্শন-ব্যথায় তখনো শ্রীমা প্রায়ই খুব কান্নাকাটি করতেন। একদিন তিনি দর্শন দিয়ে বলছেন—"তোমরা এত কাঁদছ কেন? আমি আর গেছি কোথা? এ-ঘর আর ও-ঘর বই তো নয়?"

শ্রীমা একদিন সকালে কুঞ্জে বসে ধ্যান করতে করতে ক্রমে এমন গভীরসমাধিস্থা হলেন যে, সমাধি আর কিছুতেই ভাঙ্গে না। স্ত্রীভক্তগণ অনেকক্ষণ নাম শোনালেন, তাতেও সমাধিভঙ্গ হল না। শেষে যোগীন (ত্যাগি-সন্তান) এসে নাম শুনাতে শুনাতে সমাধির কিঞ্চিৎ উপশম হল। সমাধিভঙ্গের সময় ঠাকুর যেমন বলতেন, তেমনিভাবে শ্রীমাও বললেন—"খাব।" খাবার জল ও পান তাঁর সামনে দেওয়া হলে ভাবাবেশে ঠাকুর যেমনটি খেতেন,

ঠিক তেমনিভাবে শ্রীমাও সব একটু একটু খেলেন!...পরে বলেছিলেন—"ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়েছিল।"

ঐকালে শ্রীমা ভক্তসঙ্গে বৃন্দাবনে প্রায় এক বৎসর ছিলেন। অনেক সময়ই ভাবানন্দে তন্ময় হয়ে থাকতেন। কখনো ভাবাবেশে চটুল ভঙ্গীতে একা একা ঘুরে বেড়াতেন যমুনার পুলিনে পুলিনে। কুঞ্জবাসিনী সঙ্গিনীরা খুঁজে খুঁজে তাঁকে কুঞ্জে নিয়ে আসত। আবার কখনো আনন্দ-উচ্ছ্বাসময়ী ছোট বালিকার ন্যায় সঙ্গীদের নিয়ে মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে দেবদর্শন করতেন। সদানন্দে ভরপুর। নিত্য নব ভাবানন্দে উচ্ছল।

একদিন পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত করে কীর্তন করতে করতে একটি শবদেহ নিয়ে যাচ্ছে। তাই দেখে শ্রীমা বলছেন—"দেখ দেখ, লোকটি কেমন বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হয়েছে। আমরা এখানে মরতে এলুম—তা একদিন একটু জ্বরও হল না। কত বয়স হয়ে গেল, বল দেখি! আমার বাপকে দেখেছি, ভাসুরকে দেখেছি।" শুনে সঙ্গিনীরা হেসে গড়াগড়ি যায়। বলে—"বল কি মা, বাপকে দেখেছ? বাপকে আবার কে দেখে না?" এমনি ছেলেমানুষের মত হয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা। ঠাকুর ছিলেন জীবিতেশ্বর। দেহনাশে তিনি হয়েছেন সর্বেশ্বর। নানা রূপে, নানা ছন্দে তিনি শ্রীমা'র হৃদয়ের শূন্যতা এখন পরিপূর্ণতায় উদ্বেল করে দিচ্ছেন।

শ্রীমা সেবক-সঙ্গিনীদের নিয়ে বৃন্দাবন-পরিক্রমা করলেন। ঐ সময় তাঁকে প্রায়ই ভাববিহ্বল হয়ে থাকতে দেখা যেত। পরিক্রমায় পক্ষাধিক কাল সময় লেগেছিল। বৃন্দাবন হতে শ্রীমা যোগেনকে (যোগানন্দ) সঙ্গে করে স্ত্রীভক্তদের নিয়ে হরিদ্বারে

গিয়েছিলেন এবং ব্রহ্মকুণ্ডের পবিত্র জলে ঠাকুরের কিছু চুল ও নখ বিসর্জন দিলেন।

হরিদ্বার হতে জয়পুর হয়ে বৃন্দাবনে ফিরে কিছুদিন পরেই শ্রীমা এলেন কলিকাতায় এবং কয়েক দিন বলরামবাবুর বাড়িতে অতিবাহিত করে কামারপুকুরে যান। এ যাত্রায় শ্রীমা কামারপুকুরে আট-ন' মাস বাস করেন। শ্রীঠাকুর এক সময় তাঁকে বলেছিলেন—"তুমি কামারপুকুরে থাকবে। শাক্ বুনবে, শাক-ভাত খাবে, আর হরিনাম করবে।" আদর্শ সাত্ত্বিক জীবনযাপনের কী সুন্দর চিত্র!

শ্রীমা'র ঐ সময়কার কামারপুকুরের জীবন খুবই ক্লেশপূর্ণ, অথচ অন্তর মাধুর্যে মহিমময়। এমনো দিন গিয়েছে—ত্'টি শাক-ভাত সিদ্ধ করেছেন তো নুন আর জোটে না। ঠাকুরের বিশেষ শিক্ষা ছিল—"কারো কাছে চিৎ-হাত করো না, যত পারবে উপুড়-হাত করবে।" শ্রীমা জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঐ আদেশকে আক্ষরিকভাবে পালন করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ পরবর্তী কালে দুঃখ করে বলতেন—"আমাদের এ ধারণাই তখন ছিল না যে, মা'র নুনটুকুও জোটে নি।"

শ্রীমা একদিন বলেন—"কামারপুকুরে যখন ছিলুম বৃন্দাবন থেকে আসার পর, তখন সব লোকের ভয়ে—এ ও বলছে, ও তা বলছে—হাতের বালা খুলে ফেললুম। আর ভাবতুম, গঙ্গাহীন স্থানে কি করে থাকব! গঙ্গাস্নানে যাব মনে করলুম। আমার বরাবরই একটু গঙ্গাবাই ছিল। 'একদিন দেখি কি, সামনের রাস্তা দিয়ে ঠাকুর আসছেন আগে আগে (ভূতির-

খালের দিক্ থেকে), পিছনে নরেন, বাবুরাম, রাখাল—এইসব যত ভক্তেরা—কত লোক! দেখি কি—ঠাকুরের পা থেকে জলের ফোয়ারা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে—এই জলের স্রোত! আমি ভাবলুম,—দেখছি ইনিই তো সব, এঁর পাদপদ্ম থেকেই গঙ্গা! তাড়াতাড়ি রঘুবীরের ঘরের পাশের জবাফুলগাছ থেকে মুটো মুটো ফুল ছিঁড়ে গঙ্গায় দিতে লাগলুম। তারপর আমাকে বললেন—"তুমি হাতের বালা ফেলো না!…" এর পরে শ্রীমা (লোকভয়ে) হাতের বালা আর খোলেন নি। কামারপুকুরে অন্যসময়ও ঠাকুরের দর্শনপাওয়া সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছিলেন—"একদিন ঠাকুর এসে বললেন, 'খিচুড়ি খাওয়াও।' খিচুড়ি রেঁধে রঘুবীরকে ভোগ দিলুম।…তারপর বসে ভাবে ঠাকুরকে খাওয়াতে লাগলুম।"

* * *

এদিকে ত্যাগী ভক্তগণ শ্রীমা'র কামারপুকুরে থাকার অসুবিধার কথা জানতে পেরে, তাঁকে কলিকাতায় আসবার জন্য অনুরোধ-পত্র লিখতে লাগলেন। শ্রীমা কামারপুকুরে ছিলেন শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে আরো পাঁচজন আছে, সমাজ আছে। তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত সকলকার মতামত ও সম্মতি নিয়ে কলিকাতায় এসেছিলেন।

শ্রীমা কলিকাতায় এলেন। তাঁর গঙ্গাভক্তি অমানব। সেজন্য ভক্তগণ গঙ্গার পশ্চিমকূলে বেলুড় গ্রামে ঠিক গঙ্গার উপরে, বর্তমান বেলুড় মঠের নিকটবর্তী নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানবাড়িটি ভাড়া নিয়ে শ্রীমাকে তথায় রাখলেন। তাঁর সঙ্গে কয়েকজন স্ত্রীভক্ত

ছিল এবং দেখাশুনা করার জন্য ছিলেন স্বামী যোগানন্দ। একদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীমা ছাদে বসে ধ্যান করছেন। পাশে মেয়ে-যোগেন ও গোলাপসুন্দরী। শ্রীমা'র মন ক্রমে নির্বিকল্প-ভূমিতে অধিরূঢ় হল। স্পন্দহীন, গম্ভীরসমাধিস্থ! অনেকক্ষণ পরে হুঁশ আসতে তিনি বললেন—"ও যোগেন, আমার হাত কই, পা কই?" তখনো দেহজ্ঞান ফিরে আসছে না! স্ত্রীভক্তগণ শ্রীমার হাত-পা টিপে টিপে বলতে লাগলেন, 'এই যে হাত, এই যে পা।' সেদিন দেহে মন আসতে আরো অনেক সময় লেগেছিল। এইভাবে আত্মানন্দের বিশ্রান্তির ভিতর দিয়ে শ্রীমা প্রায় ছ'মাস ছিলেন বেলুড়ে। ঐ স্থানটিকে যুগযুগান্তরের মহাতীর্থে পরিণত করবার জন্য শ্রীমা ওখানে তপশ্চর্যা করেছিলেন কিনা তা কে জানে?*

বেলুড়ে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দে কাটাবার পর শ্রীমা অন্তরে জগন্নাথদেবের দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করলেন। ভক্তগণের চেষ্টায় তাঁর পুরী যাবার সুব্যবস্থা হল। পুরীতে শ্রীমা সঙ্গীদের নিয়ে বলরামবাবুদের 'ক্ষেত্রবাসীর' বাড়িতে ছিলেন। তিনি প্রায় নিত্যই পদব্রজে জগন্নাথ-দর্শনে যেতেন। বলরামবাবুদের পাণ্ডা গোবিন্দশৃঙ্গারী শ্রীমাকে পাল্কি করে যাবার প্রস্তাব করায় তিনি বলেছিলেন—"না, গোবিন্দ, তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলবে, আমি দীনহীনা কাঙ্গালিনীর মত তোমার পেছনে পেছনে জগন্নাথ-

* শ্রীমা বেলুড় গ্রামে নানা স্থানে (১৮৮৮, '৯০, '৯৩, '৯৫ সালে) বিভিন্ন-সময়ে সর্বসাকল্যে প্রায় দেড় বৎসরের বেশী বাস করেছিলেন। বর্তমান বেলুড় মঠের জমি ১৮৯৮ সালে কেনা হয়। তারপরে হয়েছিল মঠবাড়ি-নির্মাণ, ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা ও মঠস্থাপনা।

দর্শনে যাব।"...মন্দিরে গিয়ে ভাবাবেশে দেখেছিলেন যে জগন্নাথ যেন পুরুষসিংহরূপে বসে আছেন, আর তিনি তাঁর পদসেবা করছেন।

শ্রীঠাকুর স্থূলশরীরে কখনো জগন্নাথদর্শনে যান নি। সেজন্য শ্রীমা একদিন ঠাকুরের ছবি নিজ-বস্ত্রাঞ্চলে ঢেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে জগন্নাথদর্শন করিয়েছিলেন। পুরীতে অনেক সময়ই শ্রীমা ভাব-তন্ময় হয়ে থাকতেন। ওখানে তাঁর একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ দর্শনও হয়েছিল। জগন্নাথমূর্তি-সম্বন্ধে জনৈক ভক্তের প্রশ্নে তিনি বলেছিলেন—"আমি কিন্তু (স্বপ্নে) দেখেছিলুম—শিবমূর্তি।...না, শুধু শিবমূর্তি—শিবলিঙ্গ। লক্ষ শালগ্রামের বেদী, তার উপর জগন্নাথ শিব।...বিমলাদেবী আছেন। তাঁর বলি হয় মহাষ্টমীর রাত্রে। বিমলা দুর্গা তো ? কাজেই শিব থাকবেন না ?

নানা দর্শন, নানা ভাবানন্দের ভিতর দিয়ে শ্রীমা প্রায় চার মাস শ্রীক্ষেত্রে বাস করেন। ঠাকুরের সঙ্গে এখন তাঁর নিত্যসম্বন্ধ—নিত্যমিলন। শ্রীসারদাদেবী তাঁর ভিতর এমন প্রেমের সন্ধান পেয়েছেন, যাতে বিচ্ছেদ নেই, অবসাদ নেই। আছে পূর্ণতা—পূর্ণতন্ময়তা। 'মন্নাথ' হয়েছেন 'জগন্নাথ'। সকল চেতনায়, সকল ব্যাপ্তিতে ঠাকুর। এখন তাঁদের মধ্যে চিরমিলন। বিচ্ছেদের ব্যবধান গিয়ে মিশেছে আত্মানন্দের অসীমে।

শ্রীমা'র ভিতর ঠাকুরের এ প্রকাশটি বড়ই সুন্দর। তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন নানা ছন্দে, শাশ্বত-ভঙ্গিতে, প্রেম-পবিত্রতা-ধৃতিরূপে, শক্তিরূপে, ভক্তি-মুক্তিরূপে। তাই-তো নির্বিচারে দয়া, অত দক্ষিণা! শ্রীমার মুখের কথা—"দয়ায় মন্ত্র দিই। ছাড়ে না,

কাঁদে, দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দি-ই। নতুবা আমার কি লাভ? মন্ত্র দিলে তার পাপগ্রহণ করতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক।" জনৈক আশ্রিত সন্তানের আর্তি দেখে বর ও অভয়-রূপা শ্রীমা বলেছিলেন—"ভয় কি বাবা, সর্বদার জন্য জানবে যে, ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি রয়েছি, আমি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন—'যাঁরা তোমার কাছে আসবে, আমি শেষকাল এসে তাদের হাত ধরে নিয়ে যাব।'…যে যা খুশি কর না কেন? যে যেভাবে খুশি চল না কেন, ঠাকুরকে শেষকালে আসতেই হবে তোমাদের নিতে।' আশ্রিতজনের কর্ণে জীমূতমন্দ্রে ধ্বনিত হয় 'মায়ের' অভয়বাণী—"আমি মা থাকতে ভয় কি?"

* * *

শ্রীসারদাদেবী ক্রমে বুঝতে লাগলেন—কেন ঠাকুর আগে স্থূলদেহ-ত্যাগ করে চলে গেছেন। তিনি এখন ধীরে ধীরে তাঁর থাকার প্রয়োজনসাধনে প্রবৃত্ত হলেন। জনৈক ভক্ত একদিন জিজ্ঞাসা করেন—"মা, অন্যান্য অবতারগণ নিজ নিজ শক্তির পরে দেহরক্ষা করেছেন। কিন্তু এবার আপনাকে রেখে ঠাকুর পূর্বে গেলেন কেন?" শ্রীমা—"বাবা, জানতো, জগতের প্রত্যেকের উপর তাঁর মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব জগতে বিকাশের জন্য আমাকে এবার রেখে গেছেন।"

ঠাকুর যেমন ছোটখাট দু'-চারটি কথায় নিজের স্বরূপসম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন, তেমনি তাঁর অল্প দু'-একটি কার্য ও কথার ভিতর দিয়েই তিনি করেছিলেন লীলাসঙ্গিনীর স্বরূপ-ব্যঞ্জনা।

এবং তাতে করেই তিনি শারদাদেবীর প্রতি জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, নইলে তিনি বড়জোর 'আদর্শনারী'-রূপে পরিচিতা হতেন। স্বয়ং শক্তিরূপিণী শ্রীমা মহাশক্তিবলে তাঁর স্বরূপ অবগুণ্ঠিত করে রেখেছিলেন। সে আবরণ-উন্মোচন মানবশক্তির বাইরে। সে গোপনলীলাভিনয় তাঁরই কৃপায় কচিৎ কোন ভাগ্যবানের দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। পরবর্তী কালে ঈশ্বরকোটী স্বামী প্রেমানন্দই বলতে পেরেছিলেন—"মাকে কে বুঝবে? ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নেই। ঠাকুরের তবু বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল—ভাব, সমাধি লেগেই থাকতো, কিন্তু মা'র ঐ ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। এ কি মহাশক্তি! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি নে, সব মা'র কাছে চালান করে দিচ্ছি! মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন!"*

পুরী হতে শ্রীমা কলিকাতায় এসে প্রায় তিন সপ্তাহ পরেই বিবেকানন্দ, প্রেমানন্দ ও মাষ্টার মশাই প্রভৃতিকে সঙ্গে করে আঁটপুরে যান। সেখানে কয়েক দিন থেকে তিনি কামারপুকুর

* একবার জয়রামবাটীতে শ্রীমা'র খুব জ্বর, পায়ে বাতও বেড়েছে। অথচ শ্রীমা ঐ অবস্থায়ই বলছেন—"আজ আর কেউ এল না (কৃপাপ্রার্থী)। ঠাকুর বলেছিলেন—'কত কাজ করতে হবে।' একটি দিন বৃথায় গেল।" তার অল্পক্ষণ পরেই রাত্রে তিনজন ভক্ত এল স্বামী ব্রহ্মানন্দের চিঠি নিয়ে। চিঠি পড়ে শোনাতেই মা কাতরস্বরে বললেন—"ছেলে বিদেশ থেকে মাকে কত ভাল ভাল জিনিস পাঠায়। রাখাল আমাকে শেষটায় এই পাঠালে!"... শ্রীমা পরে ঐ ভক্তদের মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন।

গিয়েছিলেন। এ যাত্রায়ও শ্রীমা প্রায় এক বৎসর তথায় বাস করে পরে এলেন কলিকাতায়।

স্বীয় জননীর স্বর্গারোহণের পরে ঠাকুর শ্রীমাকে গয়ায় গিয়ে ৺বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করতে বলেছিলেন। তাতে শ্রীমা বলেন—"পুত্র বর্তমান। আমি দেব কি?" শুনে ঠাকুর বলেছিলেন—"তা হবে গো, হবে। আমার কি ওখানে যাবার জো আছে? গেলে কি আর ফিরব?" শ্রীমা শঙ্কিতা হয়ে বললেন—"তবে গিয়ে কাজ নেই।" শ্রীঠাকুরের ঐ আদেশ স্মরণ করে তিনি এখন গয়াধামে যাবার মনস্থ করলেন এবং বুড়ো গোপালের (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) সঙ্গে গয়াতে গিয়ে (১৮৯০ সালের মার্চ মাসে) গয়াকৃত্যাদি সমাপন করেন। বিষ্ণুগয়া হতে শ্রীমা বোধগয়া-দর্শনেও গিয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে তাঁর কথায় জানা যায়— "...বোধগয়া-মঠ, তাদের অত সব জিনিসপত্র, কোন অভাব নেই, কষ্ট নেই দেখে কাঁদতুম। আর ঠাকুরকে বলতুম—'ঠাকুর, আমার ছেলেরা থাকতে পায় না, খেতে পায় না, দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের যদি এমন একটি থাকবার জায়গা হত!' তা ঠাকুরের ইচ্ছায় মঠটি হল।"

তখন ঠাকুরের ত্যাগি-সন্তানগণ সবেমাত্র বরাহনগরে এক ভুতুরে, ভাঙ্গা বাড়িতে একটু মাথা গুঁজবার স্থান পেয়েছে। নিরন্ন অবস্থা। চলেছে কৃচ্ছ্রসাধনের পরাকাষ্ঠা। শ্রীমার ঐ প্রার্থনার পর হতে ক্রমে সব দিক থেকেই অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়।*

* শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের স্থিতি ও প্রসারের জন্য শ্রীমার প্রাণের আকুলতা তাঁর অন্য সময়কার কথা থেকেও জানা যায়। কোয়ালপাড়ার জনৈক সন্ন্যাসীকে শ্রীমা

গয়া হতে প্রত্যাবর্তন করে শ্রীমা কলিকাতায় কিছুদিন মাস্টার-মশাইর বাড়ি ও বলরামবাবুর বাড়িতে থাকেন এবং পরে বেলুড় গ্রামে ঘুষুড়ী শ্মশানের নিকট এক ভাড়াটে বাড়িতে প্রায় চার মাস ছিলেন। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমার অজস্র আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করে দীর্ঘদিনের জন্য পরিব্রাজকরূপে বহির্গত হলেন।

ঘুষুড়ীর বাড়িতে শেষের দিকে শ্রীমা কঠিন রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। সেজন্য তাঁকে বরাহনগরে সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ভাড়াটিয়া বাড়িতে চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করা হল। বরাহনগর হতে তিনি কলিকাতায় বলরামবাবুর বাড়িতে আসেন এবং দুর্গাপূজার পরে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী যান।

শ্রীমার মাতৃভক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। তাঁর মা শ্যামাসুন্দরীও অতি সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছিলেন বলেই দেবীগর্ভা হয়েছিলেন। তিনি এমনই ভক্তিমতী ছিলেন যে, মা জগদ্ধাত্রীদেবী অযাচিতভাবে তাঁকে দর্শন দিয়ে, তাঁর পূজা গ্রহণ করেছিলেন। তখন শ্রীঠাকুর

বলেছেন— "...আহা! এর জন্যে ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তা আজ তাঁর কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। ... ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তাঁর কাছে এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম— '...তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে আর তোমার ভাব-উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এই জন্যই তো তোমার আসা। ওদের ঘুরে ঘুরে বেড়ান দেখে আমার প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে।' তারপর থেকে নরেন ধীরে ধীরে এই সব করলে।"

স্থূলশরীরে দক্ষিণেশ্বরে রয়েছেন। তিনি প্রসন্নের (শ্রীমা'র সহোদর ভাই) মুখে সব শুনে বলেছিলেন—"...যা বেশ, পূজা করগে। বেশ, বেশ, তোদের ভাল হবে।" ঐ পূজা সম্বন্ধে 'শ্রীমার কথা' থেকে জানা যায়— "...জগদ্ধাত্রীপূজা হল। দেশাম (দেশশুদ্ধ নিমন্ত্রণ) হল।...প্রতিমাবিসর্জনের সময় মা জগদ্ধাত্রী-মূর্তির কানে কানে বলেছিলেন—'মা জগাই, আবার আরবছর এসো। আমি তোমার জন্য সমস্ত বছর ধরে সব যোগাড় করে রাখব।'

"পরের বছর মা আমাকে বললেন—'দেখ, তুমি কিছু দিও। আমার জগাইর পূজা হবে।' আমি বললুম—'হল, একবার পূজা হল। অত ল্যাটা কেন, দরকার নেই, ও পারব না।' রাত্রে স্বপ্নে দেখি কি, তিনজনে এসে হাজির। ওরে বাপ!' সেই মনে পড়ছে।...জগদ্ধাত্রী ও জয়া-বিজয়া সখী। বলছেন—'আমরা তবে যাব?' আমি বললুম—'কে তোমরা?' বললেন—'আমি জগদ্ধাত্রী।' আমি বললুম—'না, তোমরা কোথায় যাবে? তোমরা থাক, তোমাদের যেতে বলি নি।'..." সেই অবধি জয়রামবাটীতে প্রতিবৎসর জগদ্ধাত্রীপূজা হয়ে আসছে।

* * *

ঐসময় শ্রীমা জয়রামবাটীতে অনেক দিন ছিলেন এবং পরে ১৩০০ সালের আষাঢ় মাস নাগাদ তিনি পুনরায় কলিকাতায় এলেন। এবারও ভক্তগণ তাঁকে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটে বাড়িতে রেখেছিলেন। ঐ সময় বেলুড়ে তিনি পঞ্চতপা করেন।

শ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের কিছুকাল পর হতেই 'দাড়িওয়ালা এক সন্ন্যাসি-মূর্তি' শ্রীমাকে পঞ্চতপা করার কথা বারংবার বলতে

থাকেন। ঐ সন্ন্যাসীর বিশেষ আগ্রহে তিনি পঞ্চতপা করেছিলেন। সে সম্বন্ধে শ্রীমার কথা থেকে জানা যায়।— "...পঞ্চতপার যোগাড় হল। তখন বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়িতে। চারিদিকে ঘুঁটের আগুন, উপরে সূর্যের প্রখর তেজ। প্রাতে স্নান করে কাছে গিয়ে দেখি আগুন গন্ গন্ করে জ্বলছে। প্রাণে বড়ই ভয় হল—কি করে ওর ভিতর যাবো, আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানে বসে থাকব। পরে ঠাকুরের নাম করে ঢুকে দেখি—আগুনের কোন তেজ নাই। এভাবে সাত দিন কাজ করি। কিন্তু বাবা, শরীরের বর্ণ যেন কাল ছাই হয়ে গিয়েছিল। এর পরে আর সে সন্ন্যাসীকে দেখি নি।"

ঐকালে শ্রীমা'র একটি অলৌকিক দর্শন হয়েছিল। বাগান-বাড়ির সামনেই গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। শ্রীমা একদিন দেখেন—ঠাকুর গঙ্গায় গিয়ে নামলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীর গঙ্গায় মিলিয়ে গেল। শ্রীঠাকুর ও গঙ্গা এক হয়ে গেলেন। এদিকে স্বামী বিবেকানন্দ 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলতে বলতে ঐ গঙ্গাবারি দু'হাতে অগণিত লোকের মাথায় প্রোক্ষণ করতে লাগলেন। আর ঐ ব্রহ্মবারি-স্পর্শে সকলে সন্তোমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। মুক্তিবারিরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ! ঐ দর্শন শ্রীমা'র মনে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে, তিনি কয়েক দিন গঙ্গায় নামতে পারেন নি। বলতেন—"এ যে ঠাকুরের দেহ, কি করে এতে পা দিই!"

চার-পাঁচ মাস বেলুড়ে কঠোর তপশ্চর্যায় অতিবাহিত করার পরে শ্রীমা কয়েক মাসের জন্য জয়রামবাটী গমন করেন। কিন্তু অনেক

বিশিষ্ট ভক্তের আন্তরিক অনুরোধে শ্রীমাকে পুনরায় কলিকাতায় এসে, তাঁদের সঙ্গে কৈলোয়ার (বিহারের শাহাবাদ জিলায়) গিয়ে দু'মাস থাকতে হয়েছিল। ওখানে দলবদ্ধ বন্যহরিণ তীরবেগে ছুটে বেড়াচ্ছে দেখে, শ্রীমা বালিকার ন্যায় আনন্দে উচ্ছ্বসিতা হতেন। কৈলোয়ার হতে ফিরে এসে তিনি পুনরায় কয়েক মাস বেলুড়ে ছিলেন।

স্বামী প্রেমানন্দের ভক্তিমতী মাতা তাঁদের বাড়ি আঁটপুরে ৺দশভুজার প্রতিমায় আরাধনার আয়োজন করেছেন। তাঁদের বিশেষ আগ্রহে শ্রীমাকেও ৺পূজা উপলক্ষে যেতে হল আঁটপুরে। ঐ ঘটনার উল্লেখ করেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হতে জনৈক গুরুভ্রাতাকে লিখেন—"বাবুরামের মা'র বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্তদুর্গা ছেড়ে মাটিরদুর্গা পূজা করতে বসেছে!..." পূজার পরে শ্রীমা আঁটপুর হতে জয়রামবাটী আসেন।

এই সময় শ্রীমা'র প্রাণে তাঁর বৃদ্ধা গর্ভধারিণীকে তীর্থদর্শনে নিয়ে যাবার ইচ্ছা বলবতী হল। তিনি গর্ভধারিণী ও নিকট আত্মীয়দের কয়েকজনকে নিয়ে কলিকাতা হয়ে কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থদর্শন করতে যান; এবং প্রায় তিনমাস তীর্থবাস করে কলকাতায় ফিরে এলেন। শ্রীমা তাঁর গর্ভধারিণী* প্রভৃতিকে জয়রামবাটীতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে মাস্টারমহাশয়ের কলুটোলার বাড়িতে মাসখানেক রইলেন। পরে তাঁর মা ও

* ১৩১২ সালে (১৯০৬ খ্রীঃ) শ্যামাসুন্দরী দেবীলোকে প্রয়াণ করেন। মৃত্যুর আগে একমাত্র বাসনা ছিল যে, সারদাকে যেন জন্মে জন্মে কন্যারূপে প্রাপ্ত হন।

ভাইদের আহ্বানে শ্রীমাকে শীঘ্রই জয়রামবাটী যেতে হল। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি পুনরায় ফিরে এলেন কলিকাতায়। ভক্তগণ তখন তাঁকে বাগবাজারে গঙ্গার ধারে গুদামওয়ালা বাড়িতে পাঁচ-ছ' মাস রেখেছিলেন। ক্রমে ভক্তসংখ্যাও বেড়ে চলেছে, দর্শনাকাঙ্ক্ষী ও কৃপাপ্রার্থীর ভিড়ও বাড়তে লাগল দিনের দিন।

পুনরায় জয়রামবাটীতে গিয়ে শ্রীমা প্রায় দেড় বৎসর ছিলেন। এবার যখন তিনি কলিকাতায় এলেন (১৩০৫ সনের বৈশাখ মাসে) তখন তাঁকে বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে রাখা হয়েছিল।

ততদিনে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করেছেন; এবং ক্রমে বেলুড়ে স্বামিমঠনির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করলেন। সাময়িকভাবে মঠ উঠে এল বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর ভাড়াটিয়া বাড়িতে। মঠনির্মাণকার্য দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল।

১৮৯৮ সালের কালীপূজার দিন স্বামীজী শ্রীশ্রীজগজ্জননীকে বাগবাজার হতে নিয়ে এলেন নতুন মঠপ্রাঙ্গণে। শ্রীমা তথায় এসে তাঁর নিত্যপূজিত শ্রীঠাকুরের ছবি পূজা করলেন।* মঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধিষ্ঠিত হলেন। বেলুড় মঠ মহাতীর্থে পরিণত হল।

* তাঁর নিত্যপূজিত ঠাকুরের ছবিখানি সম্বন্ধে শ্রীমা'র কথায় জানা যায়—"...এটি খুব ঠিক ঠিক।...আমি এখানি অন্যান্য ঠাকুরদেবতার ছবির সঙ্গে রেখেছিলুম—পূজা করতুম। নবতের নীচের ঘরে তখন থাকতুম। একদিন ঠাকুর গিয়েছেন। ছবি দেখে বলছেন—'ওগো, তোমাদের আবার এসব কি?'... পরে দেখলুম, বিল্বপত্র আর কি কি পূজার জন্য ছিল, একবার না দু'বার ছবিতে দিলেন—পূজা করলেন। সেই ছবিই এই।"

বেলুড় মঠের স্থানটি সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছিলেন—"...আমি কিন্তু বরাবরই দেখতুম, ঠাকুর যেন গঙ্গার ওপারে ঐ জায়গাটিতে—যেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান, তার মধ্যে ঘর, সেখানে বাস করছেন। (তখন মঠ হয় নি)..." শ্রীমায়ের কথা থেকে মনে হয়, শ্রীঠাকুর নিজেই বর্তমান বেলুড় মঠের স্থানটি মনোনীত করেছিলেন। এবং তাঁর বিশেষ ইঙ্গিতেই ঐস্থানে মঠটি স্থাপিত হয়েছে।

তারপর ৯ই ডিসেম্বর (১৮৯৮) পুণ্যমুহূর্তে স্বামীজী বেলুড়ের ভাড়াটে মঠবাড়ি হতে আত্মারামরূপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নিজে কাঁধে করে নিয়ে এলেন স্থায়ী মঠে এবং সহস্রযুগের জন্য তাঁকে ঐস্থানে স্থাপনা করলেন। জগতের ইতিহাসে ঐ দিনটি মহাস্মরণীয় দিন। পরবর্তী ২রা জানুয়ারী (১৮৯৯) মঠ স্থায়িভাবে উঠে এল নূতন মঠবাড়িতে।

এর পরে তিন-চার বৎসর পর্যন্ত শ্রীমা কখনো জয়রামবাটীতে, কখনো কলিকাতায় কাটিয়েছেন। কলিকাতায় এসে তিনি বাগবাজার-অঞ্চলে কোন ভাড়াটিয়া বাড়িতে থাকতেন।

১৯০১ সালে স্বামীজী খুব ঘটা করে বেলুড় মঠে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করলেন। 'জ্যান্তদুর্গা' শ্রীসারদাদেবীকে এনে রাখলেন মঠের পার্শ্ববর্তী নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানবাড়িতে। যথাসময়ে শ্রীমা মঠে এলেন—দেবীর বোধন হল। আনন্দময়ীর আগমনে পূজার ক'দিন মঠে উচ্ছ্বাসময় আনন্দ। বহু লোক শ্রীমার দর্শন পেয়ে ধন্য হল। এদিকে 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' ও 'জয় দুর্গামায়ীকী জয়'-ধ্বনিতে গঙ্গাবক্ষ প্রতিধ্বনিত।...

৪

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দেহত্যাগের পর শ্রীসারদাদেবীর পক্ষে তাঁর অপার্থিব মনকে কিছুতেই সাধারণভূমিতে রাখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাঁর মন স্বরূপে লীন হবার জন্য ছুটে চলেছিল অসীমের দিকে।* এদিকে শ্রীঠাকুরও পুনঃ পুনঃ বাধা দিচ্ছেন, যুগকার্যের পরিপূর্তির জন্য সারদাদেবীকে নরদেহে রাখার চেষ্টা করছেন। সারদাদেবীর মর্ত্যধামে থাকার জন্য কোন মায়িক অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তার যথাযথ ব্যবস্থাও করলেন। তাঁর আভাস পাওয়া যায় শ্রীমার কথা থেকে—"...ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন সংসারে আর কিছুই ভাল লাগছে না, মন হুহু করছে, আর প্রার্থনা করি—'আর আমার এ সংসারে থেকে কি হবে?' সেই সময় হঠাৎ দেখলাম, লালকাপড়পরা দশ-বার বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর তাকে দেখিয়ে বললেন—'একে আশ্রয় করে থাক। তোমার কাছে কত সব ছেলেরা এখন

* আমরা ইতঃপূর্বে স্থানে স্থানে শ্রীমা'র স্বরূপে লীন হয়ে যাবার প্রচেষ্টার একটু উল্লেখ করেছি। বেলুড়ে অবস্থানকালে তাঁর নির্বিকল্পসমাধি হয়েছিল—সঙ্গিনীরা দেখেছিলেন এবং বলেছিলেন। কিন্তু ঐ সমাধির সঙ্গে শ্রীমায়ের জীবনের কি সম্বন্ধ, তা জানা গিয়েছিল অনেক পরে—তাঁরই কথা থেকে। শ্রীমা পরবর্তী কালে ঐ বিষয়ে জনৈক সন্ন্যাসিসন্তানকে কথায় কথায় বলেছিলেন—"...ঐ সময় (বেলুড়ে থাকাকালীন) লাল জ্যোতি, নীল জ্যোতি, এইসব জ্যোতিতে মন লীন হত। আর দু'চার দিন এ ভাবে থাকলে দেহ থাকত না।..."

আসবে।' পরক্ষণেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। মেয়েটিকেও আর দেখতে পাই নি। তারপর একদিন ঠিক এই জায়গাটিতে (জয়রামবাটীতে) বসে আছি। ছোটবৌ (রাধুর মা) তখন বদ্ধ-পাগল। কতকগুলো কাঁথা বগলে করে টানতে টানতে ঐ দিকে যাচ্ছে আর রাধু হামা দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলেছে পেছনে পেছনে। তাই দেখে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। ছুটে গিয়ে রাধুকে কোলে নিলাম। মনে হল—তাইতো, একে আমি না দেখলে কে আর দেখবে? বাবা নেই, মা ঐ পাগল। এই মনে করে যেই একে কোলে তুলে নিয়েছি, অমনি ঠাকুরকে সামনে দেখলাম। তিনি বললেন—'এ-ই সেই মেয়েটি, ওকে আশ্রয় করে থাক, এটি 'যোগমায়া'।" (১৯০০ খ্রীঃ, ২৬শে জানুয়ারী রাধারাণীর জন্ম)।

তারপর থেকে শ্রীমা'র নরদেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত এই 'যোগমায়া-আশ্রিত' জীবনটি পূর্ণরহস্যময়। ঐ 'যোগমায়া'-অবলম্বনে তাঁর অসংসারী মন যেন সংসারী হয়েছিল। এবং ঐকালে লীলাময়ীর ঘোর মায়াবদ্ধ সংসারিরূপে অভিনয় বাস্তবিকই অতি বিস্ময়কর। ঐ অভিনয়টি এমন নিখুঁত ও সর্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল যে, তা শ্রীমা'র ত্যাগিসন্তানগণ—যাঁরা তাঁকে জগদম্বার জীবন্তরূপজ্ঞানে পূজা করতেন—তাঁদের মনেও ধাঁধা লাগিয়ে দিত।

মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় শ্রীমা'র আচরণ দেখে, জনৈক সন্ন্যাসীর মনে সন্দেহের উদয় হয়েছে। তিনি দু'এক বার শ্রীমাকে বলেছেনও—"আপনি এত রাধু রাধু করেন কেন? রাধুর উপর আপনার ভারি আসক্তি।" শ্রীমা বললেন—"কি করব বাবা, আমরা মেয়ে-

মানুষ, আমাদের এরকমই।" উক্ত সন্ন্যাসী আর এক দিনও ঐ প্রশ্নই করেছেন। সেদিন কিন্তু শ্রীমার সুর হঠাৎ পাল্‌টে গেল। তিনি একটু উত্তেজিতা হয়েই বললেন—"তুমি এসব কি বুঝবে?…তুমি আমার মত একটি খুঁজে বের কর দেখি?" শুনে সন্ন্যাসিসন্তানের চমক ভাঙল। প্রকৃতির লীলামঞ্চে চকিতে পটপরিবর্তনের ন্যায় শ্রীসারদাদেবীর জীবনে পাশাপাশি আলো ও অন্ধকারের এই সমাবেশটি বড়ই মনোরম। নিত্য ও লীলায় কত সহজ আনাগোনা! তিনি একটি পা সর্বক্ষণ নিত্যে রেখে, যেন আর একটি পায়ে দেখাচ্ছেন লীলা-অভিনয়!

শ্রীমায়ের 'রাধু' এখন বড় হয়েছে। তাকে বে দিয়েছেন, তার একটি সন্তানও হয়েছে। যোগমায়া নানা মায়া বিস্তার করে শ্রীসারদাদেবীর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বদ্ধপাগলীর মেয়ে রাধুও হয়েছে আধ্‌পাগলী। এতেই শ্রীমা'র মনে আরো অশান্তি ও দুশ্চিন্তা।—যেন আরো জড়িয়ে পড়েছেন মায়াপাশে। রাধুর আফিম না হলে চলে না। সে বসে বসে থাকবে, খাবে দাবে সব করবে, অথচ কোন কিছুর এতটুকু ত্রুটি হলে তার কত মান-অভিমান! আবার শ্রীমা'র উপর অজস্র গালমন্দবর্ষণ। রাধু নিজের মাকে 'নেড়ামা' বলে, আর শ্রীমাকে ডাকে 'মা' বলে। মা-ডাক শুনলেই তাঁর প্রাণে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। একদিন রাধু আফিমের জন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেছে। শ্রীমা বিরক্ত হয়ে বলছেন—"রাধি, আর কেন, উঠে দাঁড়া না! তোকে নিয়ে আর পারি নে। তোর জন্ত আমার ধর্মকর্ম সব গেল।"—এসব মৃদুরোষ-বাক্যে রাধু রেগে গিয়ে সামনের চুবড়ী থেকে একটা বড় বেগুন

তুলে নিয়ে শ্রীমার পিঠে সজোরে ছুড়ে মেরেছে। গুম্ করে শব্দ হল, যন্ত্রণায় শ্রীমা পিঠ-বাঁকিয়ে উঠলেন। দেখতে দেখতে পিঠটা ফুলে উঠল। তখন শ্রীমা ঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে জোড়হাতে বললেন—"ঠাকুর, ওর অপরাধ নিও না। ও অবোধ।"

সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ের ধুলো নিয়ে রাধুর মাথায় দিয়ে বলছেন—"রাধি, এ শরীরটাকে ঠাকুর কোনদিন একটি শাসনবাক্য বলেন নি। আর তুই এত কষ্ট দিচ্ছিস্? তুই কি বুঝবি আমার স্থান কোথায়? তোদের নিয়ে পড়ে আছি বলে, তোরা কি মনে করিস বল দেখি?" রাধু তখন কাঁদতে ল্যাগল। শ্রীমা'র মনও তখন গলে গেল।—বেশ চলেছিল অভিনয়!

আবার কখনও শ্রীমা নিজের স্বরূপ-সম্বন্ধে আভাস দিচ্ছেন। কেন রাধুকে অবলম্বন করে তাঁর মনকে মায়াচ্ছন্ন করে রেখেছেন, দিচ্ছেন তারো ইঙ্গিত। একদিন একথা সে-কথার পরে শ্রীমা বললেন—"দেখ, সবে বলে কিনা, আমি 'রাধু রাধু' করেই অস্থির। তার উপর আমার বড় আসক্তি! এই আসক্তিটুকু যদি না থাকতো, তাহলে ঠাকুরের শরীর যাবার পর এ দেহটা থাকত না। তাঁর কাজের জন্তই না 'রাধু রাধু' করিয়ে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে, তখন আর এ দেহ থাকবে না।"

এই একই মায়া প্রকাশ পেয়েছিল নানাভাবে, নানারূপে—দয়ারূপে, আবার বিগলিত-স্নেহরূপে। এই মায়া-অবলম্বন না থাকলে তাঁর জীবনব্যাপী মহৎকার্যই অসমাপ্ত থাকত। এই যে বিভিন্ন পরিবেশের ভিতর দিয়ে কন্তারূপে, ভগ্নী-জায়া ও

প্রতিবেশিনীরূপে, মাতা ও গুরুরূপে, আবার দয়া-করুণা-সেবা ও সান্ত্বনারূপে, স্নেহ-মমতা ও ভক্তি-মুক্তিরূপে শত শত নরনারী তাঁকে পেয়েছিল, তা থেকেই সকলে থাকত বঞ্চিত।

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনটি এমনই উঁচুসুরে বাঁধা যে, তার সঙ্গে সুর-মিলান সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ত্যাগে, পবিত্রতায়, উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে—সবটাতেই তিনি সর্বোচ্চস্তরে—সাধারণের অধিগম্যতার বাইরে। আর নিরন্তর শ্রীভগবানে তাঁর অবস্থিতি—তা থেকে একগ্রামও নামতে পারছেন না। তাঁর জীবনটি যেন তীব্র, চোখ-ঝলসানো আলো। তাই তিনি এমন একটি জীবন সঙ্গে করে এনেছিলেন, যাতে সকল স্তরের মানুষই দেখতে পায় পূর্ণতা—আর তাঁকে পায় হাতের নাগালের মধ্যে। সন্ন্যাসি-গৃহী, বালক-বালিকা, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, পবিত্র-অপবিত্র, আবার অন্ধ-খঞ্জ, সবল-দুর্বল সকলেই যেন তাঁকে পরম-আত্মীয়রূপে—ঠিক অন্তরঙ্গজনের মত করে পেতে পারে।

শ্রীঠাকুর বিষয়াসক্তদের হাওয়া পর্যন্ত সইতে পারতেন না—ছায়াও মাড়াতে পারতেন না। দেবায়তনের মধ্যে দেবদেবীদের নিয়ে তিনি বাস করেছেন সারাটি জীবন। শ্রীসারদাদেবী একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণরূপ দেবতাকে নিয়ে থাকতেন, নির্বিকল্পসমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন; ভাবে হাসতেন কাঁদতেন—আবার তেমনি আত্মীয়-স্বজন, পাগল-পাগলী, পাড়াপ্রতিবেশী—সকলের সেবাযত্ন করছেন সানন্দে—নানারকম লোকের আবেষ্টনের মধ্যে থাকছেন নির্বিকারে। আবার মা-গঙ্গার মত, সব কিছুকে করছেন পবিত্র—করছেন সকলকে ধন্য। কল্যাণরূপিণীর স্পর্শে সকলেরই হচ্ছে

পরমকল্যাণ—ইহলৌকিক কল্যাণ, পারলৌকিক কল্যাণ। স্বামী প্রেমানন্দের উক্তি—"তোমরা দেখে তো এলে, রাজরাজেশ্বরী সাধ করে কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন মাজছেন, চাল ঝাড়ছেন, এমন-কি ভক্তছেলেদের এঁটো পর্যন্ত পরিষ্কার করছেন! মা জয়রামবাটীতে থেকে অত কষ্ট করছেন গৃহীদের গার্হস্থ্যধর্ম শেখাবার জন্য। অসীম ধৈর্য, অপরিসীম করুণা, সর্বোপরি সম্পূর্ণ অভিমানরাহিত্য!"...

শ্রীঠাকুর আদর্শ সন্ন্যাসী। এদিকে সন্ন্যাস ও সংসারের অপূর্ব সংমিশ্রণ শ্রীসারদাদেবীর জীবনে। ঠাকুর টাকা ছুঁতে পারতেন না, হাত বেঁকে যেত। শ্রীমা টাকা মাথায় ঠেকাচ্ছেন—মা লক্ষ্মী। অর্থ যে সকল অনর্থের মূল, তা তিনিও জানতেন—পাকাপাকি জানতেন ঠাকুরেরই মত। ঠাকুরের কাছে সব মিথ্যা—জগৎই মিথ্যা। বলেছিলেন—"ওরে রামলাল, যদি জানতুম জগৎটা সত্যি তবে তোদের কামারপুকুরটাই সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতুম। জানি, ওসব কিছু না—ভগবানই সত্যি।"—অথচ শ্রীমায়ের কাছে যেন সবই সত্য, এমনই ব্যবহার। দু'টি জীবন যেন আপাত-বিরোধী, কিন্তু পরস্পরের পরিপোষক। একটি যেন বেদ, অপরটি ভাষ্য। আর দু'জনেই যেন পাশাপাশি বসে আছেন অসীমের ঘরে।

'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে' সংসারে কি ভাবে থাকতে হয়, তার জীবন্ত আদর্শ দেখিয়ে গেলেন—শ্রীসারদাদেবী।

* * *

জয়রামবাটীতে ভক্তসমাগম ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যাত্রীদের 'জয় মা' ধ্বনিতে ঘোষিত হচ্ছে জয়রামবাটী-মহাতীর্থের মহিমা।

আসছে সন্ন্যাসি-গৃহী, পুরুষ-স্ত্রী দূরদূরান্তর থেকে মহাশক্তির এক দুর্বার আকর্ষণে। বহুদিন পূর্বে সারদার ছেলেপিলে হচ্ছে না দেখে শ্যামাসুন্দরী মহাদুঃখ করে প্রায়ই বলতেন—"এমন পাগল জামায়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম, আহা! ঘর-সংসারও করলে না—ছেলেপিলেও হল না, মা-ডাকও শুনলে না!" একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বলেছিলেন—"শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না। আপনার মেয়ের এত ছেলে-মেয়ে হবে, শেষে দেখবেন মা-ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হয়ে উঠবে।" শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিকভাবে সত্য হতে চলেছে। যারা আসছে তারা সারদাদেবীকে পাচ্ছে মাতৃরূপে। তাঁতে দেখছে—তারিণীমূর্তি। তিনি গুরুরূপে তাঁর শত শত পঙ্গুসন্তানকে দুস্তর ভববারিধির পরপারে নিয়ে চলেছেন। তাঁর ভিতর মাতৃত্ব ও দেবীত্বের অপূর্ব সংমিশ্রণ।

জাগতিক মাতৃত্বের মধ্যে রয়েছে প্রতিদানের গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা—'দেওয়া-নেওয়ার' ভিতর দিয়ে হয় সে ভালবাসার অভিব্যক্তি ও পূর্ণতা। কিন্তু ঐশীমাতৃত্বে শুধু 'দেওয়া',—দিয়েই তৃপ্তি—'সমর্থা ভালবাসার' যেন পূর্ণবিকাশ। শ্রীসারদাদেবীর ঐ সীমাহীন ঐশী-মাতৃত্বের প্রচণ্ডশক্তির প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে যেত আশ্রিতসন্তানদের প্রাণের যত কিছু অপূর্ণতা, ক্লৈব্য, দৈন্য। 'মা আছেন'—এই বোধ মহামন্ত্ররূপে সন্তানদের প্রাণে এনে দিত দিব্যচেতনা, উচ্ছলিত পরিপূর্ণতা, অমোঘ শক্তি ও শিশুসুলভ নির্ভর।

দেখবার স্থান জয়রামবাটী। আসা-যাওয়া বহু কষ্টসাধ্য, ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ। প্রবল ইচ্ছাসত্ত্বেও অনেক লোক আসতে

পারত না জয়রামবাটীতে। সেজন্য শ্রীমাকে নানা অসুবিধা-বরণ করেও অনেক সময় কলিকাতায় থাকতে হত। ১৮৯৮ সাল হতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত শ্রীমা মাঝে মাঝে যখন কলিকাতায় আসতেন তখন বাগবাজার-অঞ্চলে বিভিন্ন ভাড়াটিয়া বাড়িতে, কখনো বা ভক্তগৃহে অবস্থান করতেন। শ্রীমার জীবত্রাণরূপ মহাকার্য ক্রমেই ব্যাপক হয়ে পড়েছিল। যুগাবতারের মহিমা ও মহত্বদার ভাব যত ছড়িয়ে পড়তে লাগল দেশময়, ততই বাড়তে লাগল মাতৃসমীপে ভক্তসন্তানদের আনাগোনা। এখন শুধু বাংলা নয়, বাঙ্গালী নয়, সমগ্র ভারতের লোক আসতে লাগল শ্রীমায়ের চরণ-দর্শনের জন্য, তাঁর কৃপা পাবার জন্য।

শ্রীমায়ের কলিকাতা-বাসের এ অসুবিধা-দূরীকরণের জন্য স্বামী সারদানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় বাগবাজারে 'মায়ের' জন্য একটি বাড়ি নির্মিত হল (বর্তমান 'উদ্বোধন' অফিস)। ১৯০৯ সালের ২৩শে মে (১৩১৬, ৯ই জ্যৈষ্ঠ) শ্রীমা বাগবাজারের নতুন বাড়িতে এলেন এবং নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত করলেন শ্রীঠাকুরকে। এ বাড়িতে এসে তিনি খুবই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। স্বামী সারদানন্দের একনিষ্ঠ মাতৃসেবাযজ্ঞ যেন পূর্ণ হল। তাঁর সেবা অনাগতদের জন্য হয়ে রইল মহৎ-উজ্জ্বল আদর্শ। সারদানন্দের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে শ্রীমা তাঁর নাম দিয়েছিলেন—"আমার ভারী" —"আমার বাসুকি"।

বাগবাজারে শ্রীমায়ের বাড়িতে কত ধ্যানজপ, ভাব, সমাধি হয়ে গেছে! কত লোক শ্রীমার কাছে মুক্তিমন্ত্র পেয়ে ধন্য হয়েছে। শ্রীমায়ের অন্ত্যলীলার স্থান, মহাতীর্থ—শ্রীমায়ের বাড়ি। ঐ

সময়ে বাগবাজারের নূতন বাড়িতে শ্রীমা প্রায় ছ'সাত মাস বাস করে শীতের প্রারম্ভে জয়রামবাটী গেলেন।

শ্রীমা একদিন জনৈক আশ্রিতসন্তানকে বলেছিলেন—"ঠাকুর এবার এসেছেন ধনি-নির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব বইছে। যে একটু পাল তুলে দেবে, শরণাগত হবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে। এবার বাঁশ ও ঘাস ছাড়া যার ভিতর একটু সার আছে সে-ই চন্দন হবে। তোমাদের ভাবনা কি?" শ্রীঠাকুরের ঐ জীবোদ্ধার-কার্যের ভার শ্রীমায়ের উপর অর্পিত ছিল। তাই তিনি করে যেতে লাগলেন অবিচারে জীবোদ্ধার। যে 'মা' বলে এসে দাঁড়িয়েছে—তাকেই তিনি কৃপা করে ঠাকুরের অভয়চরণে অর্পণ করেছেন।

জনৈক দীক্ষিতসন্তান ধ্যানজপ করতে পারছে না বলে দুঃখ প্রকাশ করছে। বিগলিতস্নেহে শ্রীমা অভয় দিয়ে অমনি বললেন—"এখন যাই হোক, শেষটায় ঠাকুরকে আসতেই হবে (তোমাদের নিতে)। নিজে বলে গেছেন, তাঁর মুখের কথা কি ব্যর্থ হতে পারে?—তোমরা সর্বদা জেনো—তোমাদের পেছনে একজন রয়েছেন।"

৮

শ্রীমায়ের দৈনন্দিন জীবনটি খুবই অনুপম। তিনি সব সময়ই কিছু-না-কিছু কাজ করতেন। অলসভাবে বা বাজে গল্প করে সময় কাটাতে তাঁকে কখনো দেখা যেত না। প্রতিদিন রাত প্রায় তিনটায় ঘুম থেকে উঠা তাঁর অভ্যাস ছিল দক্ষিণেশ্বর-জীবন হতেই। শরীর অসুস্থ হলেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম কদাচিৎ দৃষ্ট হত। উঠেই শ্রীঠাকুরকে দেখতেন এবং ঠাকুরদের প্রণাম করতেন। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ঠাকুরকে শয়ন থেকে তুলে নিজে বসতেন জপে। সকাল হলে নিজের হাতে পূজার সব যোগাড় করে তিনি আটটার মধ্যে পূজায় বসে যেতেন। পূজা-সমাপনান্তে নিজের হাতে পাতায় পাতায় প্রসাদ সাজিয়ে পাঠিয়ে দিতেন সাধু ও ভক্ত-সন্তানদের জন্য। এরি মধ্যে আবার চলেছে ভক্ত-সমাগম, দর্শনদান, দীক্ষাদান, ধর্মোপদেশ, শোকাতুরকে সান্ত্বনা।

শ্রীমার পূজাদি দেখে বেশ মনে হত যে, তিনি জীবন্ত ঠাকুরকে নিয়েই নাড়াচাড়া করছেন—দক্ষিণেশ্বরে যেমনটি করতেন, পরেও যেন ঠিক তেমনই। ভোগের ঘরে ভোগ সাজিয়ে দেওয়া হলে শ্রীমা যখন ঠাকুরদেবতাদের সকলকে খাবার জন্য ডেকে নিয়ে যেতেন, সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য! সলজ্জ বধূটির মত শ্রীমা শ্রীঠাকুরের কাছে গিয়ে বলছেন—"এস, খেতে এসো।" আবার বালগোপাল-বিগ্রহের নিকট গিয়ে বলছেন—"এস, গোপাল, খেতে এসো।" এইভাবে সকলকে খাবার জন্য ডেকে নিয়ে যখন

তিনি ভোগের ঘরের দিকে যেতেন, তখন তাঁর ভাব দেখে মনে হত যে, সব ঠাকুররাই তাঁর পিছনে পিছনে চলেছেন ভোগ খেতে।... কখনো প্রসাদী মিষ্টি ফুরিয়ে গিয়েছে, অথচ ভক্তদের মিষ্টি দিতে হবে। শ্রীমা তাড়াতাড়ি একঠোঙা মিষ্টি হাতে করে নিয়ে ঠাকুরের সামনে ধরে বলছেন—"ঠাকুর, খাও।" এ দৃশ্য যারা দেখতো, তাদের প্রাণে তখন এনে দিত এক অভিনব ভাবের দোলা। 'ছায়া—কায়া' শ্রীমা বলতেন। তাঁর কাছে 'ছায়া' সর্বক্ষণই দিব্যকায়ারূপে প্রতিভাত।...

একবার শ্রীমা কলিকাতা হতে জয়রামবাটী যাচ্ছেন। বিষ্ণুপুরে দু'দিন বিশ্রাম নিয়ে তিনি সকালে সকলকে সঙ্গে করে দু'খানি গরুর গাড়ীতে রওনা হয়েছেন। আট মাইল দূরে জয়পুরচটিতে দু'প্রহরের আহার ব্যবস্থা হয়েছে। উনুন হতে ভাত নামাবার সময় হঠাৎ হাঁড়িটি ভেঙ্গে গিয়ে ভাত ও ফেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রীমা কিন্তু তাতে আদৌ বিচলিত হলেন না; তিনি একটি খড়ের নুড়ো নিয়ে আস্তে আস্তে ফেন সরাতে লাগলেন। তারপর হাত ধুয়ে বাক্স থেকে শ্রীঠাকুরের ছবিখানি বের করে একপাশে বসালেন। একটি শালের কাঠি দিয়ে তা'থেকে দুটিখানি ভাত শালপাতাতে তুলে নিয়ে ডালতরকারী সাজিয়ে ঠাকুরকে জোরহাতে বলছেন—"আজ এইরূপই মেপেছ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির গরম গরম দুটি খেয়ে নাও।" সঙ্গীরা শ্রীমায়ের কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল। কেমন সহজ-সুন্দর দেবসেবা—আত্মবৎ সেবা! আর কেমন চমৎকার সময়োপযোগী ব্যবস্থা! শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—"যখন যেমন তখন তেমন করতে হয়।"

শ্রীমায়ের জয়রামবাটীর জীবন খুবই কর্মময়। ওখানে তাঁকেই সব কাজ হাতেনাতে করতে হত; অনেক সময় রান্নাদি, পরিবেশন এবং এমন-কি লণ্ঠনসাফ পর্যন্ত তিনি করতেন। ভক্তসেবা তাঁর জয়রামবাটী-জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ। প্রত্যেক ভক্তই শ্রীমাকে জয়রামবাটীতে নিজগর্ভধারিণী-মা অপেক্ষা আরো নিবিড়ভাবে পাবার সুযোগ পেত।

তিনি যাবতীয় কাজ করে যেতেন নিত্যনূতন প্রীতির সহিত। শ্রীমায়ের এই নিরবচ্ছিন্ন সেবাময় জীবন—সন্ন্যাসী, গৃহী সকলেরই আদর্শস্থানীয়। তিনি বলতেন,—"সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহমন ভাল থাকে।" শ্রীসারদাদেবীর জীবনের একটি প্রধান অবদান 'সেবা'। একদিকে 'ব্রাহ্মী-স্থিতি', অন্যদিকে নিরন্তর কর্ম—এ প্রকার সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন বিরল দেখা যায়। সাধনভজন আর সেবাতে তাঁর সমজ্ঞান—সমভাব।

*　　　　*　　　　*

কয়েকমাস জয়রামবাটীতে কাটিয়ে শ্রীমা কলিকাতায় ফিরে এলেন। এ সময়ে অনেক ভক্ত শ্রীমায়ের দীক্ষাকৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছিল। প্রায় এক বৎসরকাল বাগবাজারে নিজের বাড়িতে বাস করে শ্রীমা ৺বলরামবাবুর স্ত্রীর বিশেষ আগ্রহে তাঁদের জমিদারি কোঠারে গিয়েছিলেন (১৩১৭ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ)। শ্রীমার সঙ্গে ছিলেন মঠের কয়েকজন সন্ন্যাসী, সেবক ও তাঁর আত্মীয়রা। কোঠারে অবস্থানকালে শ্রীমার মনে বহুদিনের ৺রামেশ্বর-দর্শনের ইচ্ছা বলবতী হল।

শ্রীমার অভিপ্রায় জানতে পেরে, মাদ্রাজ হতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

তাঁর দক্ষিণদেশভ্রমণের সকলপ্রকার দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। তদনুসারে ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীমা সেবক ও সঙ্গিনীদের নিয়ে কোঠার হতে দক্ষিণভারতের প্রধান তীর্থ ৺রামেশ্বর-দর্শনের জন্য মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করেন। মাদ্রাজে পৌঁছতেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দেবীসমুচিত সংবর্ধনা করে শ্রীমাকে মায়লাপুরে মঠের অতি সন্নিকটে একটি ভাড়াটিয়া বাড়িতে পরম যত্নে কিছুদিন রেখেছিলেন। তথায় বহু নরনারী শ্রীমার কাছে মন্ত্রদীক্ষা পেয়েছিল। অনেক লোক তাঁর পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হল।

মাদ্রাজ হতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ সঙ্গিগণ সহ শ্রীমাকে ৺রামেশ্বর-দর্শনে নিয়ে যান। পথে সকলে মাদুরায় একদিন বিশ্রাম নিলেন এবং ৺রামেশ্বরে তিন দিন বাস করেন। শ্রীমা তথায় গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে স্বহস্তে পূজা-অর্চনাদি যথারীতি সম্পাদন করলেন। ঐ সম্বন্ধে শ্রীমায়ের কথাতে জানা যায়—"আহা! শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) আমাকে ১০৮টি সোনার বেলপাতা দিয়ে ৺রামেশ্বরের পূজা করালে। "

৺রামেশ্বর হতে শ্রীমা ফিরে এলেন মাদ্রাজে। তারপরে বাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষের বিশেষ আগ্রহে তিনি বাঙ্গালোরে গিয়ে তিন দিন অবস্থান করেন। বাঙ্গালোর-গমন-প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের কথায় জানা যায়—"বাঙ্গালোরে কত লোকের ভিড়! ট্রেন থেকে নামতেই সকলে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। রাস্তায় ফুল স্তূপাকার হয়ে গিয়েছিল। ঠাকুরের ভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তাই এত লোক আসছে।"

বাঙ্গালোর-মঠপ্রাঙ্গণে চন্দনগাছ ও একটি ছোটপাহাড় দেখে শ্রীমা খুব আনন্দিতা হয়েছিলেন। তিনি একদিন সন্ধ্যায় ঐ পাহাড়টির উপরে বসে কিছুক্ষণ জপধ্যানে অতিবাহিত করেন।

বাঙ্গালোর হতে মাদ্রাজে এসে দু'-এক দিন বিশ্রাম নিয়েই শ্রীমা কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। গোদাবরীতে স্নানের মানসে তিনি রাজমহেন্দ্রীতে একদিনের জন্য নেমেছিলেন এবং পথে পুরীতেও দু'-তিন দিন বাস করেন।

৺রামেশ্বর হতে ফিরে এসে শ্রীমা এক মাসের বেশী বাগবাজারে ছিলেন। ১৩১৮ সনের ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৯১১ সালের ১৭ই মে) তিনি জয়রামবাটী যাত্রা করেন, এবং পরবর্তী ২৭শে জ্যৈষ্ঠ মহাসমারোহ করে তাঁর রাধুর বিবাহ দিলেন। প্রচুর যৌতুক দেওয়া হল, এবং রাধুকে আপাদমস্তক অলঙ্কারে সজ্জিত করা হয়েছিল। বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী, পার্শ্ববর্তী গ্রামের সর্বসাধারণ ও কাঙ্গাল-দুঃখীদের পরিতৃপ্ত করা হল ভূরিভোজনে। নৃত্য, গীত ও ক্রীড়াকৌতুকে জয়রামবাটী মুখরিত। শ্রীমা'র আহ্লাদ যেন আর ধরে না!

এর ছ'সাত মাস পরে শ্রীমা কলিকাতায় আসবেন। কোয়ালপাড়া পথে পড়ে—জয়রামবাটীর পাঁচমাইল দূরে। তথায় স্থানীয় কয়েকজন ভক্ত শ্রীঠাকুরের নামে একট আশ্রম করেছে। তখন স্বদেশীযুগ। আশ্রমে তাঁত, চরকারই বেশী প্রাধান্য। কলিকাতা-যাত্রার কয়েকদিন পূর্বে জয়রামবাটীতে কোয়ালপাড়া আশ্রমাধ্যক্ষকে শ্রীমা বললেন—"দেখ বাবা, তোমরা যখন ঠাকুরের জন্য ঘর ও পথে আমাদের বিশ্রামের একটু স্থান করেছ, তখন এবার যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব। সব আয়োজন করে রেখো।

পূজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত করবে। শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু, সবার মূল ঠাকুর। তিনিই আদর্শ। যা কিছু করনা কেন, তাঁকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না।"

যথাসময়ে শ্রীমা কোয়ালপাড়া আশ্রমে এলেন। শ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাদির আয়োজন করা হয়েছিল। শ্রীমা নিজের হাতে শ্রীঠাকুরের ও নিজের ফটো বসিয়ে পূজাদি করলেন এবং জনৈক সন্ন্যাসীকে দিয়ে হোমাদি সম্পন্ন করালেন।

শ্রীমা কলিকাতায় পৌছলেন ১৩১৮ সনের ৮ই অগ্রহায়ণ (১৯১১ সালের ২৪শে নভেম্বর। তাঁর কলিকাতা-আগমনে ভক্তদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। কৃপাপ্রার্থী হয়ে নানাদিক থেকে ভক্তেরা আসতে লাগল কলিকাতায়। শ্রীমা কৃপার দ্বার উন্মুক্ত করে রেখেছেন। কেউই বঞ্চিত হয় না কৃপা থেকে। পরশমণির স্পর্শে সোনা হয়ে যাচ্ছে শতশত জীবন!

"মাতৃভাব জগতে শেখাবার জন্যই" সারদাদেবীর দেহধারণ। তিনি আগে—'মা', পরে 'গুরু'। তাঁর মাতৃভাব ছাপিয়ে গিয়েছিল গুরুভাবকে। যে 'মা' বলে ডেকেছে,—শ্রীসারদাদেবী তাকেই দিয়েছেন স্নেহময় কোল। সেখানে সুশ্রী-কুশ্রী, পুরুষ-স্ত্রী, বালক-বালিকা, সবল-দুর্বলের কোন প্রশ্ন নেই। 'মা' ডাক তাঁর প্রাণে সৃষ্টি করত দুর্বার আলোড়ন। কোলে না নিয়ে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না—শুধু ইহকালে নয়, সন্তানদের ভবপারেও নিয়ে যাবেন কোলে করে! শ্রীসারদাদেবীর ভিতর গুরুভাবের যে বিকাশ, তা যেন মাতৃভাবেরই পরিণতি। যাদের কোলে নিয়েছেন তাদের তো তিনি ফেলতে পারেন না! তাই তাঁর গুরুরূপ। গুরুরূপে তিনি

সন্তানদের নিয়ে চলেছেন ভবসাগরের পরপারে। সেখানেও—মা আর সন্তান। চিরমিলন। তাঁর মাতৃস্নেহ যে ঐশী মাতৃস্নেহ !

আশ্রিতসন্তানদের জন্য কত ভাবনা, কত তাঁর উৎকণ্ঠা ! সকল বিপদে তিনি বুক পেতে দিচ্ছেন। পক্ষিমাতার ন্যায় স্নেহপক্ষ বিস্তার করে সন্তানদের রেখেছেন ঘিরে ঘিরে, রক্ষা করছেন সর্ববিধ বিপদ থেকে। জনৈক আশ্রিত-সন্তানের নৈরাশ্য দেখে শ্রীমা বলেছিলেন—"...তোমরা কি মনে কর যদি ঠাকুর এ শরীরটা না রাখেন, তা হলেও যাদের ভার নিয়েছি তাদের একজনও বাকি থাকতে আমার ছুটি আছে ? তাদের সঙ্গে থাকতে হবে। তাদের ভালমন্দর ভার যে নিতে হয়েছে !...যাদের নিজের বলে নিয়েছি, তাদের তো আর ফেলতে পারি নে !..."

* * *

ঐ বৎসর (১৩১৮ সনে) বেলুড়মঠে দশভুজার আরাধনা হবে। স্বামী প্রেমানন্দ শ্রীমা'র অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে পূজার আয়োজনে মেতে গিয়েছেন। প্রেমানন্দের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীমা পূজার ক'দিন মঠে অবস্থান করতে সম্মতা হলেন। আনন্দময়ী আসবেন। সাধুভক্তদের প্রাণে বেজে উঠেছে আনন্দের সুর।

বোধনের দিন বিকালে বাগবাজার হতে শ্রীমা মঠে আসবেন। উত্তরপাশের বাগানবাড়িতে তাঁকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। সন্ধ্যা সমাগতা। শ্রীমা'র আসার বিলম্ব দেখে বাবুরাম মহারাজ অস্থির-প্রাণে ছুটাছুটি করছেন। মঠের প্রবেশদ্বারে কলাগাছ ও মঙ্গলঘট স্থাপিত হয় নি দেখে, তিনি বলে উঠলেন—"এখনও মঙ্গলঘট-স্থাপন হয় নি—মা আসবেন কি করে ?"

দেবীর বোধন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমা'র গাড়ী প্রবেশ করল মঠপ্রাঙ্গণে। জনৈকা সঙ্গিনী শ্রীমাকে হাত ধরে গাড়ী হতে নামালেন। তিনি সব দেখে খুশী হয়ে বলছেন—"সব ফিটফাট্। আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গাঠাকরুণ এলুম।"...

শ্রীমার শুভাগমনে সকলে দেবীর চিন্ময়-আবির্ভাব অনুভব করে ধন্য হল। পূজার তিন দিন শতশত ভক্ত 'জীবন্তদুর্গা'র চরণে প্রণত হয়ে করেছিল জন্ম সার্থক। কয়েকজন ভাগ্যবান ভক্ত মন্ত্রদীক্ষা পেল। পূজার তিন দিন মঠে আনন্দের উজান বয়ে গিয়েছে।

৺বিজয়ার দিন নৌকাতে করে গঙ্গায় প্রতিমা ভাসান হচ্ছিল। শ্রীমাও বাগানে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। একজন ভক্ত নানাপ্রকার অঙ্গ ও মুখভঙ্গি করে প্রতিমার সামনে নৃত্য করছে। শ্রীমা তা দেখে খুব আনন্দপ্রকাশ করছেন। জনৈক মার্জিতরুচি ব্রহ্মচারীর সে-সব নৃত্যাদি তত পছন্দ হচ্ছিল না। শ্রীমা তা শুনে বললেন—"না না, এসব ঠিক। গানবাজনা, রঙ্গব্যঙ্গ এসব দিয়ে সকল রকমে দেবীকে আনন্দ দিতে হয়।" মঠের সকলকে আশীর্বাদ করে ৺বিজয়ার পরদিন শ্রীমা কলিকাতায় ফিরে গেলেন।

এর কয়েক দিন পরেই শ্রীমা যাত্রা করেন কাশী অভিমুখে। সেবক, ভক্ত, স্ত্রীভক্ত—অনেকে গিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে। কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ৺শ্যামাপূজার আয়োজন হয়েছে। ১৩১৯ সন, ২০শে কার্তিক, একাদশী মঙ্গলবার, শ্রীমা সকলকে নিয়ে কাশী পৌঁছলেন। আশ্রমের পাশেই জনৈক ভক্তের নবনির্মিত বাড়িটি শ্রীমার বাসের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। অদ্বৈতাশ্রমে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে শ্রীমা এলেন তাঁর বাসস্থানে।

শ্রীমা কাশীধামে শুভাগমন করেছেন। সে আনন্দ-মহোৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যে ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সুবোধানন্দ এবং মাস্টারমশাইও তথায় এসেছেন। অবিমুক্তপুরী-কাশীতে বিশ্বনাথের ধামে বিশ্বজননী ও সন্তানদের সমাবেশ! সকলের অন্তরে অন্তরে চলেছে আধ্যাত্মিক সমারোহ।

৺কালীপূজার পরদিন সকালে শ্রীমা স্থানীয় সেবাশ্রম দেখলেন। তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখান হল। সেবাশ্রমের বাড়ি, বাগান, ব্যবস্থা—সব দেখে শ্রীমা খুবই আনন্দপ্রকাশ করে বলেছিলেন—"এখানে ঠাকুর নিজে বিরাজ করছেন; আর মা লক্ষ্মী পূর্ণ হয়ে আছেন।" ইতঃপূর্বে শ্রীমা যদিও দু'বার কাশীতে এসেছিলেন, কিন্তু বেশীদিন থাকা হয় নি, এবার তিনি প্রায় আড়াই মাস কাশীবাস করেন। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা, দুর্গাবাড়ি, কেদার, তিলভাণ্ডেশ্বর—আরো নানা দেবদেবী দর্শন করেছিলেন। গঙ্গাস্নান করতেন, মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিতেন। শ্রদ্ধাসহকারে সমগ্র 'কাশীখণ্ড' শ্রবণ করেন। বিখ্যাত বৃদ্ধসাধু চামেলীপুরীকে দর্শন করলেন।

একদিন কাশীতে কয়েকটি স্ত্রীলোক শ্রীমাকে দর্শন করতে এসেছে। শ্রীমা তো রাধু, ভূদেব প্রভৃতি ছেলেমেয়েদের নিয়ে মহাব্যস্ত। আবার নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে—তা-ই সেলাই করে দিতে বলছেন জনৈক স্ত্রীভক্তকে। এসব দেখেশুনে আগন্তুকদের মধ্যে জনৈকা বলছে—"মা, আপনি দেখছি ঘোর মায়ায় বদ্ধ।" অস্ফুটস্বরে মা বললেন—"কি করব মা, নিজেই মায়া।" শ্রীমা'র এ মায়া-আবরণটি তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধুর্য।

কাশী হতে কলিকাতায় ফিরে মাসখানেকের মধ্যেই শ্রীমা জয়রামবাটী গেলেন। কিন্তু সাত-আট মাস পরেই তাঁকে ভক্তদের আকর্ষণে ফিরে আসতে হল কলিকাতায়। ঐ সময় তিনি প্রায় পৌনে দু'বৎসর কলিকাতায় ছিলেন। বহু লোক তাঁর কৃপা পেয়েছিল।

সকলেই যে শ্রীমা'র কাছে মুক্তিকামী হয়ে আসত তা নয়। নানা লোক আসত নানা কামনা নিয়ে। কেউ সন্তানকামী, রোগ-মুক্তিকামী; আবার অনেকে আসত ঐশ্বর্য-কামনা—আরো কত কি প্রার্থনা নিয়ে শ্রীমা'র কাছে। সকলেই আর্ত। শ্রীমা অভিলষিত বর দিয়ে সকলকেই পূর্ণকাম করে দিতেন। অনেক সময় অন্যের রোগ নিয়েছেন নিজের দেহে আকর্ষণ করে। তাঁর দয়ার অন্ত ছিল না। ছিল না তাতে সীমারেখা। সন্তানদের যার যেখানে বেদনা সেখানেই তিনি বুলিয়ে দিতেন তাঁর শান্তিহস্ত। যেকোন দুঃখ দেখলেই শ্রীমায়ের প্রাণ কেঁদে উঠত। আকুল হতেন, ভরে দিতেন সকল অপূর্ণতা, কোমলহস্তে তিনি মুছে দিতেন চোখের জল।

বাগবাজারে শ্রীমা'র বাড়ির সম্মুখস্থ মাঠের শ্রমিকবস্তি হতে এক রমণী তার রুগ্ন-ক্লিষ্ট শিশুটিকে কোলে করে এসেছে শ্রীমা'র আশীর্বাদ নিতে। আহা! তার প্রতি মায়ের কী দয়া, কত আন্তরিকতা, সহানুভূতি! আশীর্বাদ করলেন—"ভাল হবে।" দু'টি বড় বেদানা ও কতকগুলি আঙুর ঠাকুরের প্রসাদী করে তার হাতে দিয়ে তিনি বলছেন—"তোমার রোগা ছেলেটিকে খেতে দিও।" আহা! দরিদ্রা রমণীর আনন্দ আর ধরে না, কৃতজ্ঞতার বারবার সে শ্রীমাকে প্রণাম করতে লাগল॥

একদিন দু'টি বৌ এসেছে। সলজ্জভাবে শ্রীমার কাছে প্রাণের অভাবটি গোপন প্রার্থনায় জানাল। তারা নিঃসন্তান, মা হতে চায়। শ্রীমার দয়া হল। তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। বললেন—"ঠাকুরের কাছে মনের কথা জানিয়ে প্রার্থনা করবে। প্রাণের ব্যথা কেঁদে কেঁদে বলবে—দেখবে তিনি একেবারে কোলে বসিয়ে দেবেন।…" শ্রীমায়ের দয়ায় তাদের মনোরথ পূর্ণ হয়েছিল।

কখনো লোক আসছে রোগমুক্তির প্রার্থনা নিয়ে। একদিন একটি মেম এসে শ্রীমাকে প্রণাম করে তার মেয়ের কঠিন অসুখের কথা নিবেদন করল। মেমটির ব্যাকুলতা দেখে শ্রীমা সদয়া হলেন। প্রসাদী ফুল-বিল্বপত্র হাতে নিয়ে খানিক চোখ বুজে রইলেন, পরে শ্রীঠাকুরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ঐ ফুল-বিল্বপত্র মেমটিকে দিয়ে বলছেন—"তোমার মেয়ের মাথায় বুলিয়ে দেবে।…" শ্রীমার আশীর্বাদে মেয়েটি রোগমুক্ত হয়ে গিয়েছিল।…

এক-একদিন দর্শনার্থীদের প্রণামের পর শ্রীমাকে হাঁটু অবধি পা গঙ্গাজল দিয়ে ধুতে হত। সেবক এতবার পা-ধোয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় শ্রীমা বলেছিলেন—"আর কাউকে পায়ে মাথা দিয়ে প্রণাম করতে দিও না। কত পাপ এসে ঢোকে! আমার পা জ্বলে যায়; পা ধুয়ে ফেলতে হয়। এইজন্যই তো ব্যাধি। দূর থেকে প্রণাম করতে বলবে।" বলেই পরমুহূর্তে করুণারূপিণী বলছেন—"এসব কথা শরৎকে বোলো না। তা হলে প্রণাম করা বন্ধ করে দেবে।" এইভাবে চলেছিল শ্রীমা'র জীবোদ্ধারের কার্য। কাজের বিরতি নেই। নেই তাঁর এতটুকু বিরক্তি।

নানা লোকের কত পাপতাপ বহন করে শ্রীমা যেন আর পেরে

উঠেন না। 'সর্বংসহা' জননীর পক্ষেও ক্রমে যেন এসব অসহ্য হয়ে উঠত। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা-জ্বালা বোধ করতেন। প্রাণে হত দারুণ বেদনা। একদিন এইভাবে বহু লোকের প্রার্থনা পূর্ণ করতে করতে ক্রমে তিনি যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। ততক্ষণে রাত্রি অনেক হয়েছে। দর্শনার্থীরা সকলে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে গঙ্গাজল ছিটাতে বললেন। নীচের বিছানায় শুয়ে গায়ের কাপড় খুলে ফেলে জনৈকা স্ত্রীভক্তের হাতে পাখাটি দিয়ে বলছেন—"বাতাস কর তো মা, শরীর জ্বলে গেল! গড় করি মা কল্‌কাতাকে। কেউ বলে আমার এ-দুঃখ, কেউ বলে আমার ও-দুঃখ। আর সহ্য হয় না। কেউবা কত কি করে আসছে, কারো বা পঁচিশটা ছেলেমেয়ে—দশটা মরে গেল বলে কাঁদছে। মানুষ ত নয়! সব পশু পশু! সংযম নেই, কিছু নেই!..." পরের দিন আবার চলত সেই দর্শন, সেই প্রার্থনা-পূরণ, সেই কৃপাবিতরণ!

* * *

প্রায় এক বৎসর আট মাস কলিকাতায় বাস করে শ্রীমা জয়রামবাটীতে এলেন। ভক্তসমাগম ও দীক্ষাদি দিনের দিন বেড়েই চলেছে। শ্রীমাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পাবার এবং প্রাণের আশ মিটিয়ে তাঁর সেবাসঙ্গ করার সুযোগ হত বলে, অনেক ভক্তই তাঁর কাছে জয়রামবাটীতে আসত। অনেকে আবার থাকত তাঁর জয়রামবাটী আসার প্রতীক্ষা করে। এতকাল শ্রীমা ভাইদের বাড়িতেই ছিলেন। কিন্তু সেবক-সেবিকা ও ভক্তদের নিয়ে ভাইদের বাড়িতে থাকার অসুবিধা ছিল অনেক; অথচ নিরুপায়। সেজন্য অশেষ কষ্ট সহ্য করেও শ্রীমা থাকতেন ওরই

মধ্যে। তাঁর এই কষ্টদূরীকরণের জন্য স্বামী সারদানন্দ ও ভক্তদের বিশেষ চেষ্টায় জয়রামবাটীতে প্রায় দু'হাজার টাকা ব্যয় করে শ্রীমার জন্য আলাদা মেটে কোঠাবাড়ি, ভক্তদের বৈঠকখানা ইত্যাদি নির্মিত হল। ১৩২৩ সনের জ্যৈষ্ঠমাসে (১৯১৬, মে) শ্রীমা সেবকদের নিয়ে এলেন নতুন বাড়িতে। মুক্তিকামী সন্ন্যাসী ও সংসারতাপদগ্ধ গৃহি-সন্তানদের জুড়াবার একটা স্থান হল।

শ্রীমা'র ভিতর বিশ্বমাতৃত্বের প্রকাশ সকলকে চমৎকৃত করল। সন্তানদের অকুণ্ঠ সেবাতে শ্রীমায়ের কত যে তৃপ্তি, কত যে আনন্দ! ... জনৈক সন্ন্যাসি-সন্তান আহারাদির পর নিজের এঁটো থালাবাসন ধুতে নিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীমা এসে পথরোধ করে দাঁড়ালেন। বললেন—"না, আমিই নেব।" সন্ন্যাসী তো অবাক্, একি কাণ্ড! "তা কি হয়? আপনি নিলে আমার অকল্যাণ হবে।"—কম্পিতকণ্ঠে বললেন সাধুটি। তখন শ্রীমা ছলছল চোখে বলছেন—"দেখ, মায়ের কোলে ছেলে কত হাগে মুতে। আমি তোমার কি করতে পেরেছি, বাছা!" মাথা নীচু করে রইলেন সন্ন্যাসী। তাঁর চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

শ্রীমা এক সময়ে বলেছিলেন—"আমি সতের-ও মা, অসতের-ও মা।" আমজাদ তুঁতে মুসলমান—চোর ও ডাকাত। জয়রামবাটীর কাছে শিরোমণিপুরে তাদের বাস। শ্রীমায়ের নূতন মেটে-কোঠাবাড়ির কাজে ঐ তুঁতে মুসলমানদের লাগান হতে প্রথমটায় গ্রামবাসীরা ভয় পেয়েছিল। পরে বলাবলি করত—"মায়ের কৃপায় ডাকাতগুলো পর্যন্ত ভক্ত হয়ে গেল যে!"

এক দিন শ্রীমা আমজাদকে বাড়ির ভিতর তাঁর ঘরের বারান্দায়

খেতে বসিয়েছেন। তাঁর ভাইঝি নলিনী করছে পরিবেশন। দূর থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে দেখে শ্রীমা বললেন—"অমন করে দিলে মানুষের কি খেয়ে সুখ হয়? তুই না পারিস্, আমি দিচ্ছি।" আমজাদের খাওয়ার পরে শ্রীমা নিজেই উচ্ছিষ্টস্থান মুক্ত করে দিলেন। তা দেখে—"ও পিসীমা, তোমার জাত গেল" ইত্যাদি নানা কথা বলে নলিনী গোল তুলেছে। শ্রীমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন—"আমার শরৎ যেমন ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে।" তিনি যে 'মা'!

তাঁর ঐশী মাতৃস্নেহ হতে ইতরপ্রাণীরাও হয় নি বঞ্চিত। তারাও পেয়েছিল—শ্রীমাকে স্নেহময়ী মা-রূপে। শ্রীমায়ের চন্দনা-পাখী। তিনি নাম রেখেছেন 'গঙ্গারাম'—কত স্নেহ-আদর গঙ্গারামের প্রতি! কখনো 'রাধেকৃষ্ণ, রামরাম', পড়াচ্ছেন। সকলে 'মা মা' ডাকছে শুনে শুনে গঙ্গারামও শ্রীমাকে মা বলে ডাকতে শিখেছে। মা পান খাচ্ছেন—গঙ্গারাম বলছে 'মা-মা'। তিনি গঙ্গারামকে জিবে করে পান খাওয়ালেন। শ্রীমা পূজা করে বেরিয়েছেন, অমনি গঙ্গারাম 'মা মা' বলে ডাকতে আরম্ভ করেছে। শ্রীমা পূজার পরে নিজের হাতে গঙ্গারামকে ফলমিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। গঙ্গারামের প্রতি শ্রীমার আদর দেখে ঈর্ষান্বিত কোন কোন ভক্ত বলত—"আমরা যদি গঙ্গারাম হয়ে জন্মাতে পারতাম!"

শ্রীমা'র একটি পোষা বিড়াল ছিল। এক দিন বিড়ালটি জনৈক ব্রহ্মচারীর বিছানায় প্রসব করেছে। তিনি তা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি জায়গা নিয়ে ব্রহ্মচারীর বিছানার চাদর প্রভৃতি কেচে

পরিষ্কার করে রাখলেন। তবু ভয় পাছে ব্রহ্মচারী জানতে পারলে বিড়ালটাকে মারধর করে। তাই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা হতেই শ্রীমা বলছেন—"বেড়ালটাকে কিছু বলো না। ও এখানেই থাকে, খায়—প্রসব করতে কোথায় যাবে ?"

জয়রামবাটীতে ভোরবেলা একটি বাছুর খুব ডাকছে 'হাম্বা হাম্বা' করে। ঐ ডাক শুনে শ্রীমার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। তিনি—"যাই মা, যাই। আমি এক্ষুণই তোকে ছেড়ে দেবো, এক্ষুণই ছেড়ে দেব।"—বলতে বলতে আলুথালুভাবে ছুটে গেলেন। ছেড়ে দিলেন বাছুরটিকে !

* * *

জয়রামবাটীতে শ্রীমাকে তাঁর নিজের আবেষ্টনীর মধ্যে সহজ-নিবিড়ভাবে একদিনের জন্যও যে পেয়েছে, সেই জানে কতটা সন্তানগতপ্রাণ ছিলেন শ্রীমা। সে-সব ছোটখাট ঘটনার মলয়স্পর্শ সন্তানদের হৃদয়ে সারাটি জীবনের জন্য মধুময় স্মৃতি হয়ে রয়েছে—রয়েছে পরকালের পাথেয় হয়ে। আবার একদিন নয়, দু'দিন নয়, যারা বৎসরের পর বৎসর দিনেরাতে সর্বক্ষণ তাঁর কাছে ছিল তারাও একটি ক্ষণের জন্যও তাঁর উদ্বেল স্নেহমমতার কমতি দেখে নি। সেই ভালবাসা আত্মপ্রকাশ করত অনন্তভঙ্গীতে, ছোটবড় নানা ঘটনার ভিতর দিয়ে। সন্তানদের ভালবেসে, সেবাযত্ন করে মায়েদের যে কতটা গভীর তৃপ্তি হয়, তা বোঝা যেত শ্রীমার সন্তানসেবা দেখে।

গিরিশবাবু জয়রামবাটী গিয়েছেন। একদিন তিনি দেখেন, শ্রীমা বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় ইত্যাদি নিয়ে পুকুরঘাটে

কাচতে যাচ্ছেন। রাত্রে শোবার সময় গিরিশবাবু দেখলেন তাঁরই বিছানা ধপ্‌ধপ্‌ করছে। একাজ মায়েরই বুঝে প্রাণে যেমন কষ্ট হল, তেমনি শ্রীমায়ের অপার স্নেহের কথা ভেবে আনন্দে তাঁর বুক ভরে গেল।

জয়রামবাটীতে শ্রীমার গৃহ নির্মিত হচ্ছে। জনৈক সেবক বাড়ির কাজে সকালবেলা পাশের গ্রামে গিয়েছেন। শীতকাল। ফিরতে তাঁর দেরী হল। সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক পূর্বে ফিরে এসে দেখেন যে, শ্রীমা তখনো খান নি, অভুক্ত সন্তানের অপেক্ষায় বসে আছেন। বিস্মিত সেবক অনুযোগের সুরে বললেন—"মা, তোমার শরীর ভাল নয়, আর তুমি এই সন্ধ্যা পর্যন্ত উপবাসী রয়েছ?" মা বললেন—"তোমার খাওয়া হয় নি, আমি কি করে খাই?"—এর উপর কি কথা চলে? সেবক খেতে বসল মাথা নীচু করে।

সর্বজয়ী মাতৃস্নেহ। তিনি তো আর পাতান মা নন? জনৈক সেবকের হাতে খুব পাঁচড়া হয়েছে। নিজের হাতে খেতে পারেন না। শ্রীমা ভাত মেখে সেবককে দু'বেলা খাইয়ে দিতেন। উচ্ছিষ্ট পাতা পর্যন্ত ফেলতেন।...ঘটনা সামান্য, কিন্তু শ্রীমায়ের স্নেহসিক্ত হয়ে তা হয়েছে অমর, হয়েছে অসামান্য।

৬

জয়রামবাটীতে নূতন বাড়িতে ভক্ত-সেবকসঙ্গে চার-পাঁচ মাস বাস করে শ্রীমা পুনরায় কলিকাতায় এলেন।

১৯১৬ সালে মঠে দুর্গোৎসব হয়েছিল। স্বামী প্রেমানন্দের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীমা সপ্তমীপূজার দিন মঠে এসে পূজার ক'দিন উত্তরপাশের বাগানবাড়িতে ছিলেন। পূজার আনন্দ পরিণত হল মহোৎসবানন্দে। অনেক লোক শ্রীমার কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছিল।

কলিকাতায় থাকাকালীন শ্রীমাকে প্রায় প্রতিদিনই দীক্ষা দিতে হত। ভক্তদের দু'বেলা দর্শন, সারাদিন মেয়েভক্তদের আসাযাওয়া লেগেই থাকে। এদিকে তাঁর স্বাস্থ্যও ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছে। তাঁর ভাগবতী তনু আর যেন পাপভার বইতে পাচ্ছে না। অথচ শেষের জীবনে মাতৃভাব ও গুরুভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ শ্রীমার সমগ্র সত্তাটিকে যেন ঘিরে রেখেছিল।

শ্রীমার একটা মস্ত দুর্বলতা ছিল। তিনি কারও চোখের জল দেখতে পারতেন না। চোখের জল তাঁর মাতৃহৃদয়কে এমন উদ্বেল করে দিত যে, তিনি একেবারে অধীরা হয়ে যেতেন। দু'বিন্দু অশ্রুর বিনিময়ে তাঁর কাছ থেকে পেত নির্বাণমুক্তি। 'মা'-ডাকে তাঁর প্রাণে এমনই আলোড়নের সৃষ্টি হত যে, তিনি যেন অন্য লোক হয়ে যেতেন—অন্যলোকে চলে যেতেন। তাতে পাত্রাপাত্রের বিচার ছিল না। ছিল না তাতে দেশকালের গণ্ডি-রেখা। 'মা' বলে দাঁড়ালেই তিনি টেনে নিতেন তাঁর

অভয়কোলে। এরই জন্য গোলাপসুন্দরী একদিন শ্রীমাকে খুব অনুযোগ করলেন। শ্রীমা চুপটি করে সব শুনে পরে বলছেন—"কি করবো গোলাপ, মা বলে এলে আমি যে আর থাকতে পারি নে!"

জনৈকা কুলমহিলা। অন্যের প্ররোচনায় পড়ে তার পদস্খলন হয়েছে। পরে নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে মর্মেমর্মে অনুতপ্তা হয়ে এসেছে শ্রীমার চরণতলে আশ্রয়শান্তি পেতে। ঠাকুরঘরে প্রবেশ করতেও সঙ্কুচিতা হয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মহিলাটি কাঁদতে কাঁদতে নিজের সমস্ত পাপের কথা শ্রীমার কাছে ব্যক্ত করে বলল—"মা, আমার উপায় কি হবে? আমি আপনার কাছে এ পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করার যোগ্যা নই।" শ্রীমা তখন দু'পা এগিয়ে এসে নিজের বাহুদ্বারা সেই মহিলাটির গলা জড়িয়ে ধরে সস্নেহে বলছেন—"এস মা, ঘরে এস। পাপ কি তা বুঝতে পেরেছ। অনুতপ্ত হয়েছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেব—ঠাকুরের পায়ে সব অর্পণ করে দাও। ভয় কি?" পতিতোদ্ধারিণী পতিতার কানে দিলেন সেই তারকব্রহ্মনাম। ধূলোকাদা মেখেছে; তা মা ঝেড়ে মুছে তাকে কোলে তুলে নিলেন। ভরিয়ে দিলেন স্নেহ-আদরে।

* * *

পরবর্তী মাঘমাসে শ্রীমা পুনরায় জয়রামবাটী যান, এবং এক বৎসরের বেশী তথায় বাস করেন।

কৃপার প্লাবন এসেছিল শ্রীমার প্রাণে। সে উচ্ছলতা নির্বিচারে সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে চলেছিল। শ্রীমার তখনো প্রায়ই জ্বর হয়, শরীর খুবই দুর্বল। শরৎ মহারাজ এ সংবাদ পেয়ে কিছুকাল

ভক্তসমাগম ও দর্শনাদি বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন সময় সুদূর বরিশাল হতে জনৈক ভক্ত জয়রামবাটীতে এসে হাজির হয়েছে। ব্যাকুল হয়ে এসেছে শ্রীমাকে দর্শন করতে, তাঁর কৃপা পেতে। সেবক কিছুতেই দর্শন করতে দেবে না। ভক্তটির আকুল প্রার্থনায়ও সেবক অটল। ভক্ত ও সেবকের মধ্যে এই নিয়ে বাদানুবাদ চলেছে। গোলমাল শুনে অন্তর্যামিনী মা একেবারে আলুথালুভাবে বহির্বাটীর দরজায় এসে উপস্থিত হলেন এবং বিরক্তি প্রকাশ করে সেবককে বললেন—"কেন তুমি আসা বন্ধ করছ?" সেবক বলল—"শরৎ মহারাজ নিষেধ করেছেন। অসুস্থ শরীরে দীক্ষা দিলে আপনার শরীর আরও খারাপ হবে?" শ্রীমা একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলছেন—"শরৎ কি বলবে? আমাদের এজন্যই আসা। আমি ওকে দীক্ষা দেব।" পরে ভক্তটিকে সম্বোধন করে বললেন—"এস বাবা, আজ তুমি জল খাও, কাল তোমার দীক্ষা হবে।" চাওয়ার পূর্বেই পাওয়া! শ্রীভগবানের কাছেও কিছু চাইতে হয় না। আন্তরিক হলে তিনি অন্তর্যামিরূপে অন্তরের সব অভাব পূর্ণ করে দেন।

ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে শ্রীমার শরীর এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। অগত্যা স্বামী সারদানন্দ কলিকাতা হতে ডাক্তার নিয়ে এসে শ্রীমার জ্বর একটু আরাম করে তাঁকে কলিকাতায় নিয়ে এলেন—১৯১৮, ৭ই মে।

একদিন বাগবাজার মঠে জনৈক সন্ন্যাসি-সন্তান শ্রীমাকে বলছেন—"আপনি যে এত লোককে মন্ত্র দিচ্ছেন, তাদের তো খোঁজখবর

কখনো রাখেন না।...গুরু শিষ্যের কত খোঁজ রাখেন, উন্নতি হচ্ছে কিনা দেখেন। আপনার এত লোককে মন্ত্র না দিলেই হয়!"—শুনে শ্রীমা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—"আমি ঠাকুরের উপর ভার দিই। তাঁর কাছে রোজ বলি—'যে যেখানে আছে, দেখো।' আর জান, এসব ঠাকুরের দেওয়া মন্ত্র। তিনি আমাকে দিয়েছিলেন সিদ্ধমন্ত্র।"...

অন্য একদিন শ্রীমার অসীম স্নেহ ও অপার করুণার প্রসঙ্গ হচ্ছে। মেয়েযোগেন হাসতে হাসতে শ্রীমার দিকে তাকিয়ে বলছেন—"তা, মা আমাদের যতই ভালবাসুন, তবু ঠাকুরের মত নয়। ছেলেদের জন্য তাঁর কি ব্যাকুলতা, কি ভালবাসা দেখেছি, তা বলবার নয়!" শ্রীমা স্মিতমুখে বললেন—"তা হবে না? তিনি নিয়েছেন সব বাছা বাছা ছেলে ক'টি। তা আবার এখানে মন্ত্র টিপে, ওখানে মন্ত্র টিপে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন একেবারে সব পিঁপড়ের সার।" তা পিঁপড়ের সারই বটে!

তাঁর এই দীক্ষাদানপ্রসঙ্গে শ্রীমা অন্য সময়ে জনৈক সন্তানকে বলেছিলেন—"আমার যা করে দেবার তা একসময়েই (দীক্ষা দেবার সময়েই) করে দিয়েছি। যদি সদ্য শান্তি চাও তো, সাধন-ভজন করো। তা না হলে দেহান্তে হবে।"

*   *   *

ঠাকুর গিরিশের বকলমা নিয়েছিলেন। শেষ অসুখের সময় কাশীপুর-উদ্যানে তিনি একদিন 'কল্পতরু' হয়ে ভাবাবেশে স্পর্শদ্বারা 'চৈতন্য হোক' বলে অনেক ভক্তের চৈতন্যসম্পাদন করেছিলেন। গিরিশের বকলমা নেওয়া—ঠাকুরের জীবোদ্ধার-কার্যের অন্যতম

প্রকাশ্য ঘটনা মাত্র। শ্রীঠাকুর আরও বহু ভক্তের সকল ভার নিয়েছিলেন এবং চৈতন্যসম্পাদন করেছেন নানাভাবে।

শ্রীমার জীবনে দেখা যায় ঐ 'বকলমার' পূর্ণবিকাশ। শ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় তিনি বহু আশ্রিতসন্তানের বকলমা নিয়েছিলেন। অনেককেই বলেছিলেন—"তোমাকে কিছুই করতে হবে না। তোমার জন্য আমিই সব করব।" অনেককে আবার শ্রীমা 'ত্রিসত্য' করে অভয় দিয়েছেন। ফলে তাদের অন্তর চিরকালের জন্য হয়ে গেছে অভী।

বকলমা—পূর্ণ-আত্মনিবেদনের সাধন। শিশু যেমন সর্বদা সর্ব-বিষয়ে মায়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে—ঠিক তেমনি। পুরোপুরি বকলমা নিয়ে মা শিশুর সব ভার নেন। শিশু মা ছাড়া অন্য কাউকে জানে না, তার একমাত্র চিন্তা মায়ের। মাকেই ভাবে, মাকেই ডাকে। ঠিক তেমনিভাবে ভক্তও শ্রীভগবানের উপর বকলমা দিয়ে—পূর্ণ-শরণাগতি নেয় ভগবচ্চরণে এবং একান্ত নির্ভরশীল হয় ঐশী ইচ্ছার উপর। শ্রীভগবানে লীন হয় ভক্তের সকল ইচ্ছা, সর্ব প্রচেষ্টা।

শ্রীমা জনৈক আশ্রিতসন্তানকে বলেছিলেন—"সর্বদা ভাববে তোমাদের পিছনে একজন রয়েছেন।" শিশু মায়ের কোলে নির্ভয়। —"আমি আছি, বাবা, ভয় কি ?"—এই শ্রীমায়ের অভয়বাণী।··· শেষের দিকে গিরিশ শ্রীরামকৃষ্ণময় হয়ে গিয়েছিলেন। গিরিশের 'অহং' শ্রীঠাকুরের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছিল। সকল চিন্তায়, সকল ব্যাপ্তিতে ঠাকুর। তাঁর প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে হত ঠাকুরের স্মরণ। বলতেন—"এই যে নিঃশ্বাসটি পড়ছে, তাও ঠাকুরের ইচ্ছায়।"—বকলমারূপ সাধনার সিদ্ধিতে পৌঁছেছিলেন গিরিশ শেষের দিনে।···

একবার শ্রীমা কোয়ালপাড়ায় আছেন। জনৈক আশ্রিতসন্তান মনের দারুণ অশান্তি জানিয়ে কল্যাণরূপিণীকে বলছে—"মা, সাধন-ভজন তো কিছুই হয়ে উঠছে না!" তিনি আশ্বাস দিয়ে বলছেন—"তোমাকে কিছু করতে হবে না। যা করতে হয় আমি করব।" এরূপ আশ্বাসবাণী আশাতীত। সন্তানের প্রশ্নে শ্রীমার মুখে পুনরায় সেই অভয়বাণী—"না। তুমি কি করবে? যা করতে হয় আমি করব।" অন্য আশ্রিতসন্তানের আর্তি শুনে শ্রীমা অভয় দিয়ে বলেছিলেন—"আমি যদি ঠাকুরের কাছে যাই, তোমরাও নিশ্চয় যাবে।"...তিনি সকল সন্তানের ভার নিয়েছিলেন। যারা শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে শরণ নিয়েছে, তারাই পেয়েছে শ্রীমায়ের অভয় অঙ্কে আশ্রয়।

* * *

১৯১৮ সালে বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে মহাসমারোহে শ্রীমার জন্মতিথিপূজা অনুষ্ঠিত হল। বহু ভক্ত শ্রীমার দর্শন-স্পর্শন পেল। অনেকে পাদপূজা করলে, তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হল। সকলের অঞ্জলি দেওয়া হলে শ্রীমা জনৈক সেবককে বললেন—"পুষ্পপাত্রে আর যা ফুলচন্দন রয়েছে, তা দিয়ে যে-সব ছেলেরা আসতে পারে নি তাদের নাম করে অঞ্জলি দাও। সেবক শ্রীমায়ের পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছে, আর শ্রীমা রাখাল, তারক, খোকা প্রভৃতির নাম বলে দিতে লাগলেন। শেষে ছেলেরা যে যেখানে আছে সকলের কল্যাণের জন্যও তাঁর পায়ে অঞ্জলি দেওয়ালেন। পায়ে জবাবিল্বদল অর্পিত হচ্ছে, শ্রীমা চোখ বুঁজে আছেন, সব ছেলেদের কল্যাণের জন্য আশীর্বাদ করছেন—প্রার্থনা করছেন। শ্রীমার সেই দক্ষিণামূর্তি দর্শকের ধ্যানের বস্তু হয়ে রয়েছে চিরদিনের জন্য।

শ্রীমায়ের জন্মতিথিপূজা। তাই কত ভক্ত কত জিনিস এনেছে। অনেকে তাঁর দু'পায়ে টাকা দিয়ে প্রণাম করলে। নতুন কাপড়, ফলমিষ্টি, আরও কত জিনিস স্তূপাকার হয়ে গেছে। একটি দীনদরিদ্র ভক্ত জীর্ণবসন পরে অতি ভক্তিভরে একটি হরীতকী শ্রীমায়ের চরণে দিয়ে প্রণত হল। শ্রীমা তাকে খুব আশীর্বাদ করলেন। ভক্তটি চলে যাবার পর তিনি সেবককে বলছেন—"এই হরীতকীটি তুলে রেখে দাও তো। কেটে আমায় একটু দিও। আহা! কত ভক্তি করে দিয়েছে!"...

শ্রীমা জয়রামবাটীতে ৺জগদ্ধাত্রীপূজা করেছেন। সন্ধ্যার একটু পরেই সন্ধিপূজা হল। 'মায়ের' পায়ে বিকশিত-কমলদল দিয়ে অনেকে ভক্তি-অঞ্জলি দিলে। শ্রীমা ভাবস্থা হয়ে সকলের পূজা গ্রহণ করলেন। অনেককে চিবুক ধরে স্নেহচুম্বন দিলেন, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। পরে জনৈক সেবককে বলছেন শ্রীমা —"আরও ফুল আন। রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, যোগেন, গোলাপ—এদের সব নাম করে করে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকল ছেলেদের হয়ে ফুল দাও।" সেবক পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছে, পুণ্যময়ী শ্রীমা হাতজোড় করে শ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে বসে আছেন। স্থির। বহুক্ষণ কেটে গেল। পরে বললেন—"সকলের ইহকাল-পরকালের মঙ্গল হোক।"

* * *

শ্রীমার জন্মতিথিপূজার কিছুদিন পরে (১৯১৯, ২৭শে জানুয়ারী) তিনি রাধুকে নিয়ে দেশের দিকে রওনা হলেন। রাধুর অসুখ। শহরের কোলাহল তার সহ্য হয় না। সেজন্য

শ্রীমা সেবকদের সঙ্গে রাধুকে নিয়ে নির্জন পল্লী-আবেষ্টনীর মধ্যে কোয়ালপাড়া জগদম্বা-আশ্রমে ছ'মাস ছিলেন।

শ্রীমার ঐ নির্জনবাসের সময়ও দূরদূর স্থান হতে বহু ভক্ত কৃপালাভ করবার জন্য তাঁর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হত। তিনি কাউকে বিমুখ করতেন না। তাঁর অযাচিত কৃপা-বিতরণ দেখে মনে হত, তিনি যেন নরলীলার কাজ গুটিয়ে আনছেন। গভীর-ভাবস্থা হয়ে থাকতেন অনেক সময়। একহাতে 'রাধুর' সেবা-পরিচর্যা, একদিকে যোগমায়ার মায়াজাল, অন্য হাতে দয়ারূপে চিরন্তনীর কৃপাবিতরণ! আবার দেখা যেত, তিনি যেন আলুথালু-ভাবে বসে আছেন আনমনে—অসীমের দিকে তাকিয়ে।...

একদিন সন্ধ্যার পরে শ্রীমাকে ভক্তদের দৈনন্দিন চিঠিপত্র সব পড়ে শোনান হচ্ছে। তিনি খুবই নিবিষ্টমনে চোখ বুঁজে সব চিঠি শুনছেন। আর মাঝে মাঝে প্রার্থনা করছেন—"ঠাকুর, এদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ কর।" শ্রীমায়ের কণ্ঠস্বরে কি ব্যাকুলতা! চিঠিপড়া শেষ হলে বলছেন—"সাংসারিক দুঃখকষ্ট, শোকতাপ, অভাব-অনটন—এসবই শুধু জানাচ্ছে। এসব থেকেই পরিত্রাণ পেতে চায়। ভগবানকে কেউ চায় না।...ঠাকুরকে বলি—'ঠাকুর, এদের ইহকাল-পরকাল তুমিই রক্ষা কর।' আমি মা হয়ে আর কি বলব? ক'জন তাঁকে ঠিক ঠিক চায়? সে ব্যাকুলতা কোথায়? এত তো ভক্তি-আগ্রহ, সামান্য একটু ভোগ্যবস্তু পেলেই সন্তুষ্ট। বলে—'আহা, তাঁর কি দয়া!'..."

৭

কোয়ালপাড়ায় রাধুর একটি পুত্রসন্তান হয়েছে (১৩২৬, ২৪শে বৈশাখ)। শ্রীমা তার নাম রেখেছেন—বনবিহারী। আদর করে ডাকতেন 'বনু'। তার আড়াই মাস পরে শ্রীমা রাধু প্রভৃতিকে নিয়ে জয়রামবাটী এলেন (৪ঠা শ্রাবণ)। রাধুর শরীর তখনো খুবই দুর্বল—একপ্রকার শয্যাশায়ী। তার যাবতীয় সেবা ছাড়া শ্রীমার উপরন্তু কাজ—রাধুর ছেলের লালনপালন। প্রায় উনিশ বৎসর পূর্বে যেমনি করে তিনি রাধুকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, তেমনিভাবে এখন আবার 'বনু'কে নিতে হল। 'যোগমায়ার খেলা। শ্রীমার শরীর ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে—আর যেন বইছে না। তবু নূতন করে যোগমায়াকে আশ্রয় করলেন। পাগলী, রাধু, বনু তিনজনে মিলে মায়াজাল বিস্তার করে শ্রীমার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

* * *

জয়রামবাটী আসার পর হতেই শ্রীমার মাঝে মাঝে জ্বর হয়। ম্যালেরিয়া-জ্বর। জ্বর নেহাত বাড়াবাড়ি হলে শুয়ে পড়েন। আবার উঠেন, লাগেন সংসারের কাজে ও ভক্ত-পরিজন-সেবায়। দীক্ষার্থীও আসে, দীক্ষা দেওয়া তিনি বন্ধ করেন না। শ্রীমার স্বাস্থ্যের পক্ষে জয়রামবাটী থাকা আদৌ উচিত নয়; অথচ রাধু তখনো এত দুর্বল যে, নিজের শক্তিতে দাঁড়াতে পারে না। রাধুর জন্যই শ্রীমাকে থাকতে হচ্ছিল জয়রামবাটীতে।

১৩২৬ সালে শ্রীমার জন্মতিথির দিন (২৭শে অগ্রহায়ণ) বিকালে তাঁর সামান্য জ্বর হল। কয়েক দিন ভুগলেন। মাঝে মাঝে একটু ভাল থাকেন—আবার জ্বর হয়। এইভাবে ভুগে ভুগে তাঁর শরীর ক্রমেই খুব ক্ষীণ হয়ে পড়ল। কিন্তু এ অসুস্থতার মধ্যেও দীক্ষাদি বন্ধ ছিল না; কারণ, ভক্তরা আসে কত আশা নিয়ে দূরদূরান্তর হতে। অনেক সময় তিনি নিজের অসুখের কথা গোপন রাখেন, পাছে ভক্তদের দর্শনাদি বন্ধ হয় এবং সেবকগণ তাঁর জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে।

শ্রীমা ক্রমাগত ভুগছেন এই সংবাদ পেয়ে স্বামী সারদানন্দ চিকিৎসার জন্য তাঁকে কলিকাতায় আনার ব্যবস্থা করলেন। ১৫ই ফাল্গুন (১৩২৬) শ্রীমা কলিকাতায় পৌঁছলেন। তাঁর ঐ কঙ্কালসার শরীর দেখেই স্ত্রীভক্তেরা বলে উঠলেন—"তোমরা কি মাকেই নিয়ে এলে গো! কেবল চামড়া ও হাড় ক'খানি এনে হাজির করলে গা! 'মা'র শরীর যে এত খারাপ তা আমরা মোটেই বুঝতে পারি নি।" স্বামী সারদানন্দ বিশেষ তৎপরতার সহিত শ্রীমার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন। একে একে হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, এলোপ্যাথি চিকিৎসা চলতে লাগল। কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের চিকিৎসা, আন্তরিক সেবাযত্নাদি ও পথ্যের কোন ক্রটী নেই। প্রথমটায় শ্রীমার স্বাস্থ্যের একটু উন্নতি দেখে সকলেই আশান্বিত হল। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও তিনি ধীরে ধীরে সেরে উঠবেন—এই আশায় বুক বেঁধে অক্লান্তসেবা করে যাচ্ছে সেবক-সেবিকাগণ।...

শ্রীমার শরীর বিশেষ অসুস্থ বলে ভক্তদের দর্শনাদি বন্ধ। ওরই

মধ্যে যেদিন একটু ভাল থাকতেন, সেদিন তিনি বহু লোককে বিশেষ আশীর্বাদ করতেন এবং ছ'এক জনকে দীক্ষাও দিয়েছেন।... তাঁর শরীর ক্রমেই খুব দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে আসছে দেখে সাধুভক্ত-সন্তানগণ নীরবে চোখের জল ফেলছেন।

চৈত্রমাসের গোড়ার দিকে শ্রীমার শরীর খুব দুর্বল দেখে জনৈক সন্ন্যাসি-সন্তান খুব দুঃখ করতে লাগলেন। তা শুনে শ্রীমা বলছেন—"হাঁ বাবা, দুর্বল খুবই হয়েছে। মনে হয়, এ শরীর দিয়ে ঠাকুরের যা করবার ছিল তা শেষ হয়েছে। এখন মনটা সর্বদা তাঁকেই চায়; অন্য কিছু আর ভাল লাগে না। এই দেখনা, রাধুকে এত ভালবাসতুম!...এখন ও সামনে এলে বেজার বোধ হয়। মনে হয়, ও কেন সামনে এসে আমার মনটাকে নীচে নামাবার চেষ্টা করছে। ঠাকুর তাঁর কাজের জন্য এতকাল এইসব দিয়ে মনটাকে নামিয়ে রেখেছিলেন। নইলে তিনি যখন চলে গেলেন, তারপর কি আমার থাকা সম্ভব হত?"

শ্রীমা যেন ঠাকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনিও মহাপ্রয়াণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। একদিন বেলা দেড়টা-ছ'টার সময় তাঁর জ্বর বাড়তে আরম্ভ করেছে। সেবক নিত্যকার মত তাঁর বিছানার পাশে বসে হাওয়া করছে এবং তাঁর কপালে ভিজা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। শ্রীমা সস্নেহে সেবক-সন্তানের বুকে-পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে করুণস্বরে সেবকের শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বলছেন—"শরীরটা চলে গেলে তোমাদের খুব কষ্ট হবে, বুঝতে পাচ্ছি।" চোখ ঝাপসা হয়ে এল সেবকের। মুখ নীচু করে নিজেকে সামলে নিয়ে সেবক বলল—"মা, ও কি-সব কথা বলছেন?

ঔষধেও যখন তেমন ফল হচ্ছে না, আপনি ঠাকুরকে শরীরের জন্য একটু জানান না! তাহলেই তো সব সেরে যায়।" শ্রীমা মৃদু হেসে বলছেন—"কোয়ালপাড়ায় অত জ্বর হত, বেহুঁশ হয়ে বিছানায়ই অসামাল হয়ে পড়তাম; কিন্তু হুঁশ হলে শরীরটার জন্য যখনই তাঁকে স্মরণ করতাম, তখনই তাঁর দর্শন পেতাম।...তোমাদের দিকে চেয়ে শরীরটার জন্য ঠাকুরকে কি মাঝে মাঝে না জানাচ্ছি? কিন্তু শরীরের জন্য যখন তাঁর স্মরণ করি, কিছুতেই তাঁর দর্শন পাচ্ছি নে। আমার মনে হয়, তাঁর ইচ্ছা নয় যে শরীরটা থাকে। শরৎ রইল।"

ক্রমে সব চিকিৎসা ব্যর্থ করে রোগ দিনদিন বেড়েই চলেছে। দিনে তিন-চারবার জ্বর হয়। পিত্তপ্রধান জ্বর, শরীরে অসহ্য জ্বালা। তিনি বলতেন—"পানাপুকুরের জলে গা ডুবিয়ে থাকবো।" সেবিকা বরফে হাত রেখে সে হাত তাঁর গায়ে বুলিয়ে দিত। এত কষ্ট ও অসুখের মধ্যেও সকলেই পেত তাঁর স্নেহস্পর্শ। রোগের বিবরণ জানতে সেবক শ্রীমার কাছে গেছে। সকালবেলা, কবিরাজের কাছে যাবে। তিনি স্নেহভরে বলতেন—"খেয়ে যেও। বেলা হবে।" ডাক্তার-কবিরাজ আসছেন, সকলের জন্য নিজেই ফল মিষ্টি দেওয়াচ্ছেন। আরামবাগ থেকে ভক্তরা এসেছে। খুব ক্ষীণ-স্বরে থেমে থেমে শ্রীমা তাদের জিজ্ঞাসা করছেন—"ভাল আছ, বাবা? কিছু খেতে পারি নে। দুর্বল। বরদা (শ্রীমার ভাই) (মারা) গিয়েছে।" দেশের খবর নিচ্ছেন—"জল হয়েছে কি?...এখানে প্রসাদ পাবে তো?" কয়েকদিন পূর্বে আরামবাগের ভক্তগণ রমণী নায়ক জনৈক স্ত্রীলোকের হাতে শ্রীমার জন্য কিছু কচি তাল

পাঠিয়েছিল, সে সম্বন্ধে বলছেন—"রমণী কখন এসেছিল জানি নে, জ্বরে হুঁশ ছিল না। তাকে বলো, সে যেন দুঃখ না করে।"

এত অসুখের মধ্যেও শ্রীমা কারও সেবা নিতে বড়ই কুণ্ঠিতা হতেন। তাঁর সেবা করার কোনো সুযোগই কাউকে দিতেন না। শ্রীমার দুপুরের পথ্য খাওয়া হয়ে গেছে। তাঁকে একটু ঘুমপাড়াবার জন্য সেবক সামান্য হাওয়া করছিল। চার-পাঁচ মিনিট পরেই শ্রীমা বলেছেন—"আর না। তোমার হাত ব্যথা করছে।"

সেবক—"না মা, এ তো হাতপাখা, আমার একটুও হাতে ব্যথা করছে না।" একটু চোখ বুঁজে থেকে শ্রীমা পুনরায় বলছেন—"না বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে। থাক্‌, আমি অমনি ঘুমুচ্ছি।"...খানিক চুপ করে থেকে আবার বললেন—"বাবা, তোমার হাত ব্যথা করবে ভেবে আমার ঘুম আসছে না। তুমি পাখা বন্ধ কর, তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুই।" অগত্যা পাখা বন্ধ করতে হল।...

কোন চিকিৎসাতেই ফল হচ্ছে না দেখে সকলেই ম্রিয়মাণ। আহারে তাঁর বিশেষ অরুচি। শরীর অতি ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। ঘরের তক্তাপোশ সরিয়ে মেজেতেই বিছানা করা হল। এদিকে শ্রীমা ক্রমেই বেশী অন্তর্মুখী হচ্ছেন। অনেক সময়ই চোখ বুঁজে থাকেন। অনন্যোপায় হয়ে স্বামী সারদানন্দ দৈবী-প্রতিকারের চেষ্টায় ব্রতী হলেন। কিছুদিন যাবৎ নানা শান্তিস্বস্ত্যয়ন অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু শ্রীমার স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না।

ক্রমে রক্তহীনতায় হাতেপায়ে শোথ দেখা দিয়েছে। এত দুর্বল যে উঠবার শক্তি নেই। বিছানাতেই শৌচাদি করান হয়।

রোজ দু'তিনবার জর হচ্ছে। হাতেপায়ে অসহ্য জ্বালা। শ্রীমা প্রায়ই বলেন—"আমাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে চল। গঙ্গার ধারে আমি ঠাণ্ডা হব।" ডাক্তাররা ঐ অবস্থায় তাঁকে নাড়াচাড়া করতে দিলেন না।...

নরলীলাসংবরণের কয়েক দিন পূর্বে জনৈক সেবককে শ্রীমা বলছেন—"তুমি রাধুদের সবাইকে জয়রামবাটী রেখে এসো।" তাঁর ঐ আদেশ শুনে সকলেই মহাচিন্তিত হয়ে পড়লেন। শরৎ মহারাজ সে কথা শুনে শ্রীমাকে নানাভাবে বুঝাতে লাগলেন—, "আপনার এই অসুখ-শরীর দেখে ওদের যেতে কষ্ট হবে। আপনি একটু সেরে উঠলে ওরা যাবে।" শ্রীমা একটু মৌন থেকে পরে বললেন—"পাঠিয়ে দিলেই ভাল হত। তবে যেন আমার কাছে ওরা না আসে। আর ওদের ছায়া দেখতেও ইচ্ছা নেই।"...'মায়ের বাড়ি'র সর্বত্র ক্রমে নেমে আসতে লাগল বিষাদের ঘন-অন্ধকার।

একদিন দুপুরে রাধু পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে। তার ছেলেটি—শ্রীমার আদরের 'বনু'—হামা দিতে দিতে মায়ের বিছানার কাছে এসে তাঁর বুকের উপর উঠছে। তা দেখে শিশুটিকে লক্ষ্য করে মা বলছেন—"তোদের মায়া একেবারে কাটিয়েছি। যা, যা, আর পারবি নে।" পার্শ্ববর্তী সেবককে বললেন—"একে তুলে নিয়ে গিয়ে ওদিকে রেখে এসো। এসব আর ভাল লাগে না।" সেবক খোকাকে তুলে নিয়ে তার দিদিমার কাছে দিয়ে এল।...

নিজের ইচ্ছা বলে কখনও কিছু ছিল না। তিনি শ্রীঠাকুরের ইচ্ছার যন্ত্রস্বরূপ হয়ে ছিলেন। নরদেহে থাকা, নরলীলা

করা—তাও ঠাকুরের ইচ্ছায়। আবার শেষের দিনে "ঠাকুর যখন নিয়ে যাবেন, যাব"—এই ভাবে ডুবে ছিলেন। শ্রীমা এক সময় বলেছিলেন—"তাঁর কাজের জন্যই না 'রাধু রাধু' করে এই শরীরটা রেখেছেন। যখন ওর উপর থেকে মন চলে যাবে তখন আর এদেহ থাকবে না।" এখন শ্রীমার ঐ কথাটি সকলের বিশেষভাবে স্মরণ হতে লাগল।

শ্রীমার স্বধামে প্রস্থানের ছ'সাত দিন মাত্র বাকী। মুখটি শুকনো করে রাধু এসে দাঁড়িয়েছে। শ্রীমা কতকটা তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—"দেখ্, তুই জয়রামবাটী চলে যা। আর এখানে থাকিস্ নে।" নিকটস্থ সেবিকাকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন—"শরৎকে বলো, ওদের জয়রামবাটী পাঠিয়ে দিতে।" সেবিকা শরৎ মহারাজ এবং আর আর সকলকে শ্রীমার নির্দেশ জানাতেই সকলে বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়লেন। মেয়ে-যোগেন শ্রীমার কাছে এসে করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করছেন—"কেন, মা, ওদের পাঠিয়ে দিতে বলছ?" উত্তরে শ্রীমা স্পষ্টস্বরে বললেন—"যোগেন, এর পরে ওদের সেখানেই থাকতে হবে। মন তুলে নিয়েছি। আর চাই নে।" স্ত্রীভক্তটি কাতরকণ্ঠে বললেন—"ও-কথা বলো না, মা। তুমি মন তুলে নিলে আমরা কি করে থাকব?" শ্রীমা একটু দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন—"যোগেন, মায়া কাটিয়ে দিয়েছি। আর নয়।" স্ত্রীভক্ত আর কিছু না বলে শরৎ মহারাজকে সব জানালেন। তিনি শুনে হতাশপ্রাণে বললেন—"তবে আর মাকে রাখা গেল না। রাধুর উপর থেকে যখন মন তুলে নিয়েছেন তখন আর আশা নেই।"

সেবক-সেবিকাগণ শরৎ মহারাজের নির্দেশে শ্রীমার মন যাতে রাধুর উপর আসে তার জন্য করছিল নানা চেষ্টা। কিন্তু সহস্র চেষ্টায়ও কিছু হল না। শ্রীমা বেশ দৃপ্তকণ্ঠে একদিন শুনিয়ে দিলেন—"যে মন তুলে নিয়েছি, তা আর নামবে না, জেনো।"

দেহত্যাগের তিন দিন পূর্বে শরৎ মহারাজকে নিকটে ডাকিয়ে শ্রীমা বললেন—"শরৎ, আমি চললুম। যোগেন, গোলাপ—এরা সব রইল, দেখো।"

শেষের দু'দিন তিনি যেন গভীর-সমাধিস্থা ছিলেন। প্রশান্ত, স্থির। সে প্রশান্তি ভঙ্গ করতে কারও সাহস হত না, ইচ্ছাও হত না।

শ্রীঠাকুরের সঙ্গে তাঁর চৌত্রিশ বৎসরের স্থূলবিচ্ছেদের অবসান হল। ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ, রাত্রি দেড়টায় শিবযোগে, ৬৬ বৎসর ৭ মাস বয়সে, শ্রীমা পরমশিব শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে চিরমিলিতা হলেন।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেব্যর্পণমস্তু